

সুদী পাঠক! মূল বিষয়ে মনোযোগের আগে হুব
তুলতু জুজুহী ভিত্তিতে পড়ুন- “ভাষান্তর,
সম্পাদনা..... ও কিছু হজ্বা”

তাবলীগ জামা'য়াত ও দেওবন্দিগণ

একটি বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচন
তাদের ধ্যান-ধারণা, গ্রন্থ ও দাওয়াহ সম্পর্কিত।

সংকলন : সাজিদ আব্দুল কাইয়ুম।

ভাষান্তর : প্রকৌঃ আজিজুল ইসলাম
ও
মুহাঃ মু'মিনুল হক।

সম্পাদনা : শাইখ্ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
ও
মুহাঃ মু'মিনুল হক।

কৃতজ্ঞতা

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শাইখ্ আতা-আব্বাহ্ দার্তিকে এই সংকলনটি প্রকাশে সহায়তা করায় ও তাঁর বিশাল সংগ্রহশালা হতে দেওবন্দিগণের উর্দুতে লেখা বিভিন্ন বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহের জন্য। শাইখ্ আতা-আব্বাহ্ দার্তি সারজাহুয় একটি মাস্জিদের ইমাম, যিনি দেওবন্দিগণের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার উপর অনেক গবেষণা করে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আমি ঐ সকল ভাইদের কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা এই সংকলনটি প্রকাশে কোন না কোন ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, বিশেষ ভাবে- ভাই আমিন কাজী, ভাই মোঃ নাজিব মুহাম্মদী, ভাই নাদীম আঃ গনি, ভাই ফায়জাল রাখাদী ও ভাই আয়াজ কাজীকে। পরিশেষে, এই সংকলনটি প্রকাশে গবেষণা, লেখা-লেখি, সম্পাদনা ইত্যাদি কাজে অকিঞ্চিৎকর সহযোগিতা, বিশেষ করে, এই উদ্যোগে এক বিরাট চালিকা-শক্তির ভূমিকা পালন করায় আমার ক্রীকে মোবারকবাদ জানাই।

সাজিদ আব্দুল কাইয়্যুম

রমজান, ১৪২২/ নভেঃ ২০০১।

সূচীপত্র

<u>বিষয়</u>	<u>পৃষ্ঠা নং</u>
কিছু কথা যা না বললেই নয়-----	১২
ভাষান্তর, সম্পাদনা ও বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে কিছু কথন -----	১৮
শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালামের জরুরী কিছু কথা -----	২৩
অগ্রকথন -----	২৬
অবতরণিকা -----	২৯
১। শিরক-আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা -----	২৯
২। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা -----	৩০
৩। বিদ'আহু (ইমান-আক্বীদাহু ও ইবাদাহু) -----	৩০
৪। অনৈক্য এবং বিভিন্ন ফিরকায় বিভাজন -----	৩১
৫। কুফরী (অবিশ্বাসী) অনুকরণ -----	৩১
৬। দ্বীনে বাড়াবাড়ি -----	৩২
৭। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর মিথ্যা আরোপ -----	৩২
একমাত্র সমাধান -----	৩৩
প্রথম অধ্যায় : সার-সংক্ষেপ ও পটভূমি -----	৩৫
সূফিবাদ অধুনা -----	৩৫
বেরেল্‌ভীগণ -----	৩৫
দেওবন্দিগণ ও তাবলীগ জামা'য়াত -----	৩৬
দেওবন্দি ও তাবলীগ জামা'য়াতীগণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব -----	৩৬
তাবলীগ জামা'য়াতীগণের তা'লিমী উপকরণ -----	৩৮
দেওবন্দিগণ সুফীবাদের অনুসারী -----	৩৮
সূফিবাদের সংজ্ঞা ও বাস্তবতা -----	৩৯
সূফিবাদ, অনৈসলামিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আক্রান্ত এক স্বয়ংক্রিয় ভাবধারা -----	৪০
১। প্রভুর সন্ধানে -----	৪২
২। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক -----	৪৩
৩। নিবৃত্তি (চরম ব্রতচার) ই ধর্মানুরাগ ও জ্ঞানের চাবিকাঠি -----	৪৩
৪। ধ্যান, অতিরিক্ত স্তবগান ও সূদীর্ঘক্ষণ নিঃশ্বাস ধরে রাখা -----	৪৫
৫। অনন্ত জীবনের ধারণা (মতবাদ) -----	৪৫
দেওবন্দি-বেরেল্‌ভীগণের দ্বন্দের ঐতিহাসিক পটভূমি -----	৪৬
বাস্তব মতানৈক্য -----	৪৭
ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর প্রবন্ধের আলোকে সূফিগণের নিকট আক্বীদাহর গুরুত্ব -----	৪৮
মিথ্যাশ্রিত সত্যের প্রচার -----	৫০
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামী চেতনায় তাওহীদ (একেশ্বরবাদ) -----	৫১
১। তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহু : আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস -----	৫১
আরবীয় পেশানগণ তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহু বিশ্বাস করতেন -----	৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অপরিহার্য বিষয় -----	৫৩
২। তাওহীদ আল্-উলুহিয়াহ্ (আল্লাহর নিরঙ্কুশ একক ইবাদাহ্)-----	৫৩
ইবাদাহ্ কী? -----	৫৪
ইবাদাহর শর্তসমূহ -----	৫৪
অন্ধ অনুসরণ -----	৫৪
ইবাদাহর নিয়ম-পদ্ধতি বা ধরন -----	৫৫
প্রীতি-ভালোবাসা -----	৫৬
তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা/নির্ভরশীলতা) -----	৫৭
যাক্বা বা প্রার্থনা (ছলাহ) -----	৫৭
৩। তাওহীদ আল্-আসমা ওয়াস্-সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস)-----	৫৮
তাওহীদ আল্-আসমা ওয়াস্-সিফাত এর বিরুদ্ধে জঘন্য শিরক -----	৫৯
<u>তৃতীয় অধ্যায় : সর্বেশ্বরবাদ, ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ বা মোক্ষ্য</u> -----	৬১
ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ এর স্তর বা ধাপসমূহ -----	৬২
নিজেকে কুফর ও শুরকের স্তরে অধঃপতিত করা -----	৬৪
সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব অস্বীকার করা -----	৬৬
ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ -----	৬৭
সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান, এই ধারণা -----	৬৭
দেওবন্দি আলীমগণ সর্বসম্মতভাবে ওয়াহ্দাতুল-ওজুদে বিশ্বাসী -----	৬৮
ধারণা ছিলো কিছু লোকোনার -----	৭২
ইসলামে গোপন ইলুম-এর ব্যাপারে আলীমদের অবস্থান -----	৭৩
কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে ওয়াহ্দাতুল-ওজুদের খন্ডন -----	৭৩
(ক) কুর'আনের অসংখ্য আয়াত বলে আল্লাহ তাঁর আরশের উপর -----	৭৩
(খ) আল্লাহর রাসুল (সাঃ)-এর অসংখ্য হাদীস -----	৭৪
(গ) ফিতরাহ -----	৭৫
(ঘ) ইসরা আল-মিরাজ -----	৭৫
সালফে সালেহীনদের বক্তব্য থেকে আরো প্রামাণ্য দলিল -----	৭৬
আবু বাকর -----	৭৬
ইমাম মালিক (মৃত্যু-১৭৯ হিঃ) -----	৭৬
শাইখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইব্ন মূবারক (মৃত্যু-১৮১ হিঃ) -----	৭৬
ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস আশ্-শাফ'ঈ (মৃত্যু-২০৪ হিঃ) -----	৭৬
ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (মৃত্যু-২৪১ হিঃ) -----	৭৬
ডাক্তার ধারণার আপনোদন -----	৭৭
ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ এবং মোক্ষ্য, একই মুদ্রার দুই পিঠ -----	৭৮
সৃষ্টি কেবলই স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ -----	৭৯
ওয়াহ্দাতুল-ওজুদের মতো মোক্ষ্য আধ্যাত্মিক অভিজাতদের জন্য -----	৮০

চতুর্থ অধ্যায় : বারুয়াখের জীবন	৮১
উপক্রমণিকা	৮১
সুফীবাদ, মাযার পূজা এবং পীর পূজা	৮২
মাযারের প্রতি অতিভক্তি অতীত জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে	৮২
মৃত্যু, রুহ, ক্বাবর এবং বারুয়াখ-ইসলামি চিন্তাধারা	৮৪
আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর রুহ কি সর্বত্র বিরাজমান?	৮৫
ক্বাবর	৮৬
বারুয়াখ	৮৬
বারুয়াখ জীবন সম্পর্কে দেওবন্দিগণের দৃষ্টিভঙ্গী	৮৭
দেওবন্দিগণের দৃষ্টিভঙ্গী-১ : প্রকৃত ঈমানদারের মৃত্যু নেই	৮৭
প্রতিবাদ	৮৯
মৃত্যু সবাইকে ধরবে, এমন কি নাবী-রাসুলদেরকেও	৮৯
সন্দেহের নিরসন	৯০
সন্দেহ (১) রাসুল (সাঃ) ক্বাবর থেকেও সালামের জওয়াব দান করেন	৯০
উত্তর	৯১
সন্দেহ (২) কুর'আন শহীদদেরকে জীবিত বলে উপস্থাপন করেছে	৯২
উত্তর	৯২
দেওবন্দিগণের দৃষ্টিভঙ্গী- ২ রাসুল (সাঃ) তাঁর উম্মাহর জন্য সচেতন	৯৪
প্রতিবাদ-আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর উম্মাহ সম্পর্কে অজ্ঞাত	৯৫
(১) হাওজে কাউছার	৯৫
(২) পয়গাম্বার ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত	৯৬
(৩) মৃতরা পার্থিব জগৎ সম্পর্কে সচেতন নন	৯৭
(৪) জান্নাতবাসীরা পার্থিব জগত সম্পর্কে অজ্ঞ	৯৯
দেওবন্দি দৃষ্টিভঙ্গী ৩: রাসুল (সাঃ) যিয়ারাহকারীর আওয়াজ শোনে এবং সাড়া দেন	১০০
প্রতিবাদ	১০১
(১) ফিরিশ্তারা সালাম পৌছে দেন	১০১
(২) শ্রবণশক্তির সীমাবদ্ধতা	১০১
(৩) মৃত ব্যক্তির শ্রবণ সম্পর্কে কুর'আনের আলোকে সাধারণ প্রতিবাদ	১০২
সন্দেহের নিরসন	১০৪
সন্দেহ (১) -পদধ্বনি শোনা	১০৪
সন্দেহ (২)- বদরের কূপে কাফিরগণ	১০৪
দেওবন্দি দৃষ্টিভঙ্গী (৪) : রাসুল (সাঃ) জীবিতদেরকে উপকার করতে পারেন	১০৫
(১) উপদেশ/উত্তর/সামাধান/ সাহায্য চাওয়া রাসুল (সাঃ) থেকে	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রতিবাদ -----	১০৭
তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবু বাক্রের নিকট যাবে -----	১০৭
রাসূল (সাঃ) এর ইত্তিকালের পর তাঁর নিকট কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না -----	১০৮
(ক) খলীফা মনোনয়ন -----	১০৮
(খ) আব্দুল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট সমস্যার সমাধান চাওয়া -----	১০৮
(গ) আব্দুল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট ধর্মীয় সিদ্ধান্ত চাওয়া -----	১০৯
(ঘ) বৃষ্টির জন্য দোওয়া -----	১০৯
উপসংহার -----	১১৯
পঞ্চম অধ্যায় : ক্বাবর যিয়ারাহ -----	১১১
শির্ক ও ক্বাবর পূজা -----	১১১
ক্বাবর যিয়ারাহর প্রয়োজনীয়তা -----	১১১
ক্বাবর যিয়ারাহ মাত্র দুটি কারণে প্রয়োজন -----	১১১
(ক) যিয়ারাহকারীকে মৃত্যু এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে -----	১১১
(খ) যিয়ারাহকারী দোওয়ার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করতে পারে -----	১১২
ক্বাবর কে ইবাদাহর জায়গা মনে করার উপর নিষেধাজ্ঞা -----	১১২
দেওবন্দিগণ মাযার থেকে দোওয়া এবং উপকারের জন্য যিয়ারাহ অনুমোদন করে -----	১১৩
প্রতিবাদ ও সন্দেহের নিরসন -----	১১৪
উপসংহার -----	১১৭
ষষ্ঠ অধ্যায় : বারুযাখ থেকে পূর্বাবস্থায় -----	১১৮
রুহ কি ক্ষণিকের জন্য ইহজগতের সাথে যোগাযোগ করতে পারে? -----	১১৮
রুহের ফিরে আসার মতবাদ কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী -----	১১৮
দেওবন্দিগণ রুহের ফিরে আসা মতবাদকে সমর্থন করে -----	১২০
নিরীক্ষিত আশ্চর্যজনক ঘটনা -----	১২০
মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর দাদা মৃত্যুর পর ফিরে আসেন -----	১২২
সপ্তম অধ্যায় : ওয়াসিলা -----	১২৩
ওয়াসিলার অর্থ -----	১২৩
কুর'আনের ব্যাখ্যায় ওয়াসিলার অর্থ -----	১২৩
কুর'আন ও সুন্নাহয় তাওয়াসুল -----	১২৫
(১) আব্দুল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ নিয়ে ডাকার মাধ্যমে তাওয়াসুল -----	১২৫
(২) দোওয়াকারীর সৎকাজের ওয়াসীলায় তাওয়াসুল -----	১২৬
(৩) সৎলোকের দোওয়ার মাধ্যমে তাওয়াসুল -----	১২৭
দেওবন্দিগণের মতানুসারে তাওয়াসুল -----	১২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সুফী শাইখদের ওয়াসীলা -----	১২৮
কুকুরের ওয়াসীলা -----	১২৯
দেওবন্দিগণের নিষিদ্ধ শ্রেণীর ওয়াসীলায়ও বুঝার ভুল -----	১৩০
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা শির্ক -----	১৩১
দেওবন্দিগণ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর আক্বীদাহ্ (বিশ্বাস) এর স্পষ্ট বিপরীতে -----	১৩৩
প্রমাণ -----	১৩৩
অন্ধ লোকের সম্পর্কে হাদীস -----	১৩৫
(ক) যে অন্ধ লোকটি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট এসেছিল তার ইচ্ছা -----	১৩৬
(খ) রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) -----	১৩৬
উপসংহার -----	১৩৭
৮ম অধ্যায় : ইসলামে ইবাদাহ্ -----	১৩৮
অবতরণিকা -----	১৩৮
ইবাদাহ্ সম্পর্কে সুফীগণের ধারণা -----	১৩৯
যিক্র-আল্লাহ্ সুব্বহানাহ্ ওয়া তা'য়ালার স্মরণ -----	১৩৯
ইবাদাহ্তে সুফীগণের অতিরঞ্জন ও নব উদ্ভাবন (বিদ্'আহ্) -----	১৪১
(১) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্যদের থেকে যিক্র গ্রহণ -----	১৪১
(২) সুফীগণের যিক্র-এর রীতি/কার্যধারা -----	১৪১
(৩) যিক্র-এর মাধ্যমে ফানা' অর্জন -----	১৪২
(৪) নির্জন ও বিচ্ছিন্নাবস্থায় যিক্র -----	১৪২
(৫) যিক্র-এ শ্বাস বন্ধ রাখা -----	১৪৪
(৬) যিক্রের সংখ্যার অতিরঞ্জন -----	১৪৫
দেওবন্দিগণের মতানুসারে যিক্র-এর কার্যকারিতা ও সুফল -----	১৪৬
অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যত দৃশ্যাবলী প্রকাশিত হওয়া -----	১৪৭
যিক্র দেহকে ছিন্নভিন্ন করে -----	১৪৭
মৃতের দেহে আত্মার প্রবেশ -----	১৪৭
যিক্র মন ও দেহের সুস্থতা নষ্ট করে দেয় এবং নাচন উৎপন্ন করে -----	১৪৭
ইসলামে কোন ধরনের ইবাদাহ্তে একজন আলো, দৃশ্য, দেখে -----	১৪৮
মাজযুব -----	১৪৮
শরীয়াহ্ মাজযুবদের জন্য প্রযোজ্য নয় -----	১৪৯
সুফীবাদের জন্যও মাজযুব অপ্রযোজনীয় -----	১৪৯
মাজযুবদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে -----	১৫০
ইবাদাহ্ সম্পর্কে সুফীগণের আরো কিছু ধর্মবিরোধী (খারেজি) বিশ্বাস -----	১৫১
দোওয়া/বিনীত প্রার্থনা থেকে বিরত থাকা -----	১৫১
জান্নাতের প্রতি দৃষ্টিপাত -----	১৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রতিবাদ	১৫৪
উপসংহার	১৫৫
নবম অধ্যায় : গায়িবের (অদৃশ্য) জ্ঞান	১৫৮
গায়িব-এর অর্থ এবং উৎস	১৫৮
আমাদের অদৃশ্যের জ্ঞানের একমাত্র উৎস	১৫৮
কারো অদৃশ্যের নিরঙ্কুশ জ্ঞান নেই	১৬০
দেওবন্দিগণ ও অদৃশ্যের জ্ঞান	১৬০
স্বপ্নের মাধ্যমে অর্জিত সংবাদ	১৬৩
(১) প্রত্যেক স্বপ্নই সত্য নয়	১৬৪
(২) যে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে	১৬৪
(৩) স্বপ্নের ব্যাখ্যা পুরোপুরি ঠিক নয়	১৬৪
আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখা	১৬৫
স্বপ্নের জগতে দেওবন্দিগণ	১৬৬
স্বপ্নের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য শর্তের শিথিলতা	১৬৮
স্বপ্নকে দলিল হিসাবে ব্যবহার	১৬৯
ইল্হাম (আত্মায় স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ)	১৭২
দেওবন্দিগণ ও ইল্হাম	১৭৪
উপসংহার	১৭৬
কাশ্ফ (ধ্যানের মাধ্যমে অদৃশ্য বস্তু বা দূরবর্তী কিছু দেখা)	১৭৬
কাশ্ফ	১৭৬
অন্তরে লুকানো বিষয়ের জ্ঞান	১৮১
উপসংহার	১৮৪
মৃত্যুর সময় এবং স্থান সম্পর্কে জ্ঞান	১৮৪
সাধু-সন্ত যারা সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন	১৮৫
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান	১৮৬
তাউয়াজ্জুহ	১৮৮
তাসাভূর-ই-শাইখ	১৯০
উপসংহার	১৯২
দশম অধ্যায় : আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন	১৯৫
অবতরণিকা	১৯৫
আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন (বাড়াবাড়ি) নিষিদ্ধ	১৯৫
ফাজায়েলে আ'মালে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন	১৯৭
মাওলানা জামীর ক্বাসীদাহ	১৯৮
দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ক্বাসিম নানোতভী থেকে আরো কিছু পদ্যাংশ	১৯৯
আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট সাহায্য ও দোওয়া চাওয়া	২০১
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট সুপারিশ (শাফায়াত) প্রার্থনা করা	২০২

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ভ্রান্ত বিশ্বাস-----	২০৩
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে আর একটি লজ্জাকর অপবাদ দেয়া হয়েছে-----	২০৪
উপসংহার-----	২০৫
একাদশ অধ্যায় : সুফী শাইখগণের অন্ধ অনুসরণ -----	২০৬
বায়াত, দেওবন্দি আলিমগণ এবং তাবলীগ জামা'য়াত-----	২০৬
সুফীবাদে একজন শাইখ থাকার প্রয়োজনীয়তা-----	২০৬
শাইখবিহীন লোক বিপথে পরিচালিত হয়-----	২০৭
শাইখ না থাকার কারণেই কাদিয়ানী দাঙ্গালরা পথভ্রষ্ট-----	২০৭
শাইখ ও মুরীদের মাঝে বিশেষ বন্ধন-----	২০৮
শাইখের প্রতি পরিপূর্ণ নিঃশর্ত আনুগত্য-----	২০৮
মুরীদকে সাহায্য করার ব্যাপারে শাইখের কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে বলা-----	২০৯
দেওবন্দি শাইখগণ মুরীদদেরকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করেন-----	২১০
শাইখ ক্বাবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন-----	২১১
তুমি তোমার পীরের সমকক্ষ হতে পারবে না-----	২১১
সুফী শাইখ এবং ইমামগণকে অন্ধ অনুসরণ না করার ফল-----	২১২
নতুন ধরণের তাওহীদের প্রবর্তন : তাওহীদ আল-মাত্লাব-----	২১২
রাশীদ আহমাদ গান্গেসহী কর্তৃক তাওহীদ আল-মাত্লাব এর ব্যাখ্যা প্রদান-----	২১২
আশরাফ আলী খানভী কৃত তাওহীদ আল-মাত্লাবের ব্যাখ্যা-----	২১৪
তাওহীদ আল-মাত্লাব ও তাক্বলীদ-----	২১৪
দ্বাদশ অধ্যায় : দেওবন্দিগণের তাক্বলীদ সম্পর্কে ধারণা -----	২১৬
সার-সংক্ষেপ-----	২১৬
দেওবন্দিগণের মতে তাক্বলীদ-----	২১৭
ইমাম/আলিমগণকে প্রশ্ন করাই কি তাক্বলীদের প্রমাণ?-----	২১৭
ইমাম/আলিমগণকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ-----	২১৮
দেওবন্দিগণের দাবী ও তাক্বলীদের শর্তসমূহের বিশ্লেষণ-----	২২০
চার ইমামই সত্যের উপর আছেন এই বক্তব্যের বিশ্লেষণ-----	২২০
(১) দেওবন্দিগণ হানাফী মায্হাবের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেন-----	২২০
(২) মুসলিম উম্মাহর যে কোন একজনের তাক্বলীদ-----	২২১
(৩) কি আ'মল শাফি'ঈদের বৈধ আর হানাফীদের অবৈধ ঘোষণা করে?-----	২২১
(৪) অন্য মায্হাব অনুসরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ-----	২২২
(৫) নাবী-রাসুলদের মাঝে পার্থক্যের সাথে মায্হাবগুলির পার্থক্য তুলনা করা-----	২২২
উপসংহার-----	২২৩
'চার ইমামের পর ইজ্তিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে' এই বিবৃতির বিশ্লেষণ-----	২২৩
তাক্বলীদের দাবীকৃত সুফলের বিশ্লেষণ-----	২২৪

দাবী-১ঃ চার ইমামের শরীয়াহর বিষয়ে উত্তম সংগ্রহের সংকলন ছিলো ।	২২৪
খন্ডন	২২৫
১। দেওবন্দিগণ আক্বীদাহর সর্ব বিষয়ে তাদের ইমামের অনুসরণ করেন না ।	২২৫
২। ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ) এর শাগরেদগণ ইমামের বিপরীতে	২২৫
৩। দেওবন্দিগণ অন্যান্য ইমামদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন	২২৭
(ক) নিরুদ্দেশ স্বামীর জন্য স্ত্রীর অপেক্ষা করার সময়সীমা	২২৭
(খ) যাকাতের অর্থ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) ব্যবহার	২২৮
উপসংহার	২২৮
দাবী-২ঃ একই ইমামের অনুসরণ ধর্মে বিশৃঙ্খলা ও সন্দেহ অবদমিত করে	২২৯
১। কুর'আন ও সুন্নাহ্ মুসলিম উম্মাহুকে একতাবদ্ধ	২২৯
২। মুকাত্বিদগণ নিজেরাই অসংখ্য শাখা ও দলে বিভক্ত	২২৯
৩। প্রতিটি মায্হাবই ফতোয়ার ব্যাপারে একমত থাকেন না	২২৯
দাবী-৩ঃ এই ইমামদের উপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য আছে	২২৯
১ঃ ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ)ঃ	২৩০
২ঃ ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ)	২৩০
৩ঃ ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)	২৩০
৪ঃ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ)	২৩১
দেওবন্দিগণের চরম তাক্বুলী	২৩১
১ঃ তাক্বুলীদকে ঈমানের অংশ দাবী করা	২৩১
২ঃ মায্হাব অনুযায়ী হাদীসের বুঝ	২৩২
৩ঃ দুর্বল দলিলের প্রতি অনুরাগ	২৩৩
৪ঃ ইমাম কি ভুল করতে পারেন?	২৩৩
৫ঃ ইমামকে রক্ষা করার জন্য চরম পস্থা অবলম্বন	২৩৪
তাক্বুলীদ-ইস্তিবার বিপরীতধর্মী একটি মতবাদ!	২৩৫
তাক্বুলীদের উপর ফতোয়া, অবস্থার উপর নির্ভরশীল	২৩৬
দেওবন্দি-বেরেলভীদের বিবাদ থেকে শিক্ষা	২৩৮
শেষ কথা (উপসংহার)	২৪০
তাক্বুলীদের প্রতি আহ্বানের বাস্তবতা	২৪১
পরিশিষ্ট	২৪৩
পরিশিষ্ট ১ঃ সুফিবাদ শব্দের উৎপত্তি	২৪৩
আস্হাব আস্-সুফ্যা (সুফ্যায় বসবাসকারীগণ)	২৪৩
পরিশিষ্ট ২ঃ নাবী (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহর হাদীস সমূহের যথার্থতা	২৪৪

কিছু কথা, যা না বললেই নয়

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ সুব্বহানাহু ওয়াতাতায়ালা। দরুদ ও সালাম নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর আহুলে বাইত, সাহাবী আজমা'ঈন ও সকল সাগুফে সাগেহীন ও মু'মিনদের প্রতি।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সক্ষমতা দানের জন্য করুণাময়ের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ভাবিনি যে, দয়াময় প্রথম সংস্করণের তিন হাজার কপি এত দ্রুত প্রচারের তৌফিক দিবেন। আবারও শুকর আল্‌হামদুলিল্লাহ্!

এতে অবশ্য, অম্ল-মধু উভয় অভিজ্ঞতাই হয়েছে। যেমন- প্রশংসা দু'আ-খায়ের এর পাশাপাশি ভর্ৎসনা ও ভীতি প্রদর্শন [সমালোচনার পরিবর্তে; কারণ, সমালোচনা {অর্থাৎ, সম (ভালো ও মন্দ) + আলোচনা} করার মত যথার্থ আক্বীদাহ্, আ'মাল-আখলাক ও জ্ঞান (ইলম) বলতে কিছুই তাদের নেই, তাই]। গালাগালি ও ভীতি প্রদর্শনের জবাবে আমি বলি যে, আল্লাহ্ নির্ধারিত তাক্‌দীরের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে, মৃত্যু ক্ববুল করেই আমি এ কাজে ব্রতী হয়েছি; আল্লাহ্র রহমত ও ইচ্ছায় মৃত্যু-ভীতি আমায় কাজ করেনা বললেই চলে।

তাবলীগ, তথা- 'দ্বীনের প্রচার' বিষয়টি নাবীয়ালা সুন্নাহ্; যা অবশ্যই একটি উত্তম ইবাদাহ্। সকল মু'মিনের মনে রাখতে হবে, ইবাদাহ্ সঠিক এবং ক্ববুল হওয়ার জন্য শরীয়াহ্ নির্ধারিত অনেক শর্তের দুটি প্রধান শর্ত পালন অব্যর্থভাবে অপরিহার্য। তা'হলো- (১) ইবাদাহ্ নির্খাদ চিন্তে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শরীকবিহীনভাবে এক আল্লাহ্র জন্য হতে হবে; (২) প্রথম, তথা সর্ব-প্রধান শর্ত অর্জনের জন্য মু'মিনকে চেষ্টিত হতে হবে নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী, যা সম্পূর্ণ ওয়াহী নির্ভর। কোন মনগড়া পথ- পদ্ধতিতে নয়। এমনকি, তা যদি কোন নাবী-রাসুলের মন-মজ্জি মাফিক ও হয়, ওয়াহীভিত্তিক না হয়ে। বৃজুর্গ, পীর-ফাক্বীর, সাধারণ মানুষের পথ-পদ্ধতির তো প্রশ্নই উঠেনা।

তাবলীগ এর সঠিক পথ-পন্থার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় আরব জাহানের বিশ্ব বরণ্য আ'লীম ডঃ শাইখ্ সাগেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান এর মুখবন্ধে [যা, ডঃ শাইখ্ রাবী বিন হাদী উমাইর আল মাদখালী সংকলিত “মানহাজুল আশিয়া ফিদ-দাওয়াতি ইলাল্লাহ্ ফীহিল হিকমাতু ওয়াল আক্বল” নাবীদের দাওয়াতী নীতিঃ বিবেক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাৎশায় অনুদিত) এ বর্ণিত]। তাঁর গবেষণায় ক্বুরআন ও সুন্নাহ্র দ্বারা প্রমানিত এ সকল সঠিক ভিত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেলো :

১। ইলুম (জ্ঞান) : দায়ী যে বিষয়ের দাওয়াত (আহ্বান) জানাবেন, সে বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকা। অজ্ঞ-মূর্খ দায়ী হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। (দুঃখজনক হলেও সত্য, এ জামায়াতের প্রায় সকল সদস্যই দায়ীর দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই আলীম। কি হাস্যকর অবাস্তব বিষয়।) আল্-কুর'আনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতের শুরু 'ইকুরা' অর্থ 'পড়' (৯৬ঃ০১) দিয়ে। যার অর্থ ও ব্যাখ্যা অধিকাংশ মুফাস্সীরে কুর'আন শুধু 'পড়' নয়, জ্ঞানার্জন বলেও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ কুর'আনের সূরাহ মুহাম্মাদ এ বলেছেন, “অতঃপর জেনে নাও [জ্ঞানার্জন কর, হে মুহাম্মাদ (সাঃ)] যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।” (৪৭ঃ১৯)। এখানে প্রথমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত ও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে নাবী (সাঃ) কে। তার আগে তাবলীগের বা প্রচারের কথা বলা হয়নি। সূরাহ ইউসুফে বর্ণিত হয়েছে, “বলুন [হে মুহাম্মাদ (সাঃ)], এই আমার পথ; আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দেই, আমি এবং আমার অনুসারীগণ (১২ঃ১০৮)।” এ ছাড়া, সূরাহ বানী ইসরাইলে আল্লাহ বলেছেন, “বলোনা বা করোনা/ স্বাক্ষ্য দিওনা / অনুসরণ করোনা”, (সে বিষয়) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই” (১৭ঃ৩৬)।

২। আ'মাল (দায়ীর নিজের অনুশীলন) : দায়ী যে বিষয়ের দাওয়াত দিবেন, সে বিষয়ে নিজে আ'মাল বা চর্চা করা; যাতে, তিনি একজন অনুসরণযোগ্য উত্তম আদর্শে পরিণত হতে পারেন। যার কাজ তার কথার সত্যায়ন হয়। মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-র অনুসারীগণকে প্রায়ই এর বিপরীতে পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায়, ঘুষখোর / মুনাফাখোর/সুদখোর/কমিশনখোর/ কালোবাজারী/ স্থলিত চরিত্রের দাড়ি কামানো মুখে টাখনুর নীচে কাপড় পড়া কেউ দায়ীর কাজ করছেন। আল্লাহ তাঁর নাবী শুআইব (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর গোত্রকে বলেন “আমি চাইনা যে, তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করি, নিজে তা করি। আমি (তোমাদেরকে) যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই।” (১১ঃ৮৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা কেন তা বল, যা তোমরা করনা? আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত জঘন্য যে, তোমরা যা বল, তা করনা” (৬১ঃ২-৩)। অপর পক্ষে, আল্লাহ যথোপায়ুক্ত আ'মালকারীর বেলায় বলেন, “তাঁর কথার চেয়ে উত্তম আর কার কথা, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, আ'মালে সালেহ করে ও বলে যে, নিশ্চয়ই আমি সমর্পনকারীদের একজন ” (৪১ঃ৩৩)। এখানে বাংলা প্রবচন - “আপনি আচারী ধর্ম, পরেরে শিখাও” একেবারে নির্ভুলভাবে প্রযোজ্য।

৩। ইখলাস (নিখাদ নিঃস্বার্থ নিবিষ্ট-চিন্তা)ঃ দাওয়াত দিতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। কোন প্রকার লৌকিকতা, সুনাম-সুখ্যাতি, কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব অর্জন, বা দুনিয়াবী কোনরূপ লোভ লালসা চরিতার্থকরণ, ইত্যাদি, কোন ধরণের মনোভাব পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ্ কুর'আনে নাবীগণ সম্পর্কে আমাদের জািয়েয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের জাতিকে বলতেন, “আমি এ জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না (১১:৫১); বা ধন-সম্পদ চাইনা (১১ঃ২৯)। সূরাহু সাবায় মুহাম্মদ (সাঃ) এর জবানীতে আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, “বলুন [হে মুহাম্মদ (সাঃ)]..... আমার পারিতোষিক শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে ” (৩৪ঃ৪৭)।

৪। দা'ওয়াতের বেলায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (তাওহীদ) দিয়ে শুরু করতে হবে; অতঃপর, গুরুত্বের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দিতে হবে : ইবাদাহুকে শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য আক্বীদাহ্ সংশোধন, তথা- পরিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ অর্জনের দাওয়াত সর্বাত্মে দিতে হবে। ওয়াহদানীয়াত, তথা-‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’র দা'ওয়াত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত সমগ্র নাবী-রাসুলগণ সর্বাত্মে দিয়ে গেছেন। সঠিকভাবে ইবাদাহ্ করার জন্য সর্বপ্রথম এবং প্রধান হচ্ছে, বিশুদ্ধ তাওহীদী জ্ঞান। এটি একটু কঠিন এবং জটিল। যে জন্য আল্লাহর রাসুল (সাঃ) মাক্কী জীবনের একাধারে সূদীর্ঘ তের বছর যাবৎ তাওহীদের বানীই প্রচার করেছিলেন। তার আগ পর্যন্ত সলাহ, যাকাত আদায়, সিয়াম ও হাজ্জ পালনের নির্দেশ দেননি। আক্বীকাহ্ সংশোধনের পর উপরোক্ত অত্যাাবশ্যকীয় কাজগুলো করার এবং সকল নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার নির্দেশ দিতে হবে।

ওয়াহদানীয়াতের অসংখ্য আয়াত কুর'আনে আছে, তা থেকে দু'খানা উদ্ধৃত করছি প্রাসঙ্গিকতায়-“আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মাহুয় (জাতিতে) রাসুল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদাহ্ কর ও ত্বাগুতকে বর্জন কর (১৬ঃ৩৬)’। “আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি এই প্রত্যাদেশ করেছি যে, একমাত্র আমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। অতএব, কেবল আমারই উপাসনা কর (শরীকবিহীনভাবে) (২১:২৫)।

৫। সব্র (ধৈর্য ধারণ) করা : আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে যেয়ে প্রচুর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হবে; এতে সব্র করতে হবে। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং কষ্টকাকীর্ণ। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন সকল নাবী-রাসুলগণ। কুরআনের বানী-

“এবং নিশ্চয়ই, আপনার পূর্বে প্রত্যেক রাসুলের সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রোপ করা হয়েছে। এরপর, তারা যা কিছু নিয়ে তাঁদের উপহাস করতো, তা তাদেরকেই গ্রাস করলো। (০৬ঃ১০)।” “আপনার পূর্বে বহু রাসুলকেই অস্বীকার করা হয়েছে, তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছেন সে বিষয়ের উপর, যে বিষয়ে তাঁদেরকে মিথ্যারোপ করতো, এবং তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত না আমাদের সাহায্য পৌঁছেছে তাঁদের কাছে (০৬ঃ৩৪)।”

দাওয়াত প্রদানে যে বা যারা যত বেশী নাবী-রাসুল (আঃ) গণকে অনুসরণ করবেন, তাঁরা তত বেশী দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হবেন। কিন্তু, আল্লাহর কাছে তত বেশী পুরস্কার তাঁরা প্রাপ্ত হবেন।

৬। দায়ীকে অবশ্যই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও হিকমাহপূর্ণ, তথা -প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় কুশলী, হতে হবেঃ

মানুষের কাছে দাওয়াত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য এ দুটি গুণাবলী একেবারে অপরিহার্য। আল্লাহ তাঁর নাবীদ্বয় মুসা ও হারুন (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন উদ্ধৃত ফিরাউনকে হিকমাহ ও প্রজ্ঞা অবলম্বন করে এভাবে দাওয়াত দিতে - “আপনারা উভয়ে তাকে নম্র কথা বলুন, হয়তো, সে চিন্তা-ভাবনা বা ভয় করতে পারে (আল্লাহকে) (২০ঃ৪৪)।” বিনয়ী বিচক্ষণ ও কৌশলী হওয়ার বিকল্প কিছু নেই দা’য়ীর জন্য। আল্লাহ নাবী (সাঃ) কে উপদেশ দিয়ে বলেন, “আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে (মানুষকে) আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে উত্তমভাবে যুক্তি তর্ক দিন (১৬ঃ১২৫)।”

৭। দায়ীকে অবশ্যই দৃঢ় আশাবাদী হতে হবে : দাওয়াতের কার্যকারীতা, জাতি-গোষ্ঠীর হীদায়াহ্ ও আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হওয়া যাবেনা; তা যত দীর্ঘায়ীতই হোক। এ ব্যাপারে দা’য়ীদের জন্য নাবী-রাসুলগণের মাঝে রয়েছে সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শিক দৃষ্টান্ত। নাবী নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত দেওয়ার পর মাত্র অল্প কিছু লোক ঈমান এনেছিল। নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর যখন কফিরদের নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল, তখন তাঁর নিকট আল্লাহর ইচ্ছায় পাহাড়ের ফিরিশতা এসে দুই পাশের পাহাড় এনে সেই ক্বাউমকে চেপে ধ্বংস করার অনুমতি চাইলে তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, “না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাকে সময় দিন; হতে পারে, আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ (বংশধর) থেকে এমন কাউকে বের করতে পারেন, যারা শুধু আল্লাহর ইবাদাহ করবে, এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবেনা।” [বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে

বর্ণিত ।। দায়ী ইলাল্লাহর যদি উপরোক্ত গুন না থাকে, তা'হলে, সে পথের শুরুতেই থেমে যাবে । ফলে, তার জন্য ব্যর্থতা অনিবার্য ।

দ্বীন প্রচারের গতি তথা- আওতা হচ্ছে- দা'য়ী সর্বপ্রথম তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন নিকটাত্মীয়দের দা'ওয়াত দিবেন । অতঃপর পাড়া-মহল্লা, শহর ও শহরতলী পর্যন্ত দ্বীনের প্রচার তার পরিধি । এর বাইরের দায়ীত্ব খলিফা, তথা- রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের । যেমনটি নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) করেছিলেন, মু'য়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়েমেনে হাবিব নাজ্জাশীর রাজত্বে ও আবু সুফিয়ান (রাঃ) কে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠিয়ে । এগুলো মুত্তাফাক্কুন আলাইহেতে বর্ণিত আছে ।

এতক্ষন, সুন্নাহ্ অনুযায়ী তাবলীগের নিয়ম জানলাম । এখন সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আপনারাই বিবেচনা করুন, যে পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের তাবলীগ অত্র এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে হচ্ছে, তা বিদ্'আহ্ ছাড়া অন্য কিছু কিনা! কারণ, সওয়াবের উদ্দেশ্যে সুন্নাহ্ বহির্ভূত পছায় যে কোন ইবাদাহ্‌ই বিদ্'আহ্ । আর বিদ্'আহ্‌তের পরিণতি জাহান্নাম । সহীহ্ মুসলিমে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক খুতবায় রাসুল (সাঃ) বলেন, “বাস্তবিক, সর্বোত্তম বানী হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ-নির্দেশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দেয়া জীবন বিধান । পক্ষান্তরে, নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে, নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ; আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত মতাদর্শই, সুস্পষ্ট গোমরাহী” । আরেক বর্ণনায় এটুকুও যুক্ত আছে- “প্রত্যেক গোমরাহুর পরিণাম জাহান্নাম” (সহীহ্ আন- নাসাঈ) ।

ছোট-বড় বেশ কিছু ভ্রম সংশোধন করা হয়েছে এই সংস্করণে বিদ্বান পাঠকদের সহযোগীতায় । আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে জাযা'য়ে খাইর দান করুন । ক'জন সম্ভরোধ চিল্লাহ্ দেওয়া এবং যুবা ও অল্প বয়সী পাঠক ও গ্রন্থখানা পাঠে উপকৃত হয়ে তাওবা করে হিদায়াহর সঠিক পথে এসেছেন বলে জানিয়েছেন । আল্লাহ্ তাঁদের জান্নাতী করুন, আমীন ।

কোন ভাষারই বিকল্প নেই, আরবীর তো নয়ই । তবুও যে শব্দগুলো আরবী ভাষা থেকে এসেছে, সেগুলো প্রচলিত বাংলা বানান ও উচ্চারণ অনুযায়ী না লিখে ব্যাকরণিক উচ্চারণের শুদ্ধতার কাছাকাছির জন্য, আরবী উচ্চারণ অনুযায়ী প্রকাশের

প্রয়াস পেয়েছি। যেমন- ‘ইবাদাহ্’, ‘সালাহ্’, ‘বিদআহ্’, ‘ক্বাবর’, ‘মাস্জিদ’, ‘নাবী’ ইত্যাদি।

এই সংস্করণ প্রকাশেও বন্ধু শেখ শামসুদ্দীনের অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগীতা পেয়েছি। এছাড়াও যাদের সাহায্য-সহযোগীতায় দ্বিতীয় প্রয়াস সফল হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউস নাসিব করুন, আমীন।

পরিশেষে, উত্তম কিছু করে থাকতে পারলে, তার সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলার। আর ভুল-ভ্রান্তির দায়ভার আমাদের, আল্লাহ্ যেন সংশোধনের তাওফীক দেন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াহিফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুর্সালীন, ওয়ালা হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আ’লামীন।

মুহাঃ মু’মিনুল হক্।

ইসলাম হাউজ, ৩৫/৮/১ শান্তিনগর,

পীর সাহেবের গলি, ঢাকা-১২১৭।

মোবাঃ ০১৯১১৩৯০৩০০

০১৭৪৭৭৫৬৪৪৬।

★ ভাষান্তর, সম্পাদনা ও বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে কিছু কথন ★

ইব্রাহীম হাম্বালিল্লাহ্ । নাহ্‌মাদুহ্ ওয়া নাস্তাহ্‌দ্বিয়হি ওয়া নাস্তাগফিরুহ্ । ওয়া নাউযুবিল্লাহি মিন গুরুরি আনফুছিনা, ওয়া মিন সাযিয়াআতি আ'য্মালিনা; মাইইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহ্ ফালা মুদিলালাহ্ ওয়া মাইইয়্যাদুল্লাহ্ ফালা হাদিয়া লাহ্ । ওয়া আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহ্‌দাহ্ লা শরীকা লাহ্, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহ্ ওয়া রাসুলুহ্ । (বুখারী ও মুসলিম ।)

অর্থাৎ- অবশ্যই সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্য । আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি । তাঁর নিকট হিদায়াহ্ কামনা করছি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আমরা নাফসের অকল্যান হতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ও মন্দ আমল থেকে ও তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি । আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ পথে আনতে পারে না । আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসুল ।

দ্বীনী ইল্ম অর্জনের চেষ্টা বলতে গেলে আর দশজন বাঙালী মুসলমানের মত আশৈশব । তবে, গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনায় নিয়োজিত গত সাত-আট বছর যাবত । আল্লাহ্ যেন যথাযথ তাক্বওয়া, পরিশুদ্ধ আমল এবং সহীহ্ ভাবে দা'ঈর কাজ করার মানসে আজীবন দ্বীনী ইল্ম চর্চার তৌফিক দেন; আমীন ।

গুরুজন হেনা ভাই এক দিন “The Jamaat Tableegh and the Deobandis” গ্রন্থটি দেখিয়ে অনুবাদে শংকা প্রকাশ করেন আমাদের গৌড়া-ধর্মাস্ত্র পরিবেশের কারণে । আল্লাহ্ ভরসা করে, তাক্বদীরের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে আমি এটি অনুবাদে আগ্রহ প্রকাশ করি;..... সেই থেকে শুরু.... এবং শেষ । মাঝে, অবশ্য ভাই প্রকৌশলী আজিজুল ইসলাম কামাল (আমার জ্বীর বড় বোনের স্বামী) এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তুতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হয়ে অর্ধেকের বেশী সরাসরি Computer এ অনুবাদ করে ফেলেন । এ জন্য আল্লাহ্ যেন তাঁকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিফল দেন ।

আমি সমগ্র পাঠক, তথা-সকল মুমিন ভাইবোনদের সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ভাবাবেগের প্রভাবে “এত লোক যা করছে তা ভুল বা বিদয়াহ্ হতে পারে না, তাই যা করছি ঠিকই আছে” এই ধরনের ধারণায় আপুত না হয়ে মহান আল্লাহর এই বাণী “ওয়া ইন্ তুতি'য় আকছারা মান ফিল আরদি ইয়ুদিল্যুয়কা আন্ ছাবিল্লাহ্,” অর্থাৎ- ‘যদি আপনি ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত অধিকাংশের অনুসারী হোন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে

ফেলবে' (আল-আন'আম : ১১৬)র প্রতি খেয়াল করেন এবং প্রকৃত উদার-উন্মুক্ত মন নিয়ে অত্র গ্রন্থের বিষয়-বস্তু সুস্থ-শীতল মেধা-মনন দিয়ে যথাযথ ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেন; ফলশ্রুতিতে, দ্বীন ইসলামের সহীহ রাকন্-আহকাম অনুযায়ী দা'ঈর দায়ীত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন। কারণ, আল্লাহ সুব্বহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন,.....

- জিজ্ঞেস করুন, “অন্ধ ও চক্ষুন্মান কি সমমানের? তাই, কেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করনা।” (আল-আন'আম : ৫০)।
- বলুন, অন্ধ ও চক্ষুন্মান কি সমান; বা আঁধার ও আলো কি এক? (আর্-রাদ : ১৬)।
- বলুন, যারা জানে, আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্নরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। (আয-যুমার : ০৯)।
- আর সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুন্মান; অন্ধকার ও আলো; ছায়া ও রৌদ্র। এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত; নিশ্চয়ই, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, আপনি শুনাতে পারবেন না যারা ক্বাবরে রয়েছে, তাদের। (আল্-ফাতির : ১৯-২২)।
- এবং নিশ্চয়ই, আমরা বহু জীব ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখেনা; তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনে না; এরাই হলো পত্তর ন্যায়, বরং এর চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। এরাই হলো প্রকৃত অমনোযোগী (তাচ্ছিল্যকারী) বা ঘাফিল। (আল্-আরাফ : ১৭৯)।
- বলুন, “আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব তাদের, যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পত্ত হয়; যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (আল্-কাহফ : ১০৩-১০৪)।

আল-কুর'আনে এরূপ আরো অসংখ্য তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য বারংবার (Repeatedly) বর্ণিত হয়েছে, যাতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। বর্তমান প্রেক্ষাপটের আঙ্গিকে উপরোক্ত আয়াতগুলো কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। এছাড়া, আমি মনে করি, সব বিদ্বৎ পাঠককুলের এই ঐশী বাণীসমূহের তাৎপর্য মোটামুটি বোধগম্যতার আওতায়; অন্যথায়, কুর'আন-হাদীস চর্চা-ই বৃথা। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরেকটি বাণী উল্লেখ না করলেই নয়; তা হচ্ছে, “এরূপেই আমরা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের আ'মলকে দৃষ্টিনন্দন করে দিয়েছি” (আল-আন'আম : ১০৮)। আমরা আমাদের চোখ, কান ও বিবেক থাকা সত্ত্বেও এদের সঠিক ব্যবহার না করতে পারার দরুন ভাল-মন্দ এবং হিদায়াহ-গোমরাহীর ফারাক বুঝতে/করতে পারছি না। পরিনামে, “সূরাহ আল-আন'আমের ১০৮ নং

আয়াত” অনুযায়ী সুন্দর নেক আমলের পাশাপাশি, মন্দ এবং শির্ক-বিদয়াহ্ মিশ্রিত কাজগুলোও মনোহর (শয়তানের ওয়াস্-ওয়াসা বা ধোকার জন্য) আমাদের কাছে। এই অক্ষমতা দূর করতে হলে, আমাদেরকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পড়াশুনার মাধ্যমে তাওহীদ (আক্বীদাহ্)- শির্ক, ঈমান-কুফর ও সুন্নাহ্-বিদয়াহ্ সম্পর্কে সম্যক ও স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে; এর কোন অন্যথা বা বিকল্প নেই। অত্যন্ত পরিতাপ ও সুগভীর নির্বুদ্ধিতার বিষয় যে, ক্ষণস্থায়ী জীবনে যৎপরোনাস্তি প্রতিযোগিতামূলক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডক্টরেট, ব্যারিস্টারী, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টসী, এম.বি.এ, বি-এ, এম-এ, ইত্যাদি পাশ করার জন্য কত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় গাঢ়-গাঢ়া, ভুরি-ভুরি বই-পুস্তক (দেশ-বিদেশ ঘুরে হলেও) আত্মস্থ করছি; অথচ, চিরস্থায়ী (অনন্ত) পরকালের সুন্দর জীবন লাভের জন্য কুর’আন-সুন্নাহ্ কিছু কিতাব (বই-পুস্তক) অধ্যয়নের আগ্রহ বা সুযোগ কোনটাই আমরা করতে পারি না। তখন দায়সারা ভাবে স্মরণাপন্ন হই (তথাকথিত) আলেমদের, যাদের বেশীর ভাগেরই জ্ঞান (ইল্ম) অত্যন্ত অপ্রতুল, অগভীর, অপরিপূর্ণ, নানারকম পক্ষপাতদুষ্টতায় দুষ্ট; ও সর্বোপরি, ক্ষেত্র বিশেষে শরীয়াহ্ বিরোধী শির্ক-বিদয়াহ্ মিশ্রিত আমল এর অধিকারী; যা আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সুন্দর (দ্রষ্টব্য- এই আঙ্গিকে উল্লেখিত সূরাহ্ আল-আন’আমের ১০৮ নং আয়াত ও সূরাহ্ আল কাহ্ফ এর ১০৩-১০৪ নং আয়াত দ্বয়)। শয়তানের ধোকা (ওয়াস্-ওয়াসা)য় সুগভীর ভাবে আপুত বিধায় আমরা এ অক্ষমতা, তথা- আপাদমস্তক অজ্ঞতার নাগপাশে শৃঙ্খলিত। কিন্তু, কোন অজুহাতেই আখিরাতে পার পাওয়া যাবে না। এমনকি মাওঃ আক্তার ইলিয়াস, মাওঃ যাকারিয়াহ্ বা তাবৎ বিশ্বের যাবতীয় তথাকথিত বৃজুর্গদের দোহাই দিয়ে ও। কেননা আল্লাহ্ সুব্বহানাহ্ ওয়া তায়ালা বলেন, -

“এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো ভার বহন করবে না”। (বাণী ইসরাইল/১৭ঃ১৫)।

যদি কোন অত্যাধিক ভারাক্রান্ত ব্যক্তি তার বোঝা বহন করতে অন্য ভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করে, তবে তা হতে কিছুই বহন করা হবে না, যদিও সে তার নিকটতম আত্মীয় হয় (আল-ফাতির/৩৫ : ১৮)।

আর সেই দিনের ভয় কর, যখন না পিতা পুত্রের কোন উপকারে আসবে; আর না পুত্র পিতার কোন উপকারে আসবে (সূরাহ্ লুক্‌মান/৩১ঃ৩৩)।

আরো দেখুন আল্ কুর’আনের ০৬ : ১৬৪, ৩৯ : ৭ ও ৫৩ : ৩৮ আয়াত সমূহ একই বিষয় বস্তুর জন্য। এখানে আল-কুর’আনের সূরাহ্ মুহাম্মদ এর ৩৩নং আয়াত, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণ কর, আর (তা না করে) তোমাদের আ’মলগুলো বরবাদ করো না” উল্লেখ করাও খুবই প্রাসঙ্গিক এবং জরুরী মনে করছি।

উত্তরণ ইনশাআল্লাহ্, অবশ্যই সম্ভব, -- তা'হলো উপরোল্লিখিত তাওহীদ-শিক্, ঈমান-কুফর ও সুন্নাহ্-বিদ্যাহর জ্ঞানে সুশিক্ষিত হয়ে খুবই দৃঢ় ঈমানী শক্তি ও প্রকৃত সদিচ্ছায় বলীয়ান হওয়া। অন্যথায় যা হবে, তা আল্লাহ্ জালাহ্ শা'নুহর কালাম - “যে ইহলোকে অন্ধ, পরলোকে ও সে অন্ধ এবং আরো বেশী পথভ্রষ্ট” (আল-ইসরাঃ ৭২) এ যথাযথভাবে বর্ণিত।

গ্রন্থটি অনুবাদে (সহজবোধ্যতা আনার জন্য) চলতি ভাষার আশ্রয় নিয়েছি। বিষয়বস্তুর বক্তব্য যথার্থ হওয়ার জন্য আক্ষরিক অনুবাদে না যেয়ে মর্মার্থ বা ভাবার্থ এর দিকে খেয়াল রেখেছি। এর পরে ও হয়তো ব্যত্যয় ঘটে থাকতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে যথার্থ মর্মোদ্ধারে অসফল হয়ে। এই সাধ্যাতীত অক্ষমতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কুর'আনের আয়াত এবং হাদীসের অনুবাদে সাহায্য নিয়েছি ডঃ মুজিবুর রহমান, মাওঃ মুহিউদ্দীন খান ও শাইখ্ আকরামুজ্জামান সাহেবের। শেখোক্ত জন সম্পর্কে একটু ধারণা দেয়া প্রাসঙ্গিক; যেহেতু, প্রথমোক্ত দু'জন সম্পর্কে প্রায় সবাই কমবেশী অবগত। শাইখ্ আকরামুজ্জামান ঠাকুরগাঁও এর অধিবাসী, বর্তমানে উত্তরখান (ঢাকা)র বাসিন্দা। তিনি ১৯৮৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী (স্নাতক, সম্মান) অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিকতায় খাপ খাওয়াতে না পেরে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণের জন্য আশ্রয় চান। আল্লাহ্ তাঁর ডাক কবুল করে স্কলারশিপের মাধ্যমে বিশ্ব সেরা মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে চার বছরে আরবী (ভাষা) তে “লীসাল” ডিগ্রী অর্জনের তৌফিক দেন ১৯৯৪ সনে। পরবর্তীতে দারুল ইহুসান ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি এ যাবৎ প্রায় ৬০ (ষাট) খানা দ্বীনি পুস্তিকা ও গ্রন্থ সংকলন, ভাষান্তর ও সম্পাদনা করেছেন। বর্তমানে একটি ক্যাডেট মাদ্রাসা (ইংরেজী মাধ্যম) পরিচালনা ও দা'ঈর কাজ করছেন। ইতিপূর্বে তিনি “রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, কুয়েত: ঢাকা শাখার পরিচালক ছিলেন। গত চার/পাঁচ বছর যাবত তাঁর সঙ্গে আমার জানাশুনা। আমার জানা মতে, তাঁর মত কুর'আন-সুন্নাহ্য় এত গভীর ও সহীহ্ জ্ঞানের আলেম খুব কমই আছেন বাংলাদেশে। তিনি এই অনূদিত গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন বহুলাংশে, বিশেষ করে কুর'আন-হাদীস অংশ। তাঁর সঙ্গে সামগ্রীক সম্পাদনার দায়িত্ব আমি ও পালনে সচেষ্ট হয়েছি অনুবাদের পাশাপাশি। এ ধরনের দ্বীনি জটিল গুরুভারসুলভ উদ্যোগ আমার পক্ষে এই প্রথম পালিত হলো। কাজেই, স্বাভাবিক মানবীয় ভ্রান্তির চেয়ে এক্ষেত্রে আরেকটু বেশী ও হতে পারে। অনুরোধ, সবাই যেন ক্ষমাসুন্দর ভাবে গ্রহণ করেন; এবং প্রকৃত ভুল-ত্রুটিগুলো দলিলসহ ধরিয়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবো। আল্লাহর অশেষ কৃপায় কতিপয় মুমিন-মুমিনার আর্থিক অনুদানে প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও অন্যান্য সার্বিক সহযোগীতায় যারা

জড়িত; বিশেষ করে বন্ধু শেখ শামসুদ্দিন আহ্মাদের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সবাই যেন ইহ ও পরকালে উত্তম পুরস্কার, তথা জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেন, আল্লাহর কাছে এই দু'আ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সবার পক্ষ থেকে এই গ্রন্থখানি কবুল করুন, সব মুমিন বান্দাহ যেন এর দ্বারা উপকৃত হোন তাঁর অশেষ রহ্মতে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি দরুদ ও সালাম জানাই। অন্যান্য নাবী (আঃ) দের প্রতিও সালাম। সকল সাহাবা (রাঃ), তাবয়ী (রঃ) (সাল্ফে সালেহীন)দের প্রতি ও সালাম। সমস্ত মৃত ও জীবিত মুমিন বান্দাহ বাঁদীদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে অতি উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য দু'আ করছি। পরিশেষে, “আলহাম্দু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'য়মাতিহি তাতিমুন্স সালিহাত।,” [অর্থাৎ-শুধু কেবল আল্লাহরই জন্য সমুদয় প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহ (নিয়ামত) এর কল্যাণে সকল উত্তম কাজ সুসম্পন্ন হয়।]

মুহাঃ মুমিনুল হক

বি-০৬/৯০৩ মাঃ লেঃ ভিঃ কোঃ হাঃ সোঃ লিঃ (শাইন পুকুর),

১নং বক্স নগর, মিরপুর # ০১,

ঢাকা-১২১৬।

মোবাঃ ০১৯১১৩৯০৩০০, ০১৭৪৭৭৫৬৪৪৬।

জিলকদ, ১৪৩০ হিঃ/নভেম্বর ২০০৯ ঈঃ।

বিঃ দ্রঃ আল কুর'আনের উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা তাফসীর গ্রন্থ, যথা- তাফসীর ইবন কাসীর, তাফহীমুল কুরআন, মা'রেফুল কুর'আন, ইত্যাদিতে দেখতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল।

সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে যারা কৌতূহলী, তাঁরা ইচ্ছে করলে ইংরেজী গ্রন্থ “The Jamaat Tableegh and the Deobandis” খানি www.ahya.org ওয়েব সাইট থেকে সরাসরি Download করে নিয়ে অত্র অনুবাদের সংগে মিলিয়ে দেখতে পারেন অনায়াসে। আরো চেক করতে পারেন www.qsep.com ওয়েব সাইট।

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালামের জরুরী কিছু কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে আশ্রায় ফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করে শান্তিপূর্ণ জীবন ও সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য আলহ কুর'আন নাযিল করেছেন। ছলাত ও সালাম নাযিল হোক নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি আমাদেরক আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল ও অবিচল থাকার সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশিকা হিসাবে কুর'আন ও সুন্নাহ দান করে গেছেন। এদুটির মাধ্যমে একটি জাহিলী সমাজকে শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজে পরিণত করেছিলেন। মুসলিম জাতি যখনই এদুটিকে পরিত্যাগ করবে, তখনই তাদের ভিতর জাহিলিয়াত ফিরে আসবে।

এদুটির পরিত্যাগ, শুধু পঠন পাঠন পরিত্যাগ নয়, বরং এদুটির আ'মল পরিত্যাগ হল, ও দুটির সঠিক ও সুষ্ঠু বুঝ-ব্যবস্থা ও দিক নির্দেশনা না জেনে বা জানার চেষ্টা না করে ভক্তি রাখা ও আ'মলের দাবী করা। কুর'আন-সুন্নাহর অধিকাংশ ভক্ত ও মান্যকারী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর অধিকাংশ প্রেমিক ও অনুসারী (৭৩ দলের মধ্যে ৭২ দলই) পথভ্রষ্ট, জাহান্নামের অধিবাসী। এদের সকলের আসল অপরাধ হল, কুর'আন-সুন্নাহর ভ্রান্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা করা। এবং কুর'আন সুন্নাহ বহির্ভূত অনেক বিষয়কে ধ্বিনের অন্তর্ভুক্ত করা; যা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর এই হাদীসের স্পষ্ট লঙ্ঘন- “আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু ছেড়ে গেলাম, কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না, যতক্ষণ ঐ দুটিকে আকড়িয়ে ধরে থাকবে। একটি- আল্লাহর কিতাব আল-কুর'আন এবং অপরটি আমার সুন্নাহ, তথা-আল-হাদীস” (মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক)। আমাদের বাংলাদেশ-ভারত বর্ষের মুসলিম সম্প্রদায় যে সব বাত্বিলের সয়লাবে নিমজ্জিত তাহলো সূফীবাদ, মাযহাবী গৌড়ামী, বিধর্মীদের প্রবর্তিত দলমত; যেমন, কাদিয়ানী, বাহাঈ, ইত্যাদি। এসব বাত্বিল ৭২টি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহান্নামী দলের সেতুবন্ধন।

সূফীবাদের ধারক বাহকগণকে দুটি ধারায় বিভক্ত দেখা যায়। একটি ব্রেলভী ও অপরটি দেওবন্দি। দুটির মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য। আমাদের দেশে তথাকথিত তাবলীগ জামা'য়াত দেওবন্দি ধারায় প্রবাহিত একটি দাওয়াতী দল। তাদের দাওয়াতের অবলম্বন হল ফাযায়িল। ইসলামের যে সব বিষয় ফাযীলাত দ্বারা বুঝানো সম্ভব, সে সব বিষয়ে ছহীহ, যঈফ, জাল-বানোয়াট হাদীসের অবতারণা করে।

ফাযায়েল দিয়ে দলের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন, যার নাম “তাবলীগী নিছাব”, বা “ফাজায়েলে আ’মল”। ফাযায়েলের মাধ্যমে এদেশের বৃহৎ সংখ্যক সহজ-সরল অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলিম, এবং পেশা ও পদমর্যাদার অপব্যবহার করে যারা বহু অপরাধ ও অন্যায় করে কিছুটা অনুশোচনা বোধ করেন তাদের জন্য শর্টকাট সুন্দর ব্যবস্থা হল এই জামা’য়াত। সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার ও অপরাধ করে ও জড়িত থেকে ফাযীলাতের উপর চড়ে পার হয়ে যাওয়ার সুব্যবস্থা এদলে আছে। এরা যেমন সবার জন্য উন্মুক্ত, তেমনি এদের জন্য সব বাতুল সম্প্রদায়, দেশ ও জাতি উন্মুক্ত। যার ফলে, আশংকা ও উদ্বেগজনক ভাবে এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক কারণে ইহুদি-নাসারা ও তাদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের সংখ্যার প্রদর্শনী বা মহড়া প্রদর্শনের বাৎসরিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ফেলেছে, যা বিশ্ব-ইজতিমা নামে পরিচিত, প্রতিবছর টঙ্গী তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ইসলামী পণ্ডিত মনে করেন, ইসলাম ধর্ম সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ভাবে না জানার ও না মানার কারণে আল্লাহর গজব হিসেবেই বিশ্ব-ইজতিমা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি ধর্মের নামে গজব ছাড়া আর কিছু না, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দমন করতে পারবেনা। ‘কাফানাল্লাহ গুরুরাহ ওয়া আযরারাহ’ (অর্থাৎ, - এর ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে কেবল আল্লাহই রক্ষাকারী)। আরব বিশ্বের জৈনিক আলিম আল্লামাহ রাইদ হবররী বিশ্বের মুসলিম যে সব বিদআহ (দ্বীনের ভিতর নতুন সংযোজন ও পরিবর্তন সাধন) করে ইসলামের বিকৃতি ঘটিয়ে চলেছেন এর উপর নির্ঘণ্ট গ্রন্থ সংকলনের সময় তথাকথিত এই বিশ্ব ইজতিমায় সরেজমিনে এসে তার সার্বিক অবস্থা কুর’আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পর্যবেক্ষণ করে এ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে ‘আলিফ’ অক্ষরের আওতায় লিখেছেন : * ইজতিমাউত্ তাবলীগিয়ীন ফিল্ বিলাদিল’ আজামিয়াহ্ হাযিহী মিন আক্বারিল বিদ্বা’হ্ আল্লাতী রআইতুহা ফী বাংলাদেশ (অর্থাৎ, অনারব বিভিন্ন দেশের তাবলীগ জামা’য়াতের ইজতিমাগুলোর মধ্যে যেসব বড় বিদআহ দেখেছি, তার ভিতর বাংলাদেশের বিশ্ব ইজতিমা সর্ববৃহত্তম)। কারণ, এই বিশ্ব ইজতিমায় অনেক গুলো বিদআহের সমাহার ঘটেছে। যেমন-

- ১। বিশ্ব-ইজতিমাকে হাজ্জের ইজতিমার সাথে তুলনা করা হয়। এমনকি, অনেকে দ্বিতীয় হাজ্জ বলেই অভিহিত করেন।
- ২। ফার্ম নামাজ নষ্ট করা হয়। মাইক্রোফোন বা মাইক ব্যবহার অবৈধ ধারণা করায় পিছনে বহু মুকাব্বির নিযুক্ত হয়। লক্ষ লক্ষ লোকের কারণে এক পর্যায়ে মুকাব্বিরদের পরস্পর শব্দের সংঘর্ষের কারণে ইমামের শব্দের সাথে সমন্বয় হারিয়ে যায়; ফলে, একই নামাযের কেউ প্রথম রাক’আতে তো কেউ দ্বিতীয় রাক’আতে, কেউ তৃতীয় রাক’আতে তো কেউ চতুর্থ রাক’আতে, কেউ দাড়ানো,

কেউ রুকুতে, কেউ সাজদাহতে। আবার ইদানিং (শুক্রবারের) জুম'আ নষ্ট করাও পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে।

৩। এত লোকের সমাগমের কারণে, অনেক অজ্ঞ এটিকে বরকতপূর্ণ মনে করছেন, যার জন্য বরকতের আশায় এখানে বহু বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৪। তিন দিন মেয়াদ শেষে আখিরী মুনাজাত নামে লম্বা চণ্ডা একটি সম্মিলিত দু'আ করা হয়। দেশের বেনামাজি, মুশরিক, বিদ'আহতী, দুর্নীতিবাজ, সম্রাসী, ইত্যাকার যাবতীয় অপরাধে জড়িত ব্যক্তিগণ এ দুয়ায় শরীক হওয়াকে যাবতীয় অন্যায়ের মোচনকারী মনে করেন। এজন্য সর্বস্তরের লোক ঐ দু'আয় শরীক হওয়ার জন্য ভিড় জমায়। সেদিন উপস্থিতি সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, ৩০ লক্ষের উপর। ভিড়ের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ সহ সারা রাজধানীতে একটা অচালবস্তুর সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগের স্বীকার হতে হয় অসংখ্য বানু আদমকে (মু'জামূল বিদ'য়াহ, পৃষ্ঠা- ২৫)*।

জনাব মু'মিনুল হক ভাই ও প্রকৌঃ আজিজুল ইসলাম ভাই এই দলটির স্বরূপ উন্মোচনকারী একটি ইংরেজী ভাষায় লিখিত কিতাবের বাংলায় অনুবাদ করে সত্যিকার অর্থে যারা দীনদার তাদের জন্য একটি জ্ঞান ভান্ডারের দিশা দিয়েছেন। এবং যাদের ব্রেনে এখনো এ দলের তালা লাগেনি, তারা এদল থেকে সরে আসার সুযোগ পাবেন। জনৈক লেখক দেওবন্দ ও তাবলীগ জামায়াতের ইসলামকে কুর'আন-সুন্নাহ্ বহির্ভূত ভিন্ন ইসলাম বলে অভিহিত করেছেন। দেখুন ডঃ আবু উসামাহ্ সাইয়্যিদ তালেবুর রহমান প্রণীত উর্দু ভাষায় “তাবলীগ জামাআহ্ কা ইসলাম ওয়র্ দেওবান্দিয়াহ্” ও আরবী ভাষায় “আদদেওবান্দিয়াহ্”, ইত্যাদি। আল্লাহ্ কিতাবখানা কবুল করুন ও ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণের ব্যাপক উপকার সাধন করুন। আমীন।

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম।

কাজী বাড়ী, উত্তর খান, ঢাকা। মোবাঃ ০১৮১৭১২৯৮০৭, ০১৯১৪০০৪৮৪৭।

“অগ্রকথন”

বস্তুত, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আমরা তাঁর গুণ-গান করি, এবং তাঁর করুণা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের মন্দকর্ম ও এর প্রতিফল থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ্‌ যাকে পরিচালিত (হিদায়াহ্‌) করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না; এবং আল্লাহ্‌ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে কেউ সুপথ (হিদায়াহ্‌) দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই সকল প্রার্থনার অধিকারী, তাঁর কোন অংশীদার নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নাবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। রাসূল (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবা (রাঃ) দের প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।

তাবলীগ জাম'য়াত একটি সুপরিচিত গোত্র, যারা পূর্ব-নির্ধারিত কিছু পাঠ্যসূচী নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য মাস্‌জিদ হতে মাস্‌জিদান্তরে ভ্রমণ করেন। তাদের কার্যক্রম মূলতঃ নিয়মিত ফাজায়েল-ই-আ'মাল বা তাবলীগী নিসাব পঠন, এবং এই কাজে অন্যদেরকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের ভিতরই সীমাবদ্ধ। তাঁরা সাধারণতঃ নির্বানবাট, অবিতর্কিত ও নির্বিরোধ বিষয় বা ক্রিয়াকর্মাদির উপর নিজেদের নিবিষ্ট রাখেন। তাঁরা দাবী করেন যে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, শুধু বিভিন্ন আ'মালের সাওয়াব বা ফাযীলাত বর্ণনা করে মানুষকে ধর্ম পালনে উৎসাহিত করা।

কোন সম্প্রদায়, গোত্র, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শের প্রতি তাঁদের কোন প্রীতি, সম্বন্ধ বা সহমর্মিতা নেই বলে দাবী করলেও বাস্তবে তাঁরা দেওবন্দি সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। দেওবন্দি হচ্ছে সূফীবাদ (আধ্যাত্মবাদ) এর একটি উপদল বা ফির্কা, যাদের উৎপত্তি ভারত উপমহাদেশে। দেওবন্দিগণ সূফীবাদের অনেক কঠোর নিয়ম নীতির ধারক-বাহক, যা তাবলীগ জামায়াতের বিভিন্ন রীতি-নীতি, পদ্ধতি ও দাওয়াহ্‌তে প্রতিফলিত হয়।

তাবলীগ জাম'য়াত ছয়টি মূল উসূল বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি দাওয়াহ্‌র একটি, এবং তা দিয়ে বেড়ানোয় তাঁরা প্রচুর গুরুত্ব দেন। এই দাওয়াতী দলগুলোর নেতৃত্ব দেন একজন আমীর বা দলনেতা, যিনি তাঁর সাথীদের বিভিন্ন বিষয়ে বয়ানও শিক্ষা দেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই আমীরগণ দ্বীন বা শিক্ষায় অজ্ঞ, স্বল্প বা অর্ধশিক্ষিত। ফলশ্রুতিতে, কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ উদ্ধৃতকরণে ও পালনে সযত্ন সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন না। প্রায়শঃই দেখা যায়, তাঁদের প্রবীনদের কোন কথা, অভিজ্ঞতা বা কাহিনীর উপর ভিত্তি করে দাওয়াত দিতে। তাবলীগ জামা'য়াতের

অবোধ আমীর ও সাথীদের দলীল বিহীন কর্মকাণ্ড অনেক ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও ধারণা জন্ম দেয়ার একটি বড় কারণ ।

যাহোক, আমাদের বিষয়ের বিশ্লেষণের ভিত্তি হবে তাঁদের লিখিত গ্রন্থ ও লিখন কর্ম; যাতে দেওবন্দিগণ ও তাবলীগ জামা'য়াতীগণ আত্মজিজ্ঞাসিত হতে বাধ্য হন ।

সাধারণ পাঠকদের জন্য দেওবন্দিগণের বেশীর ভাগ উদ্ধৃতি বা বিষয়বস্তু ফাজায়েল-ই-আ'মাল বা এ ধরনের পুস্তকে বিধৃত । এই উদ্ধৃতি বা বিষয়বস্তুগুলো নির্দেশ করে, কিভাবে তাবলীগ জামা'য়াত সুফীবাদ এবং বে-শরা ধারণাকে আ'মাল বা আত্মানুবর্তিতার লেবাসে সমাজে বিস্তৃতি ঘটাবে ।

'ফাজায়েল-ই-আ'মাল' হচ্ছে শুধুমাত্র একটি কিতাব যা তাবলীগ জামা'য়াতের সমস্ত তা'লিমী আসরে নিরন্তর অব্যর্থভাবে পঠিত বা চর্চিত হয় । কখনও কুর'আনের কোন আয়াতের অর্থ বা তাফসীর অথবা কোন সহীহ হাদীস গ্রন্থ থেকে কিছু শোনানো হয় না । এমন কি রিয়াদুস-সালেহীন, যা এ জামা'য়াতের আরবগোষ্ঠি চর্চা করে, কিন্তু, অনারবরা এর ধারে কাছেও নেই ।

আমর ইবনে কায়েস আস-সাকোনী বলেন, 'আমি একটি দলভুক্ত হয়ে বাবার সঙ্গে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে গেলাম । আমি শুনেছি একজন মানুষ (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর) জনগণের কাছে বয়ান করে বলছেন, 'শেষ সময়ের কিছু লক্ষণ হচ্ছে, যখন মন্দে'রা নিয়ন্ত্রণ করবে, আর ধর্মভীরুরা নিয়ন্ত্রিত হবে; যখন নেক আ'মাল ও বিশ্বস্ততা নির্বাসিত হয়ে কর্মহীন বচন প্রতিস্থাপিত হবে; এবং জনগণের কাছে 'আল-মাস্নাহ' পঠিত হবে, যা শুনে কেউ খন্ডন বা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে না' । তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন, 'আল- মাস্নাহ' কি? 'তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাব ছাড়া যা কিছু লিখা হয়' ।'

দাবী করা হয় যে, এই বইয়ের সোজা-সাপ্টা আবেদনের কারণে আম জনতার আ'মাল সংশোধনের জন্য এটা সব চাইতে উপযুক্ত । তদুপরি, করণ বাস্তবতা হচ্ছে, যারা আজীবন এই জামা'য়াতের পিছনে ব্যয় করেন, তারা গ্রন্থাকার মাওলানা যাকারিয়াহ কান্কাহুলভীর সুফীবাদী ধারণার কিঞ্চিৎই অনুধাবন করতে পারেন ।

এই সংকলনের বিশ্লেষণ গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করছে যে, তাবলীগ জামা'য়াতীগণের ভ্রান্তি-বিলাস শুধু ছোটখাট, যেমন ৩ দিন, ৭ দিন, ৪০ দিন বা খুরোজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আক্বীদাহ ও ইত্তিবা {রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহর অনুসরণ} তেও । বিশ্লেষণের ক্রমগতিতে দেখা যাবে যে, দেওবন্দিগণের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনায় অনেক স্ববিরোধিতা আছে, যা বাত্বিল পন্থীদেরই পরিচায়ক ।

১। আল-হাকিম ।

কুর'আনে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, “তারা কেন কুর'আনের প্রতি গভীর মনঃসংযোগ করে না? যদি এ (কুর'আন) আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে অবশ্যই অনেক মতানৈক্য দেখতে পেতো।”^২

এই মতানৈক্য কখনোই কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ যথাযথ অনুসরণের পরিণাম নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদের জন্য পরিষ্কার নিদর্শন (সুন্নাহ্‌) রেখে গেলাম; এর রজনীও দিবালোকের মতই শুভ্র; একমাত্র হতভাগা (বিধ্বস্ত) ও সুগভীর বিভ্রান্তিতে পতিত ছাড়া কেউই এ থেকে বিচ্যুত হয় না। অতএব, আমার সুন্নাহ্‌ ও সঠিক পথের প্রতিনিধিদের সুন্নাহ্‌ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধেকো।’^৩ তাই, এই আশায় আমাদের এই প্রয়াস যে, এটি খোলা মনের পাঠক, তথা প্রকৃত ইসলামপ্রেমী ও জ্ঞানপিপাসুদের কাছে আলোচিত বিষয়ের ব্যাখ্যা তুলে ধরে ইসলামের বিশাল দিগন্তের কিয়দাংশ যথাসম্ভব সহীহ্‌ ভাবে উন্মোচিত করবে।

২। সূরাহ্‌ আন-নিসা (৪ঃ৮২)।

৩। মুসুনাদ-ই-ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (৪/১২৬), ইবনু মাজাহ্‌ (৪৩), আল-হাকিম (১/৯৬), আল-বাইহাকী (৫১)।

অবতরণিকা

সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ সুগভীর প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত আল্লাহ্ জাতিকে এক সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে এই ধরায় পাঠিয়েছেন। তা হচ্ছে, শুধুমাত্র তাঁরই নিরোক্ত বন্দনা বা ইবাদাহ্, যা তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। আল্লাহ্ পাক বলেন, “আমি জ্বীন ও মানবকুল সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমারই ইবাদাহ্‌র জন্য।”^৪

আল্লাহ্‌র অশেষ করুণা যে, তিনি মানব জাতিকে বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছেন। কিন্তু, সর্বজ্ঞ করুণাময় আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা’য়ালা ভালো মন্দ বুঝার জন্য শুধু আমাদের মেধা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁর বিধি-নিষেধ সম্বলিত সহীফাহ্ ও আসমানী কিতাবও নাবী-রাসুল গণের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রেরণের মাধ্যমে দুনিয়ায় নাবী-রাসুল পাঠানোর পরম্পরার পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যিনি (সাঃ) তাঁর (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভ ও দোষখের আগুন থেকে বাঁচার জন্য যা করা প্রয়োজন, তার সব কিছু আমাদের জানিয়েছেন। কুর’আনে আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা’য়ালা রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে বলেন, “তোমাদের নিকট আগমন করেছেন তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসুল, যার কাছে তোমাদের অনিষ্টকর বিষয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হয়; যিনি তোমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, মু’মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহপ্রবণ ও দয়াপরবশ।”^৫ নবুয়্যাতের অংশ হিসেবে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) তাঁর উম্মাহ্‌র কাছে ক্রেশকর শেষ বিচার দিন সম্পর্কে অবহিত করেছেন। নিরন্তর বাধা-বিপত্তি (ওয়াস্‌ওয়াসা) কে অতিক্রম করে ঈমান আক্কাঁদাহ্‌কে সুদৃঢ় রাখতে হলে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেনঃ

১। শিরক (আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করা)ঃ

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ‘পূর্বাঙ্কে আমি প্রেরিত হয়েছি, যাতে আল্লাহ্ একক ও শরীকবিহীন ভাবে উপাসিত হন; এবং আমার সংস্থান বা বন্দোবস্ত হলো, আমার বর্শার আড়ালে, এবং ধিক্কার ও লা’নাত তাদের প্রতি, যারা আমার অনুগত না হয়ে অন্যের অনুকরণ করে, তারা তাদের অধিভুক্ত।’^{৬, ৬ক}

৪। সূরাহ্ আয-যারিয়াহ্ (৫১ঃ৫৬)।

৫। সূরাহ্ আত্-তাওবা (৯ঃ১২৮)।

৬। মুসুনাদ-ই-ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, হাদীস নং-৫১১৪।

৬ক। অনুবাদকের সংযোজন (শিরুক প্রসঙ্গে)ঃ সহীহ্, বুখারীর ১ম খণ্ড, ৩২ নং হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) কবীনা করেন, সূরাহ্ আন’আম এর ৮২ নং আয়াত-‘হারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি’ নাখিল হলে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবীগণ বললেন, ‘আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করেনি?’ তখন, আল্লাহ্ তা’য়ালা সূরা লুক্‌মান-এর ১৩ নং আয়াত নাখিল করেন, ‘নিচয়ই, শিরুক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অন্যায় (যুলুম)’। সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে তাঁর ঘোষণা, ‘নিচয়ই, আল্লাহ-তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করলে, তাকে ক্ষমা করবেন না; কিন্তু, এর চেয়ে ছোট পাপ, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী হির করে,

২। আব্দুল্লাহর ধীন সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল-আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, ‘আব্দুল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইল্ম (জ্ঞান) উঠিয়ে নেন না, কিন্তু, ধীনের আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার ভয় করি। যখন, কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে, না জানলেও ফাতওয়া প্রদান করবে। ফলে, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।’^৯ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন যে, শয়তানের ওয়াসুওয়াসার যথাযথ বর্ম হচ্ছে, প্রকৃত ধীনি ইল্ম। তাই, তিনি (সাঃ) বলেন, ‘জ্ঞানান্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।’^{১০} তিনি (সাঃ) তাঁর সাহাবাদের এই কথা বলে অনুপ্রাণিত করতেন যে, ‘যে জ্ঞানের পথ মাড়ায়, আব্দুল্লাহ তাঁর পথ, জান্নাতের একটি পথে দাখিল করেন এবং— সত্যই জ্ঞানী (আলিম) রাই নাবীদের উত্তরসূরী, যারা দীনার বা দিরহামের তোয়াক্কা করে না। জ্ঞান (ইল্ম) ই হচ্ছে, তাদের উত্তরাধিকার; সূতরাং, যে এটি অর্জন করে, সেই মহাভাগ্যবান।’

৩। বিদ’আহু (ঈমান-আক্বীদাহু ও ইবাদাহু)ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে নাবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘আমার পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক নাবী (আঃ) দেবই উম্মাহর মধ্য থেকে হাওয়ারীগণ এবং এমন সবাই সঙ্গী-সাথীও হয়েছেন, যারা সে নাবী (আঃ) এর সুন্নাহ গ্রহণ এবং ধারণ করেছেন, তাঁর আদেশ ও নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। পরে উম্মাহর উত্তরাধিকারী হয়েছে এমন সব লোক, যারা বলতো এমন সব কথা, যা তারা করতো না; এবং করতো এমন সব কাজ, যা করতো তাদেরকে আদৌ আদেশ করা হয়নি।’^{১১}

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ধীনে নতুন কিছু প্রচলন (বিদ’আহু) এর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একদা যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখনই তাঁর চক্ষু লাল এবং কণ্ঠস্বর চড়া ছিল; অর্থাৎ,

(৬ক চলমান) সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে।’^{১২} মুসনাদ-ই-আহমাদে আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আব্দুল্লাহ পাক বলেন— হে আমার বান্দা! তুমি যদি সারা পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আস, আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো এই শর্তে যে, তুমি আমার সাথে অংশী স্থাপন করনি। আব্দুল্লাহ সুবহানাহ ওয়াতাতা’য়ালা তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীর পাপ মার্জনা করেন না। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আব্দুল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে শিরক করেছে, তার জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। এ পাপ ছাড়া হোট পাপ যত বেশীই হোক না কেন, তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন।

৭। সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০০।

৮। বাইহাক্বী (ভ’ আবুল ঈমান)।

৯। আবু দাউদ (ইং অনুঃ), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৩৪, হাদীস নং-৩৬৩৪। ইবনু মাজাহ (ইং অনুঃ), পৃষ্ঠা-১২৬, হাদীস নং-২২৩। মুসনাদ-ই-আহমাদ; শাইখ আলবানী কর্তৃক সহীহ বলে স্বীকৃত (সহীহ সুনান-ই-আবু দাউদ, হাদীস নং-৩০৯৬)।

১০। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪, হাদীস নং-৮১।

তিনি রাগান্বিত ছিলেন। তিনি (সাঃ) বলতে লাগলেন, ‘বাস্তবিক, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথনির্দেশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর লেয়া জীবন বিধান। পক্ষান্তরে, নিকৃষ্টতম জিনিষ হচ্ছে, নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ, আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত মতাদর্শই সুস্পষ্ট গোমরাহী।’^{১১} ইবনু উমার বলেন, ‘প্রতিটি নবোদ্ভাবনই গোমরাহী, যদিও জনগণ তা ভালো বিবেচনা করে।’^{১২}

৪। অনৈক্য এবং বিভিন্ন ফিরকায় বিভাজন :

নাবী কারীম (সাঃ) বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে শয়তান খোঁকা দেয়, যাতে আরব উপদ্বীপে যারা প্রার্থনা করে, তারা যেন তারই উপাসনা করে; ফলশ্রুতিতে, সে (শয়তান) তাঁদের মাঝে শত্রুতার উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াস চালায়।’^{১৩} আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘বস্তুতঃ আহলে কিতাবরা তোমাদের পূর্বে ৭২ দলে বিভক্ত ছিল, আর এই উম্মাহ, বিভক্ত হবে ৭৩ ফিরকায়। ৭২ দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল যাবে জান্নাতে।’ আর এক বর্ণনায় আছে, ‘সব দল দোজখে যাবে, একটি ছাড়া,’ জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘সেটি কোন দল?’ তিনি (সাঃ) বললেন, ‘আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি, তার উপর যে দল থাকবে।’^{১৪}

৫। কুফরী (অবিশ্বাসী) অনুকরণ :

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ‘তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করবে (হবহ), তাঁরা যদি (গুঁইসাপ সদৃশ প্রাণীর) গর্তে ঢুকে, তোমরাও তেমনি ঢুকবে।’ আমরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! এরা কি ইহুদী ও নাসারারা?’ তিনি (সাঃ) বললেন, ‘তবে আর কারা?’^{১৫}

নাবী (সাঃ) তাঁর উম্মাহকে সব বিষয়ে কুফর করা থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন; তা সে ধর্মীয় বিশ্বাস (আক্বীদাহ), আনুষ্ঠানিকতা, বান্দেগী বা দৈনন্দিন নৈতিক আচরণ, যাই হোক না কেন। তিনি (সাঃ) বলেন, ‘যে ই লোকদের (কাফিরদের) সাদৃশ্য আচরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।’^{১৬} কুফর থেকে একান্ত ভিন্নভাবে আচরণ করার এটা নাবী (সাঃ) এর দ্বরীকা। ইহুদীরা ঋতুকালীন সময়ে মহিলাদের সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকতো। নাবী (সাঃ) বলেন, ‘সহবাস

১১। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১০, হাদীস নং -১৮৮৫। আরেকটি সহীহ বর্ণনায় আরেকটু বর্ধিত করা হয়েছে যে, ‘এবং গোমরাহদের স্থান জাহান্নামে’-শাইখ আলবানীর সহীহ নাসাই (হাদীস নং ১৪৮৭)।

১২। আল-ইবানাহ-ইবনে বত্বতা কর্তৃক সংগৃহীত উসুল আদ-দিয়ানাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১২ হাদীস নং-২ ও আল-লালিকাই/আস্-সুন্নাহ (২/৩৬/১)।

১৩। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৪৭১, হাদীস নং-৬৭৫২।

১৪। তিরমিযী (৫/৬২), আল-হাকিম (১/২৮), তাখরীজুল ইহুয়া (৩/১৯৯)-য় আল-হাকিম-আল ইরাকী এক সহীহা (২০৪)য় আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

১৫। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

১৬। মুস্নাদ-ই-আহমাদ (২য় খণ্ড, হাদীস নং-৫০), আলবানী কর্তৃক সহীহ আলজামী আস্-সাগীর এ বর্ণিত।

ছাড়া সবকিছুই কর (জীর্ণের সঙ্গে)।' একথা শুনে ইহুদীরা বলে, 'এই লোক [নাবী (সাঃ)] আমরা যা করি, তার কোন কিছুই বিরোধিতা করা ছাড়া বাদ দিতে চায় না।'১৭

ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উত্বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আয়িশাহ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নাবী (সাঃ) এর শেষ নিঃশ্বাসের সময় তিনি তাঁর একটি চাদরে নিজ মুখমণ্ডল ঢাকতে লাগলেন। শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলে মুখ হতে চাদর সরিয়ে নিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, 'ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নাবীদের ক্বাবরকে মাস্জিদে পরিণত করেছে।' (এ বলে) তারা যে (বিদ'আহ ও কুফরী) কার্যকলাপ করতো, তা থেকে তিনি সতর্ক করেছিলেন।'১৮ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নাবী (সাঃ) মৃত্যুশয্যাতে তাঁর উম্মাহকে কুফরীর গোমরাহী থেকে বিরত থাকতে সাংঘাতিকভাবে হুঁশিয়ার করেছেন।

৬। ঘীনে বাড়াবাড়িঃ

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে যেখানে ছাড়ি, তোমরা আমাকে সেখানে ছাড়বে। কারণ, তোমাদের পূর্বের জনগণ নাবীদের প্রতি অহেতুক প্রশ্ন এবং মতভেদের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, আমি যদি কিছু নিষেধ করি, তা'হলে, তোমরা তা করা থেকে বিরত থেকে এবং তোমাদের কিছু করতে বললে, তা তোমরা সাধ্যমত করার চেষ্টা করো।'১৯ তিনি (সাঃ) আরো বলেন, 'তোমরা নিজেদের জীবনের উপর কঠোরতা করো না, তা'হলে, আল্লাহও তোমাদের প্রতি তদ্রূপ করবেন। কিছু জাতি নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছিল, আল্লাহও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করেছিলেন। তাদের উত্তরসূরীদেরকে মঠ ও আশ্রমে দেখা যায়। তখন, তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, "সন্ন্যাসবাদ! এতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রবর্তন করেছিল, আমরা তাদেরকে এ বিধান দিইনি।"২০,২১

৭। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উপর মিথ্যা আরোপঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল

১৭। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫, হাদীস নং-৫৯২।

১৮। সহীহ বুখারী (১ম খণ্ড, তাওহীদ প্রকাশনী, হাদীস নং- ৪৩৫-৪৩৬), সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৯, হাদীস নং-১০৮২), আবু দাউদ (ইং অনুঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯১৭, হাদীস নং-৩২২৯), নাসাঈ (১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১১৫), আদ-দারেমী (১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩২৬), বায়হাকী (৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৮০) ও মুসনাদ-ই-আহমাদ (১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২১৮)।

১৯। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯০, হাদীস নং-৩৯৯), সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫৬, হাদীস নং ৫৮১৮), সুনান-ই-ইবনু মাজাহ (ইং অনুঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১, হাদীস নং-২)

২০। সুরাহ আল-হাদীদ (৫৭ঃ২৭)।

২১। সুনান-ই-আবু দাউদ (ইং অনুঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬৬, হাদীস নং- ৪৮৮৬), শাইখ ইবনু তাইমিয়াহ (রাঃ) এটাকে হাসান বলেছেন, এর শাহেদ আরো হাদীস রয়েছে, {ইকতিদাহ আস-সিরাতুল মুত্তাকিম (ইং অনুঃ পৃষ্ঠা-২৬৪)}।

(সাঃ) বলেন, ‘জেনে শুনে যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার ছান দোষখাগ্রিতে করে নেয়।’^{২২}

একমাত্র সমাধান

এ সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে উত্তরণে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে কঠোর ভাবে আল্লাহর কুর’আন ও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, “তিনি (আল্লাহ) এমন যে, নিজ রাসুল (সাঃ)কে হিদায়াহু (কুর’আন) এবং সত্য-ধর্ম সহ প্রেরণ করেছেন, যেন এটিকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দিতে পারেন...।”^{২৩} আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর কাছে যে ধীন প্রেরণ করা হয়েছে, তা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্বৈব পরিপূর্ণতা ও সমন্বয়সিদ্ধতায় ভরপুর; এতে সংযোজন বা বিয়োজনের ন্যূনতম সুযোগও নেই। হিদায়াহু, প্রকৃত অর্থে, কোন রূপ ব্যত্যয় বা গৃঢ়ার্থ (অতিপ্রাকৃত) মূলক ধারণাকে বাতিল করে দেয়। তেমনি, সত্য-ধর্মের দর্শন, আল্লাহ কর্তৃক বাতিল ভ্রান্ত ধর্মের ধারণাকে রদ করে দেয়। সেজন্য আল্লাহ বলেন, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে সর্বৈবভাবে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার এই অবদান (নিয়ামত) এর পরিপূর্ণতা দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধীনরূপে পছন্দ (মনোনীত) করলাম।”^{২৪}

যারা মনে করেন, কুর’আন এবং সুন্নাহ সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে, আরো যারা, তাদের গুরুজন বা সম্ভদের কৃত কল্পকথা বা আজগুবী কাহিনী সংরক্ষণ এবং লালন করেন; পক্ষান্তরে তারা সহীহ হাদীস চর্চা ও সে অনুযায়ী জীবন গড়া থেকে বিরত থাকেন এবং অন্যকেও বিরত রাখতে সচেষ্ট হন; আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে প্রকৃত পথের দিশা, তথা হিদায়াহু নসীব করেন!। আমীন!

কুর’আনে আল্লাহ তাবারক ওয়া তা’য়ালা বলেন, “নিশ্চয়ই, আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে একজনকে রাসুল করে পাঠিয়ে, যে তাদের কাছে তাঁর নিদর্শনাবলী পড়ে শুনায় ও তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে (গ্রন্থ থেকে) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়; কারণ, নিশ্চয়ই, তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।”^{২৫}

শুধুমাত্র কুর’আন এবং সুন্নাহই আমাদেরকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে সরল পথে পরিচালিত করে আমাদের আখেরী গন্তব্য (জান্নাত) এ পৌঁছে দেবে ইনশা’আল্লাহ। কুর’আন ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহয় যে সত্যাদর্শ ও দিক-

২২। সুনান-ই-ইবনু মাজাহ (ইং অনুঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭, হাদীস নং-১২), শাইখ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন।

২৩। সূরাহ আত্-তাওবা (৯৯৩৩)।

২৪। সূরাহ আল-মায়িদাহ (৫৫৩)।

২৫। সূরাহ আল-ইমরান (৩ঃ ১৬৪)।

নির্দেশনা রয়েছে, সে অনুযায়ী জীবন গড়া এবং পরিচালনা করাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তথা - তাঁর ইবাদাহ্। এভাবেই আমরা ইসলামকে আমাদের সামগ্রিক জীবনে প্রতিফলিত বা বাস্তবায়িত করতে পারি; যেভাবে তা চর্চিত ও লালিত হয়েছিল রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবী (রাঃ) দের জীবনে। ইবনু আউনের উক্তির মাধ্যমে উপসংহারের প্রয়াস পাচ্ছি। তিনি বলেন, 'তিনটি বিষয় আমি আমার জন্য এবং আমার ভাইদের জন্য ভালোবাসি (ইসলামের মধ্যে)'^{২৬}...

১. সুন্নাহ্, যা তারা শিখবে এবং শিখাবে,
২. কুর'আন,-তারা বুঝবে এবং অপরকে বুঝাবে,
- ৩। উম্মাহ্ যখন ভালো আ'মল করতে শুরু করবে, তখন তাদের ছেড়ে যাওয়া।'

সুতরাং, আসুন সুন্নাহকে জীবনে যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি, যার জন্য আমরা নিজেদের কাছে, তথা-স্রষ্টার কাছে অকাট্য এবং পরিপূর্ণভাবে দায়াবদ্ধ।

২৬। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ ৯ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৮২)।

প্রথম অধ্যায়

সার-সংক্ষেপ ও পটভূমি

সুফিবাদ অধুনা :

সুফিবাদ ও তাসাউফ অনেক ভাগে বা ফিরকায় বিভক্ত, যাকে বলা হয় ‘তুরিকাহ’^{২৭}। প্রধান চার তুরিকাহ হচ্ছে- চিশ্‌তিয়াহ, হ্বাদরিয়াহ, নাক্‌শবান্দিয়াহ ও সোহরাওয়ার্দিয়াহ। ভারতে দেওবন্দি ও বেয়েল্‌তীগণ এই সুফিবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা এই চার তুরিকাহরই অনুসারী। সপ্তদশ শতাব্দি পর্যন্ত ভারতে হানাফী আলিমদের মধ্যে সুফিবাদের কোন সুস্পষ্ট ভাব পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু, পারস্পরিক মতানৈক্য পরবর্তীতে তাদের মাঝে ফাটল ধরায়; ফলশ্রুতিতে, তারা দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়; যা পরিশেষে, ‘দেওবন্দি’ ও ‘বেয়েল্‌তী’ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই দুই শিবিরে যখন বৈরিতা ও তিক্ত মতানৈক্য চরমরূপে পরিগ্রহ করে, তখন বেয়েল্‌তীগণ অতিরঞ্জিতভাবে দেওবন্দিগণকে ‘কাফির’ আখ্যা দেয়। উভয় দলই হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করেন। আসলে, তাঁরা হানাফী ফিক্‌হ অনুসরণ করেন; তাঁরা সত্যিকার অর্থে, ইমাম আযম আবু হানিফার দর্শন ও আক্বীদাহর প্রকৃত অনুসারী নয়।

এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু, তাবলীগ জামা’য়াত ও দেওবন্দিগণের চিন্তা-চেতনা ও কর্মপদ্ধতির উপর আলোকপাত করা; তাই, আমরা সুফিবাদের ঐ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা সীমিত রাখব, যেগুলো দেওবন্দিগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত; এবং সুফিবাদকে তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করব।

বেয়েল্‌তীগণঃ

বেয়েল্‌তীগণের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম ছিলেন আহমাদ রাজা খান, যিনি ছিলেন একজন চরমপন্থী সুফী, যার পরিচিতি ছিল- কারও বিরুদ্ধে ‘কুফরী’র অপবাদ দেয়া বা তাক্‌ফীর করা; এবং তিনি প্রচণ্ড খারেজী ভাবাপন্ন ছিলেন। আব্বায়া ইহুসান ইলাহী জহির (রঃ) বেয়েল্‌তীগণের উপর বিস্তারিত একটি বই লিখেছেন, যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন :

২৭। তুরীকাহ ও শরীয়াহ : সুফীবাদ অনুযায়ী ‘তুরীকাহ’ হচ্ছে এমন এক পথ- যে পথ দ্বারা একজন আব্বাহর কাছে পৌছায়; শরীয়াহ একটি পথ-যার দ্বারা জান্নাতে পৌছা যায়। তুরীকাহকে মনে করা হয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আর শরীয়াহ হচ্ছে সাধারণ। তুরীকাহর ভিত্তি হচ্ছে বিশেষ নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও ক্রিয়া-কর্মাদি। (A Dictionary of the Technical Terms used in the Science of Musalmans: by Moulvi Muhammad Alea Ibn Alea Al-Thanvi, p-919).

- বেরেল্‌জী ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠার উপর 'শিয়া'বাদ' এর প্রভাব ।
- প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত অনায়াসে কুফরীর অপবাদ দেয়া ।
- ধর্মের লেবাসে কুসংস্কার, অযৌক্তিক তর্ক, ভিত্তিহীন গল্প ও কল্প-কথার প্রচলন ।
- নিজেদের ধ্যান-ধারণার সমর্থনে কুর'আন ও সুন্নাহর বিকৃতি (তাহুরীফ) ও অপব্যাখ্যা করা ।

যদি কেউ আরো বিশদ জানতে চান, তা'হলে, "Barelawis History and Belief"
^{২৮} (উক্ত লেখকের) বইটি মেহেরবানী করে পড়ুন ।

দেওবন্দিগণ ও তাবলীগ জামা'য়াতঃ

দেওবন্দি চিন্তা-চেতনা (School of Thought) র উন্মেষ ঘটে বেরেল্‌জীগণের সঙ্গে বিরোধ এবং মতপার্থক্যের কারণে । পরবর্তীতে ১৮৬৮ খ্রীঃ মাওলানা ক্বাসিম নানোতভী কর্তৃক "দারুল উলুম দেওবন্দ" প্রতিষ্ঠিত হয় । 'দেওবন্দি' বলতে তাঁদেরকে বুঝায়, যারা দেওবন্দি ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের সঙ্গে একাত্ম ও একাট্টা । দেওবন্দি বৃজুর্গদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস হচ্ছেন এমন একজন, যিনি এই তাবলীগী জামা'য়াতের প্রবর্তক । বিখ্যাত দেওবন্দি বৃজুর্গ, মাওলানা আশরাফ আলী খানভী দ্বারা মাওলানা ইলিয়াস অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ছিলেন । তিনি বলতেন, "হযরত মাওঃ আশরাফ আলী খানভী দ্বীনের প্রভূত খেদমত করেছেন । আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, দ্বীনের শিক্ষা হবে তাঁর এবং দাওয়াহুর প্রায়োগিক প্রক্রিয়া হবে আমার, যাতে করে, এভাবে তাঁর শিক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে ।"^{২৯} তাবলীগ জামা'য়াতীগণ দেওবন্দিগণের একই চিন্তা-চেতনার লালনকারী এবং তাঁদেরকে দেওবন্দিগণের দাওয়াহু শাখা বলা যেতে পারে । যেখানে বিরোধী বেরেল্‌জীগণ কর্তৃক দেওবন্দিগণ একেবারে নিরস্তর ধরাশায়ীভাবে কোন্ঠাসা, সেখানে সুকৌশলে সমস্ত বিতর্ক এড়িয়ে আসল উদ্দেশ্য(সুফীবাদ)কে ঢেকে দেওবন্দিগণ তাঁদের ধ্যান-ধারণার বিস্তার ঘটানো তাবলীগ জামা'য়াতের কল্যাণে ('হুদাবরণে') ।

দেওবন্দি ও তাবলীগ জামা'য়াতীগণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

১। মাওঃ ক্বাসিম নানোতভী (মৃঃ ১৮৭৯ ঈঃ) : দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা

২৮। মুহাঃ ইকবাল কৈলানীর চমৎকার সংকলন "The Book of Unity or Oneness of Allah" সুনির্দিষ্টভাবে বেরেল্‌জীগণের কলুষিত চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরেছে ।

২৯। মালফুজাতে মাওঃ ইলিয়াস (মাওঃ ইলিয়াসের বাণী), পৃঃ ৫০, উপাখ্যান নং ৫৬ (মুহাম্মাদ মঞ্জুর নূমানী কর্তৃক সংগৃহীত) ।

১৮৬৮ সালে মাওলানা ক্বাসিম নানোতভী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়^{৩০}। তিনি জনাব ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন^{৩১} (মুরিদ হিসাবে)।

২। ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (মৃঃ ১৮৯৯ ঈঃ)ঃ দেওবন্দিগণের পরম শ্রদ্ধেয় পীর (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক)। তিনি হচ্ছেন মাওঃ আশরাফ আলী থানভী, মাওঃ ক্বাসিম নানোতভী ও মাওঃ রাশীদ আহমাদ গান্ধোহীর আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক।

৩। মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (মৃঃ ১৯৪৩ ঈঃ)ঃ তিনি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর কাছে বায়াত গ্রহণ করেন এবং 'বেহেশতী জেওর' ও 'তাফসীর বায়ানুল কুর'আন' এর মত প্রখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর অনেক গ্রন্থ তাঁর পীর সাহেব ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর নামে নামকরণকৃত বা উৎসর্গীকৃত। ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর মত আশরাফ আলী থানভীও 'ওয়াহদাতুল-ওজুদ' এর সমর্থক বা প্রবক্তা। আশরাফ আলী থানভীর শিক্ষা এবং লেখা জামা'য়াতের প্রবর্তক মাওঃ আক্তার ইলিয়াসকে দারুণ ভাবে প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত করে।

৪। রাশীদ আহমাদ গান্ধোহী (মৃঃ ১৯০৮ ঈঃ)ঃ আরো এক দেওবন্দি বৃজুর্গ, যিনি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর^{৩২} কাছে দীক্ষা, তথা- বায়াত নিয়েছিলেন। 'ইমদাদুস সুলুক' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের একটি।

৫। মাওঃ আক্তার ইলিয়াস, 'হযরতজী' নামে বেশ সুপরিচিত (মৃঃ ১৯৪৪ ঈঃ)ঃ তিনি তাবলীগ জামা'য়াতের প্রবর্তক ও প্রথম আমীর। তিনি খলিল আহমাদ শাহরানপুরীর উত্তরসূরী, যিনি রাশীদ আহমাদ গান্ধোহীর সুযোগ্য উত্তরসূরীদের একজন ছিলেন।^{৩৩} সুফী নিয়ম-নীতি ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তিনি তাবলীগ জামা'য়াতের প্রবর্তন করেন এবং এতে সুফী আচার-আচরণ; যেমন- মুরাকাবাহ (ধ্যান), চিল্লাহ (৩/৭/১০/৪০ দিনের বিচ্ছিন্ন জীবন) ও হাফ্জায়ে যিক্র (স্রষ্টার বিশেষ স্মরণ), ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটান নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হিসেবে পালনের জন্য।

৬। মাওঃ মুহাম্মাদ ইউসুফ (মৃঃ ১৯৬৫ ঈঃ)ঃ মাওঃ ইলিয়াসের উত্তরসূরী হচ্ছেন তাঁর পুত্র মাওঃ মুহাম্মাদ ইউসুফ, যিনি তাবলীগ জামা'য়াতের দ্বিতীয় আমীর হন। পরবর্তী আমীর হন ইনামুল হাসান। বর্তমানে কোন আমীর নেই; এর কার্যাবলী শুরাহ নামক পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত।

৭। মাওঃ যাকারিয়াহ : মাওঃ ইলিয়াসের কন্যার জামাতা^{৩৪} ও 'ফাজায়েলে আমাল' পুস্তকের প্রণেতা। তিনি সুফীবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত সুবিদিত এবং মাওঃ

৩০। মাশা ইখ-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ, পৃঃ ২)।

৩১। ইরশাদুল মূলক (ইং অনুঃ, পৃঃ ৩২)।

৩২। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৩২)।

৩৩। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১২)।

৩৪। মাশায়েখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৩০৭)।

খলিল আহমাদ শাহরানপুরী হতে চার তুরিকাহর উপরই খিলাফত প্রাপ্ত।^{৩৫}

৮। অন্যান্য প্রখ্যাত দেওবন্দি আলিমগণঃ তাঁরা হচ্ছেন, খলিল আহমাদ শাহরানপুরী, আশিক ইলাহী মারাতী, মাওঃ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি, মাওঃ সাব্বির আহমাদ উসমানী ও মাওঃ আব্দুর রহীম লাজপুরী।

তাবলীগ জামা'য়াতীগণের তা'লীমী উপকরণ

শুরুতে 'তাবলীগী নিসাব' পরবর্তীতে, 'ফাজায়েলে আ'মাল' এর আভিধানিক অর্থ- আ'মাল, তথা-ইবাদাহ্ -বান্দেগী বা কাজ-কর্মের পূণ্য বা সাওয়াব। মাওঃ যাকারিয়াহ্ কান্দাহুলভীর 'আপ বীতি' জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মাওঃ ইলিয়াসের নির্দেশক্রমে এক ক্রমিকগুচ্ছ পুস্তিকা রচনা করেন এতদুদ্দেশ্যে।

'ফাজায়েলে আ'মাল' নয়টি পুস্তিকা(Booklet)র সমাহার। যথা-হিকায়াত-ই-সাহাবাহ্, ফাজায়েলে যিকুর, ফাজায়েলে নামাজ, ফাজায়েলে তাবলীগ, ফাজায়েলে কুর'আন, ফাজায়েলে দুরুদ, ফাজায়েলে রামযান, ফাজায়েলে সাদাকাহ্ ও ফাজায়েলে হাজ্জ। এই পুস্তিকা-গুচ্ছ দু'টি খণ্ডে 'তাবলীগী নিসাব' নামে সংকলিত হয়। এগুলো তাবলীগ জামা'য়াতের অনুসারী বা দল (কাফেলা) এর জন্য মূল তা'লীমী নির্দেশিকা হিসেবে তৈরী হয়, যা পরবর্তীতে 'ফাজায়েলে আ'মাল' নামে নতুনভাবে নামাঙ্কিত হয়। মূলে উর্দুতে লিখা এই গ্রন্থটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু, আরবী ভাষায়^{৩৬} কখন ও হয়নি।

দেওবন্দিগণ সুফীবাদের অনুসারী

দেওবন্দি ভাবধারার প্রধান আলিম ও 'ফাজায়েলে আ'মাল'এর প্রণেতা মাওলানা যাকারিয়াহ্ অভীক্ষা জ্ঞাপন ও গর্ব বোধ করেন এই বাস্তবতায় যে, তাঁদের পথ (মানহাজ) হচ্ছে সুফীদের পথ। মুফতী আব্দুর রহিম লাজপুরী তাঁর ফাতওয়া নামক বইয়ে ক্বারী মুহাঃ তাইয়্যিব {দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান (Rector)} কে উদ্ধৃত করেছেন যে, “দেওবন্দের আলিমগণ ধর্মীয়ভাবে মুসলমান; ফিরক্বা বা মত বিশ্বাস (Sect) এ 'আহলে সূন্নাহ ওয়াল জাময়াহ্'র অধিভূক্ত; মাযহাবে-হানাফী; আচরণে-সুফী; শিক্ষা-দিক্ষায়-মাতুরিদি ও সুলুক এ চিশ্তী^{৩৭}, তথা-সবকিছুতে সুফী

৩৫। মাশায়েখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫)।

৩৬। আরবী ভাষায় একটি ছোট পুস্তিকা (সহীফা) রয়েছে, যেখানে মূল উর্দু বই দুই খণ্ডে, প্রতি খণ্ডে ৪০০ পৃষ্ঠারও বেশী। আরবদের যারা তাবলীগ জামা'য়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাঁরা কখনই 'তাবলীগী নিসাব' চর্চা করেন না; বরং ইমাম নবভীর হাদীস সংকলন 'রিয়াদুস্ সালাহীন' দেখেন।

৩৭। একটি সুফি তুরীকাহ্।

আচরণ ও কার্যক্রম এর চর্চা; এবং নিস্বাতে তাঁরা দেওবন্দি^{৩০}।” মূলতঃ এবং প্রত্যয়গতভাবে (চিন্তা-চেতনায়) তাঁরা ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরী ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদির অনুসারী; অতঃপর গৌণভাবে ইমাম আবু হানিফার। তাঁরা চিশ্টিয়া, নাক্শবান্দিয়া, ক্বাদরিয়া বা সোহরাওয়ার্দি সূফি ত্বরীকায় দীক্ষিত^{৩১}।
 তাবলীগ জামা‘য়াতীগণের তা‘লীমের পূতঃপবিত্র গ্রন্থ ‘ফাজায়েল-ই-আ‘মাল’ এর প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়াহ মুফতী লাজপুরীর ফাতওয়া খণ্ড (ফাতওয়া-ই-রাহিমিয়াহ) এর উচ্ছসিতভাবে প্রশংসা করেছেন এবং তদসন্নিবিষ্ট মতামত ও বিষয়বস্তুকে অনুমোদন করেন^{৩২}।

সুফিবাদের সংজ্ঞা ও বাস্তবতা

দেওবন্দিগণ দাবী করেন যে, সুফিবাদ হচ্ছে তাজকিয়াতুন-নাফস (আত্ম বা চিন্তাশুদ্ধি) ও ইহুসান (সিমানের সর্বোচ্চ স্তর) এর অপর নাম। মাওঃ আশরাফ আলী থানভীর উত্তরসূরী মাওঃ মুহাঃ মাসীউল্লাহ খান বলেন, “এর (সুফিবাদের) কাজ হচ্ছে হীন পাশবিক কামনা-বাসনা থেকে চিন্তকে পরিশুদ্ধ করা; ভাষা (জিহ্বা)র দীনতা, ক্রোধ, ঈর্ষা, জাগতিক মোহ, খ্যাতির লিলা, কৃপণতা, লোভ, দম্ভ ও প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা^{৩৩}।” এই ভাবে তাঁরা দাবী করেন যে, সুফিবাদ শরীয়াহ (ইসলামী নিয়ম নীতি) এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়: বরং, প্রতিটি মুসলমানের সুফি হওয়া আবশ্যিক। সুফিবাদ ছাড়া একজন খাঁটি, তথা-পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলে পরিগণিত হতে পারেন না^{৩৪}। এটোও দাবী করা হয় যে, সুফি হচ্ছে সে, যে কঠোর ভাবে সুন্নাহ ও শরীয়াহর অনুসরণ-অনুকরণ করেন। কিন্তু, বাস্তবে, সুফিবাদ উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে অনেক ভিন্ন। রুগ্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বা আত্মার পরিচর্যা বা পরিশুদ্ধি ইসলামের একটি অংশ, যা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। মাওঃ মুহাঃ মাসীউল্লাহ খান আরো বলেন যে, “আত্মা বা নাফস এর পরিশুদ্ধি হচ্ছে, সুফিবাদে প্রবেশের প্রথম ধাপ এবং একে আল্লাহর কাছে পৌঁছার

৩৮। ফাতওয়া-ই-রাহিমিয়াহ (ইংরেজী অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯-১০)।

৩৯। ফাতওয়া-ই-রাহিমিয়াহ (ইং অনুঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

৪০। মাওঃ যাকারিয়াহ বলেন, “বিনম্র লেখক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ‘ফাতওয়া-ই-রাহিমিয়াহ’র (শাকল্যের) জন্য দোওয়া করেন, ‘আল্লাহ যেন সবাইকে এর থেকে বেশী বেশী উপকার লাভের তাওফীক দেন এবং আপনাকে (গ্রন্থে প্রণেতা), মুদ্রনকারী, প্রকাশক ও এর প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে সাদকাহ-ই-জারিয়াহর ফায়দা ও দু‘জাহানের সর্বোত্তম জাযাহ লাভের তাওফীক দেন।’ (ইসলামী বুক প্রিন্টার্স এর কেম্বেয়ারী, ১৯৯৭ খ্রীঃ প্রকাশিত ‘ফাতওয়া-ই-রাহিমিয়াহ’ ১ম খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

৪১। শরীয়াত ও ভাসাউফ- পৃঃ ১১ (ইং অনুঃ)।

৪২। শরীয়াত ও ভাসাউফ- পৃঃ ১১। {কেউবা আর একটু অগ্রগামী হয়ে বলেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ও সাহাবীগণ সুফি ছাড়া কিছু নন; বিশেষ করে বিদ্যানুরাগী সাহাবীগণের দল (আস্হাবুস সুফাাহ), যারা মাসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন।}

সোপান বা পরিভ্রমণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।^{৪৩} এই পরিভ্রমণের পরবর্তী ধাপকে আল্লাহুতে (আল্লাহর ভিতরে) পরিভ্রমণ বলা হয়। এবং এই পর্যায়ের উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক বিকাশে যাত (আল্লাহর অস্তিত্ব), সিফাত (আল্লাহর গুণাবলী), আফ'আল (আল্লাহর কর্মকাণ্ড), হাক্কায়িক এবং আল্লাহ ও তাঁর দাসদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়গুলো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান বা প্রকাশিত হয়^{৪৪}। এইভাবে, সূফির কাছে সবকিছুই প্রকাশিত, পরিষ্কার; কোন কিছুই অপ্রকাশিত বা গোপন নেই। সে এগুলো সুসম্পন্ন করে ইবাদাহ্ নির্দ্বারিত পদ্ধতিতে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ির মাধ্যমে, অথবা বিদ'আহ্ প্রচলন করে। এই হচ্ছে সূফিবাদের প্রকৃত চেহারা।

সূফিবাদ, অনৈসলামিক বিশ্বাসের ক্ষতে আক্রান্ত এক স্বয়ংক্রিয় ভাবধারা

সূফিবাদ শুধু চিন্তা-শুদ্ধির উপরই জোর দেয় না; উপরন্তু, এটা নিজেই একটা পরিপূর্ণ ভাবধারা, এবং এটা অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণায় নষ্টতাপ্রসূ। এর নানাবিধ দর্শন, যেমন—

- ১। 'ওয়াহদাতুল-ওজুদ' এর মতবাদ বা ধারণা- যা ইঙ্গিত করে যে, স্রষ্টা (আল্লাহ) এবং সৃষ্টি হচ্ছে এক, এবং বহির্জগত স্রষ্টার মূর্ত প্রতীক বা প্রকাশ।
- ২। এই ধারণা যে, নাবী (আঃ) গণ ও সূফি-সাধকগণ ইহজগতের ন্যায় স্বাভাবিক জীবিতাবস্থায় শায়িত আছেন। তাঁরা বহির্জগত সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন; তাঁরা জীবিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং (জীবিতদের) যারা তাঁদের ডাকে, তাদের সাহায্য করেন।
- ৩। বৃজুর্গদের রূহ বারুযাখ্ থেকে ফিরে আসে।
- ৪। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর মাত্রাতিরিক্ত স্তুতি বা প্রশংসা করা (যা প্রায় উপাসনার রূপ নেয়), অন্যদিকে দ্বীন বুঝার ব্যাপারে তাঁর শিক্ষা বা সুন্নাহ্কে অবজ্ঞা করা।
- ৫। পরিপূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে একজন সূফি-শাইখ্ এর আনুগত্য করা।
- ৬। অনুশোচিত হয়ে সাধু-সন্যাসীর জীবন যাপনকে আল্লাহর অধিকতর সন্নিহিতবর্তী হওয়ার উপায় মনে করা।
- ৭। কিছু মাজযুব, যারা সূফিবাদের অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছেন (তাঁরা মনে করে), তাঁরা সৃষ্টির সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন^{৪৫}, বলে মনে করা।

৪৩। শরীয়াত ও তাসাউফ-পৃঃ ১১২ (ইং অনুবাদ)।

৪৪। শরীয়াত ও তাসাউফ-পৃঃ ১১৩ (ইং অনুবাদ)।

৪৫। মাওঃ যাকারিয়াহ বলেন, “কিছু উলামার মতে, তিনি (শাইখ্ ইবনুল হামাম হানাফী) আশ্চর্যের একজন ((দেওবন্দি অনুবাদক বলেন, আম্মাল হচ্ছেন এক শ্রেণীর আউলিয়া যাদের পরিচিতি গুণ থাকে। তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা থাকে এবং তাঁরা দৈব ছকুমে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে নানা রকম কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকেন।) ‘ইখ্বামালুশ্ শিয়াম’ (ইং অনুঃ ৫৯))।

চরমপন্থী সূফিগণ আরও বিচ্যুত ভাবধারার; কিন্তু, আমরা এই গ্রন্থে আমাদের আলোচনা ঐ সমস্ত ভাবধারার মধ্যে সীমিত রাখব, যে গুলোর সঙ্গে দেওবন্দিগণ সম্পৃক্ত। এস, আর শারদা তাঁর গ্রন্থে বলেন, “তিমুর পরবর্তী সময়ে সূফি সাহিত্য কর্মে চিন্তা-চেতনার মর্মে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। এটা সর্বেশ্বরবাদী^{৪৬}। মধ্য ভারতে তিমুরের আগ্রাসনে রক্ষণশীল মুসলমানদের ক্ষমতা লোপের ফলে প্রায় একশত বছর পর্যন্ত সূফিগণ প্রচলিত মুসলিম সংরক্ষণশীলতা থেকে বের হয়ে হিন্দু সাধু-সন্ত, যারা বিস্ময়কর মাত্রায় তাঁদের (সূফিদের) প্রভাবান্বিত করে রাখে, তাঁদের সাথে সখ্যতা গড়ে। সূফিগণ বৈষ্ণব বেদান্তিক বিদ্যাপীঠের মুনিবাদ,^{৪৭} ভক্তি^{৪৮} ও যোগসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে সূফিদের মাঝে বেদান্তিক সর্বেশ্বরবাদ একেবারে তুঙ্গে পৌছে।”

এস, আর শারদার এই পর্যবেক্ষণ সঠিক। কারণ, প্রাচ্যের ধর্মসমূহে মরমীবাদ ও নিবৃত্ততা (Abstinence)র এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও পূতঃপবিত্র অবস্থান রয়েছে; বিস্ময়করভাবে, সূফিাদেরও ধ্যান-ধারণা ওরকমই।

ইবনু আরাবীর^{৪৯} মত সূফি বুজুর্গ, যিনি দেওবন্দি আলিমগণের^{৫০} নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি ধর্মেই একটি সত্যের উপাদান বিদ্যমান। তিনি পেগান (Pagan/পৌত্তলিক) ধর্ম সমূহ ও মূর্তি-পূজকদের সত্যের অনুসারী বলে মনে করতেন; কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছুই আল্লাহ; এবং যেহেতু, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই, তাই সৃষ্টির পূজা মানেই স্রষ্টার উপাসনা। ‘আল-

৪৬। সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) : আল্লাহ এবং মহাবিশ্ব এক স্বত্তা, এই বিশ্বাস। এই মতবাদের ধারণা যে, প্রকৃতির দৈহিক শক্তির প্রকাশই আল্লাহ (The World Book Dictionary)।

৪৭। মুনিবাদ (Munism): স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এক এবং আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই- এই মতবাদ। সূফি পরিভাষায় এটি ‘ওয়াহদাতুল-ওজুদ’ নামে পরিচিত।

৪৮। ভক্তি: নিঃস্বার্থ আরাধনা, যার দ্বারা উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক স্বত্তা হওয়া যায়।

৪৯। আবু বকর মুহীউদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ‘আলী-আল-তাই’, সাধারণ ভাবে ‘ইবনু আরাবী (Ibn-I-Arabec: 1165-1240 A.D)’ নামে পরিচিত; তিনি স্পেনের মার্সিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ও দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সূফিাদের মুখ্য বুজুর্গদের একজন ছিলেন, যিনি পৃথিবীর সকল সূফিদের দ্বারা সম্মানিত।

৫০। দেওবন্দ বিদ্যাপীঠ (মাদ্রাসা) এর আলিমগণ ইবনু আরাবীকে একজন “মহান সূফি-সন্ত” মনে করেন এবং তাঁকে আশ-শাইখ-আল-আকবার (মহামতি শাইখ) বলে আখ্যায়িত করেন। মুফতী আঃ রাহমান লাজপুরীকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, “কিছু মৌলভী (ধর্মীয় নেতা) সাহেবরা অভিযোগ করেন যে, মাওঃ রাশীদ আহমাদ গালোহী, মাওঃ মুহাম্মাদ কাসিম নানোতভী, মাওঃ খলিল আহমাদ আবেথী, মাওঃ আশরাফ আলী থানভী এবং এরূপ আরো অনেক ধর্মবৈরাগ্য হাচ্ছেন অবিদ্বান, নাস্তিক, স্বধর্মত্যাগী, মুরতাদ, নব্যতান্ত্রিক (খারেকী), অভিশপ্ত, জাহান্নামবাসী ইত্যাদি। অনুগ্রহপূর্বক মন্তব্য করুন।”

উত্তর : “মানুষকে কলংকলেপন ও ক্ষতিকর কুৎসা রটনা করার অশুভ অপভ্রংশের অপ্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়।” মুফতী লাজপুরী অতঃপর নাবী (আঃ), সাহাবী (রাঃ), ধর্মপ্রাণ ইমাম (রহঃ) ও সূফি-সন্ত, যারা এরকম লাঞ্ছনার শিকার হন, তাঁদের দৃষ্টান্ত দেন। তৎপর তিনি বলেন, “(এমনকি) বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) এর আধ্যাত্মিকতা বা মতামত শরীয়তের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়। মহামতি শাইখ মুহীউদ্দিন-ইবনু-আরাবী সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর কুফরী (Unbelief) ইহুদী নাসারাদের কুফরীর চেয়েও নিকট বা মারাত্মক।” (ফাতওয়া-ই-রাহিমিয়াহ-ইং অনুঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২-৪)।

ফাতুহাতুল মাক্কীয়াহ্’ তাঁর ধ্যান-ধারণা বর্ণনা করে যে, “বান্দাহুই প্রভু, প্রভুই বান্দাহু; আমি মনে করি যে, আমি জানতাম, কোন (নির্দিষ্ট) কাজ করার জন্য কাকে প্রয়োজন; আমি যদি বলতাম যে, ভৃত্য (সেবক), তা’হলে, তা সত্য; বা আমাকে যদি বলা হতো-প্রভু (স্রষ্টা), তা’হলে, তা কি করে তার প্রয়োজনে আসতো?” ইবনু আরাবী সূফিদের সম্পর্কে বলেন, সূফি হলেন পরিপূর্ণ বোধশক্তি সম্পন্ন সে-ই, যিনি উপাসনার প্রতিটি বস্তুতে সত্য (আল্লাহ)র প্রকাশ দেখেন, যে জন্য এটি উপাসিত হয়। তাই, তাঁরা সবাই এর নির্দিষ্ট নামের সঙ্গে একে প্রভু বলে ডাকে; তা সেটি পাথর, বৃক্ষ, জন্তু-জানোয়ার, ব্যক্তি বিশেষ, নক্ষত্র বা ফিরিশ্তা/দেবদূত, যা-ই হোক^{৫১}।

১। প্রভুর সন্ধানে :

হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে অনেক সুমহান জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ উত্তরাধিকার করেছে বলে দাবী করেন। কিন্তু, এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাঁদের সব দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ তেপান্তর (উষর জনহীন প্রান্তর) এ অত্যাবশ্যকীয় ভাবে পরিভ্রমণ করেন ----- স্রষ্টা বা প্রভুর সন্ধানে। সূফিগণ ও পথ নির্দেশ বা হিদায়াহর জন্য কুর’আন ও সুন্নাহর সাহায্য না নিয়ে অরণ্যে বা তেপান্তরে ঘুরাফিরা করেন আল্লাহর সন্ধানে। তাঁরা নিজেদেরকে সমাজ-সংসার থেকে নির্দিষ্ট সময় (চিল্লাহ) এর জন্য বিচ্ছিন্ন রাখেন, এবং এর ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত তাঁদের বইতে আছে....।

ক) মাওঃ যাকারিয়াহ্ বলেন, “তিনি (ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী) নিজেকে লোকালয় থেকে প্রস্থান করিয়ে পাজ্রাবের তেপান্তরে পরিভ্রমণ বা ঘুরাফিরা করাতেন, যা তাঁর বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল। তিনি আটদিন পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতেন। এই স্ব-নির্ধারিত উপবাসের সময় তাঁর গলনালী দিয়ে একটা শয্য দানাও অন্তর্হিত হতো না।”^{৫২}

খ) মাওঃ যাকারিয়াহ্ বলেন, “একজন ভিক্ষুক (ছদ্মবেশী সূফি বৃজুর্গ) চিবিয়ে আব্দুল হাদিকে কিছু খেতে দিল। যখন তিনি দানাটুকু খেলেন, তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হওয়া শুরু হলো। শাইখ আব্দুল হাদি সঙ্গি-সাথী অপছন্দ করা শুরু করলেন এবং গুহা বা আবদ্ধ স্থানে কাল কাটানোতে অভ্যস্ত হলেন। তিনি অরণ্যে ঘুরাফিরা করতেন ও বেশীরভাগ সময় সেখানেই কাটাতেন।”^{৫৩}

৫১। আল-ফুসুস (১/১৯৫), আল-ওয়াকিলঃ হাযিহি হিয়াস-সূফিয়াহ্ (পৃঃ ৩৮)।

৫২। মাহাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ২২০) ও ইমদাদুল-মুশ্তাক ইলা আশরাফুল-আখলাক (উর্দু, পৃঃ ৮-৯)।

৫৩। মাহাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ২০৫)।

গ) মাওঃ যাকারিয়াহ বলেন, “শাইখ আহমদ আব্দুল হক রাদোলী ছিলেন আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভকারী ব্যক্তি, এবং ইলুম-ই-বাতিনিয়াহ (অন্তর্জ্ঞান) তাঁকে পুরো মাত্রায় আকৃষ্ট করেছিল। এমনকি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পূর্বেই তিনি নির্জনতা ও অরণ্যে ঘুরাফিরার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছিলেন।”^{৫৪}

২। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক :

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সর্বসম্মতভাবে এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, সকল কিছুই স্রষ্টা (অর্থাৎ, প্রভু ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই; স্রষ্টা এবং সৃষ্টি বাস্তবে এক), এবং পরিশেষে সব কিছুই তাঁতে (স্রষ্টায়) নিমজ্জিত বা বিলীন হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে এই বিলীন হওয়াই মূলতঃ উপাসনার অতীষ্ট লক্ষ্য, যা “মোক্ষ্য” নামেও পরিচিত। হিন্দু ও সুফিবাদের এই সর্বেশ্বরবাদ ভাবনা বিশ্বয়করভাবে এক। যদি কেউ হিন্দুদের গ্রন্থে সর্বেশ্বরবাদ অধ্যয়ন করেন এবং তা সুফিবাদের বইয়েও দেখেন, তাহলে কদাচিৎ কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেন। আমরা এর প্রচুর প্রমাণ দেখব ওয় অধ্যায়ের সর্বেশ্বরবাদ ‘ওয়াহদাতুল-ওজুদ’ বা ‘মোক্ষ্য’তে।

৩। নিবৃত্তি (চরম ব্রতচার)ই ধর্মানুরাগ ও জ্ঞানের চাবিকাঠি :

এ সকল ধর্মানুসারে, ধর্মানুরাগ, প্রজ্ঞা ও স্রষ্টার নৈকট্য লাভ শুধু সভ্যসমাজ ছেড়ে নির্জন তেপান্তরে কালাতিপাতের মাধ্যমেই সম্ভব। সাধু-সন্ন্যাসীরা রুঢ় নিবৃত্তি অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁদের জীবনকে চরম রুঢ় ব্রতচার, তথা- স্বেচ্ছা-শৃংখল, যার মধ্যে পা গাছের ডালে বেঁধে মাথা নীচের দিকে দিয়ে বুলে থাকা ও কন্টকাকীর্ণ শয্যায় নিদ্রাভ্যাস রয়েছে। তাঁরা মূর্তিবৎ নড়াচড়াবিহীন ভাবে ধ্যান মগ্নতায় একভাবে কাটায় সূদীর্ঘ সময়, যখন তাঁরা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজেও অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে করে থাকে।

অধ্যাপক ডি, এস, শরমা (বহু হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থের প্রণেতা) বলেন, “উচ্চমার্গের আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে নির্লিপ্ততা বা নিরাসক্ততা। আমাদেরকে জীবনে শুধু মন্দকে পরাভূত করা নয়, সেই সাথে শুভর (প্রয়োজন) থেকে নিজেরা মুক্ত হতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-ঘরোয়া স্নেহ-মমতা, পারিবারিক বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব এবং বাড়ীর জন্য আমাদের ভালবাসা, ভাল নিঃসন্দেহে। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত এই জাগতিক বিষয়গুলোর সাথে আমরা আবেগতাড়িত ভাবে জড়িত থাকব, ততক্ষণ আমরা আধ্যাত্মিক সোপানের একেবারে নীচের ধাপে থাকব”^{৫৫}।

৫৪। মাশাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১৬৬-১৬৭)।

৫৫। The Religion of the Hindus'-by Prof. D.S. Sharma, P-12।

সুফিগণও জাগতিক আনন্দ থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত রাখার ব্রতে বিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর আশীর্বাদ, তথা-রাহমাত থেকে বঞ্চিত করেন। ইরশাদুল মূল্যকে বর্ণিত হয়েছে, “কিছু সুফিগণের মতে, অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তৃষ্ণা হচ্ছে, একটি প্রবঞ্চনামূলক স্পৃহা। অতএব, যে-ই তৃষ্ণার্ত হয়ে কম পানি পানের অভ্যাস জন্মায়, আল্লাহ তার তৃষ্ণা নিবারণ করেন, যে পর্যন্ত না সে একাধারে কয়েক মাস পিপাসা নিবৃত্তি না করে থাকতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এমনকি, তার পানি পানের আকাংখাও জাগ্রত হবে না। এতদসত্ত্বেও, তার দৈহিক স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হবে না। সে যে খাবার গ্রহণ করে তার আদ্রতা থেকেই তাঁর (সুফির) দেহ রক্ষিত হয়^{৫৬}।”

তাদের পুস্তকাদি থেকে আমরা তাঁদের শাইখদের ঘুরে বেড়ানো এবং উপবাসের অনেক কাহিনী পাই, যেমন-

অ) “তিনি (খাজা আবু হুরায়রাহ) নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতা খুব ভালবাসতেন। তাঁর পুরো জীবন একটি কক্ষে কেটেছে। তিনি এত জোড়ে চিৎকার করতেন যে, মানুষ ভাবতো, উনি মারা যাবেন। তিনি সকল সুস্বাদু খাবার পরিত্যাগ করেছিলেন^{৫৭}।”

আ) “খাজা শরীফ যান্দানী লোকালয় থেকে পালিয়ে অরণ্যে ৪০ বৎসর অতিবাহিত করেছেন। তিন দিন পর নামাক বিহীন সব্জী খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করতেন^{৫৮}।”

ই) খাজা উসমান হারুনী ৭০ বৎসর যাবত মুজাহাদাহ অবলম্বন করেছিলেন, অতিরিক্ত বা পরিতৃপ্তি সহকারে কখনোই আহার করতেন না ঐ সময়ে। তিনি শুধু ৭ দিন পর একবার মুখভর্তি পানি পান করতেন^{৫৯}।”

ঈ) হযরত ফরিদুদ দীন এর শাইখ তাঁকে (ফরিদুদ দীন) তিন দিন পর্যন্ত ভূখা থেকে গায়েব (অদৃশ্য) থেকে যা আসে তা খেতে বলতেন। তিন দিন পর কিছুই এলো না। অত্যাধিক বুড়ুক্ষার কারণে ফরিদুদ দীন তাঁর মুখে কিছু কাঁকর বা নুড়ি রেখেছিলেন, যা চিনিতে পরিনত হয়, সে এগুলো বের করে দেয় মুখ থেকে। কিছুক্ষণ পর আরো কিছু কাঁকর মুখে পুরলেন, তা’ও চিনিতে পরিনত হলো।

তৃতীয় বারের মতও একই ব্যাপার ঘটলো। ফরিদুদ দীন যখন তাঁর শাইখকে ঘটনাটি বললেন, তখন শাইখ বললেন, “এটা ভাল হতো, যদি তুমি তা খেয়ে নিতে^{৬০}।”

উ) খাজা ইল্ল মুম্বশাদ দিষ্মারী শাস্ত্রত উপবাসী (ব্রতচারী) ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি কখনো শৈশবে মায়ের দুধ পান থেকেও নিজেকে নিবৃত্ত রাখতেন। তাই, তাঁকে আজন্ম ওয়ালী বলা হতো।^{৬১}

৫৬। ইরশাদুল-মূল্য (ইং অনুঃ পৃঃ ৭০)।

৫৭। মশাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১২৫)।

৫৮। মশাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১৪০)।

৫৯। মশাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১৪২)।

৬০। মশাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১৫৬)।

৬১। মশাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১২৬)।

উ) মাওঃ যাকারিয়াহ্ বলেন, বর্ণিত আছে যে, “খাজা আবু আহমাদ আদাল চিশ্তী ৩০ বছরে কখনো বিছানায় নিদ্রিত হন নি”।^{৬২}

৪। ধ্যান, অতিরিক্ত স্তবগান ও সুদীর্ঘক্ষণ নিঃশ্বাস ধরে রাখা :

অতিরিক্ত স্তবগান ও সুদীর্ঘক্ষণ নিঃশ্বাস আটকে রাখার মত চর্চাগুলো মরমিবাদের অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ। এটা সাধারণতঃ নিভুতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এ ধরনের ধর্মীয় আচার হৃদয়-মনকে জ্ঞানালোকিত করে দৈব বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী করায়। সুফিদেরও অনুরূপ ধরনের যিক্র আছে। মাওঃ যাকারিয়াহ্ বলেন, “হযরত নিজামুদ্দিন আল-উমারীকে তাঁর শাইখ এক নিঃশ্বাসে ৯০ বার আল্লাহ্ যিক্র করতে এবং ক্রমান্বয়ে তার সক্ষমতা অনুযায়ী এটাকে বাড়িয়ে যেতে বলেন। পরিশেষে, তিনি এক নিঃশ্বাস (দম) এ ৪০০ বার পর্যন্ত বলার অভ্যাস গড়েন।”^{৬৩}

সুদীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে শ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাস, যেমন –সুফি যিক্রে শ্বাস নেওয়ার সময় ‘লা-ইলাহা’ এবং ছাড়ার সময় সজোরে তীক্ষ্ণভাবে ‘ইল্লাল্লাহ্’ বলার বিষয়গুলো প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মেও দেখা যায়। ইসলাম কখনোই এ ধরনের শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশলকে ইবাদাহ্‌র অংশ বলে না, বা এতদসংক্রান্ত কোন পথনির্দেশও দেয় না। সুফিবাদের এ ব্যাপারটি ৭ম অধ্যায়ে ‘ইসলামে ইবাদাহ্‌’র পুনরায় আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌।

৫। অনন্ত জীবনের ধারণা (মতবাদ) :

অনন্ত জীবন আছে বলে দাবী করা হয় প্রাচ্যের মরমিবাদে। যদি মরমি (আধ্যাত্মিক গুরু)র নিজের অস্তিত্বের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকতো, তা’হলে কোন মানুষই তাঁর উপাসনা করতো না, বা মন্দকে এড়ানোর জন্য তাঁর উপর নির্ভর করতো না। মৃত্যুর ধারণা ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা কোন মানুষের ক্ষতি এড়াতে বা সাহায্য করতে পারে নি। তেমনি, অনন্ত জীবনের ধারণা- যেমনটি রজনীশ এর গোরেও উৎকীর্ণ হয়েছে, “ওশো-কখনো জন্মেনি, কখনো মরেনি- শুধু এই গ্রহ মর্তালোক পরিদর্শন-পরিভ্রমণ করেছিলেন ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩১ই: থেকে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৯০ ই: পর্যন্ত।”^{৬৪}

সুফিবাদ তাঁদের শাইখগণকে ক্বাবরে স্বজ্ঞানে জীবিত বলে মনে করে। তাঁরা তাঁদের

৬২। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১৩১)।

৬৩। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ, পৃঃ ১৯২)।

৬৪। সুফিবাদের প্রতি রজনীশের এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাই এ বিষয়ের উপর অনেক বই লিখেছেন; যেমন “Soofis-the People of the Path”, “Just like that”, “The Secret”, “The Wisdom of the Sands”, “The Perfect Master” এবং “Until You Die” ইত্যাদি।

অনুসারীদের কল্যাণ সাধন করতে পারেন বলে মনে করেন। মাওঃ যাকারিয়াহু তাঁর ‘মাশাইখ-ই-চিশত’ বইয়ে হাজী ইমদাদুল্লাহু মুহাজির মাক্কীকে এ ভাবে উদ্ধৃত করেছেন, “ফাক্বির মরে না, শুধু এক আবাস থেকে অন্য আবাসে স্থানান্তরিত হয়। ফাক্বির এর শরীরি জীবন থেকে যে কল্যাণ পাওয়া যেত, ক্বাবর থেকেও তাই পাওয়া যায় ^{৬৫}।” উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে দেখা যায় যে, সুফিবাদে পেগান (Pagan) ধর্মের অনেক ভ্রান্ত, অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। রাসুলুল্লাহু (সাঃ) ও তাঁর সাহাবী (রাঃ) গণ কক্ষনো সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন যাপন করেননি, বা আল্লাহর হালাল রাহ্মাত-আশীর্বাদ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতেন না। তাঁরা কখনোই স্বেচ্ছা-দত্ত ভোগ বা সুফিদের নির্ধারিত নবোদ্ভাবিত (বিদ’আহু) পদ্ধতির মাত্রাতিরিক্ত (অতিরঞ্জিত) যিক্র-আয্কার করতেন না। তাঁরা জানতেন যে, অরণ্যে পরিভ্রমণ নয়, বরং, শুধুমাত্র ‘শ্রকাশ’ {আল্লাহর নামিলকৃত ক্বুর’আন ও রাসুল (সাঃ) এর অনুসৃত নীতি-আদর্শ, তথা-হাদীস} এর অনুসরণেই হিদায়াহু লাভ সম্ভব।

দেওবন্দি-বেরেল্‌জীগণের দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক পটভূমি

দেওবন্দি ও বেরেল্‌জীগণের মধ্যে তিক্ত মতপার্থক্য ও হানাহানির কারণে উপমহাদেশে (পাক-ভারত-বাংলাদেশ) মুসলমানদের মাঝে প্রভূত দ্বন্দ্ব ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য কতগুলো বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল সূরাহু আল-আহযাব এর খতমে নবুয়াত সংক্রান্ত আয়াত এর তাফসীর (ব্যাখ্যা) নিয়ে মতভেদ বা ফাটল, যা থেকে পরবর্তীতে দেওবন্দি বিদ্যাপীঠের জন্ম। আল্লাহ বলেন, “মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নাবী।” ^{৬৬}

মাওঃ আহুসান নানোতভী (একজন প্রখ্যাত দেওবন্দি আলিম) উল্লেখ করেন যে, “সূরাহু আল-আহযাবে বর্ণিত ‘খতমে নবুয়াত’ আর একজন নাবীর আগমনকে প্রত্যাখান বা অগ্রাহ্য করে না। এবং এমনকি, আর একজন নাবীর যদি আবির্ভাব ঘটেও, তা মুহাম্মদ (সাঃ) এর সর্বশেষত্ব (খতমে নবুয়াত) কে খর্ব বা প্রভাবিত করবে না^{৬৭}।” বেরেল্‌জীগণ এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং একে দেওবন্দিগণের বিরুদ্ধে কুফরী (তাক্ফীর) এর দলিল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

৬৫। মাশাইখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ, পৃঃ ২১১)।

৬৬। সূরাহু আল-আহযাব (৩৩ঃ৪০)।

৬৭। “আহুখিরুন-নাস” পৃঃ ৩ ও ২৫।

দেওবন্দিগণও অনর্থক বা বাজে বিষয় নিয়ে বেরেল্‌জীগণের সঙ্গে তর্কে বা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। যেমন, 'ইমকান আল-কাযিব' অর্থাৎ-আল্লাহর মিথ্যাচার (নাউযুবিল্লাহ) সামর্থ্য আছে কি না? অন্যান্য দ্বন্দের বিষয় হলো-মিলাদ (নাবী সাঃ এর জন্মদিন) উদযাপন ও এতদসংক্রান্ত নানা ধরনের অনেক বিদায়াহ; যেমন-বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাওয়ার আগে সূরাহ ফাতিহাহ তিলাওয়াত, বৃজুর্গ বা অলী-আউলিয়াদের মাযারে ওরস উদযাপন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বত্র বিরাজিত-এই বিশ্বাসে তাঁর কাছে যাচঞা বা সাহায্য প্রার্থনা করা, ইত্যাদি^{৬৮}।

বাস্তব মতানৈক্য

প্রকৃতপক্ষে, নীতির চেয়ে বাস্তবে (আচার-আচরণে) বেরেল্‌জী ও দেওবন্দিগণের মধ্যে মতানৈক্য অনেক বেশী। বেরেল্‌জীগণের সঙ্গে মতদ্বৈততায় সেতুবন্ধ গড়ার উদ্দেশ্যে দেওবন্দিগণ রচিত নানা পুস্তকাদিতে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। বেশীরভাগ দ্বন্দ্ব হয় সুফি পর্যায়ের, অথবা বিশেষ গোষ্ঠি বা সবার প্রসঙ্গে। এর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে-ধ্যান (মুরাকাবাহ), এবং মাযার থেকে ফায়দা চাওয়া। যদিও দুই পক্ষই বাহ্যিক ভাবে এতে মতবিরোধ করে, কিন্তু, বাস্তবতা হচ্ছে- বেরেল্‌জীগণ বলেন এবং পরামর্শ দেন যে, মাযার থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য সবাই সেখানে যেতে পারে; পক্ষান্তরে, দেওবন্দিগণ ব্যক্তি বিশেষ এর যাওয়ার কথা বলেন। অতএব, দেওবন্দি এবং বেরেল্‌জীগণের মধ্যে আক্বীদাহগত পার্থক্যের চেয়ে পারস্পরিক পছন্দ-অপছন্দের অমিলই বেশী। দেওবন্দিগণকে কুফরী (তাক্‌ফীর)র অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে বেরেল্‌জীগণ অনেকটা চক্রান্তমূলক তত্ত্ব (মতবাদ) এবং অপব্যাক্যার সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা (বেরেল্‌জীগণ) মাওঃ আহসান নানোততীর বক্তব্য-“যদি আর এক নাবী আসেনও” এর উপর অনেক শোরগোল করেছেন; কিন্তু, এই মন্তব্য সুফি দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর নয়। সুফিদের একটি সাধারণ ধারণা থেকে এটি উদ্ভূত যে, “সবকিছুই মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নূর থেকে সৃষ্ট”, এবং একেবারে প্রথম থেকেই তিনি (সাঃ) হচ্ছেন ‘নাবুয়্যাতের দীল-মোহর’। অধিকন্তু, ‘সত্যিকার সুফিগণ’ জানেন যে, যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই, তাই বাস্তবে রাসুল (সাঃ) এর অস্তিত্ব নেই; ফলে, বাস্তবে রাসুল (সাঃ) এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা শিরক। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দুই সুফি দলের মধ্যে পার্থক্য যতকিঞ্চিৎ, এবং তা হচ্ছে- ধর্মের চেয়ে দলগত কোন্দল। সুফিগণ সাধারণতঃ ‘আক্বীদাহ’, যা ইসলামের ‘প্রাণ’-কে যথাযথ মূল্যায়ন করেননা। আমরা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্বীর বক্তব্যের আলোকে এর আরো ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ।

৬৮। বেহেশতী জেওর, ১২শ খত, পৃঃ ২২২ (Unity in Islam, by: Hajee Imdadullah)

ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর একটি প্রবন্ধের আলোকে সুফিগণের নিকট আকীদাহুর বৈশিষ্ট্যঃ

প্রথমতঃ দেওবন্দিগণ ও তাবলীগ জামা'য়াতের উপর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর দর্শন এর প্রভাব অপরিসীম। তিনি মাওঃ আশরাফ আলী থানভী, রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী ও কাসিম নানোতভীর মত বহু দেওবন্দি আলিম এর আধ্যাত্মিক গুরু। মাওঃ রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী তাঁর শাইখ্ ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীকে “ও আমার দু'জাহানের গতি (আশ্রয়)” বলে সম্বোধন করতেন (নাউয়ুবিল্লাহ)^{৬৯}। অন্য দিকে, মাওঃ যাকারিয়াহ (ফাজায়েলে আ'মালের প্রনেতা) তাঁকে ‘মানবতার পথ-প্রদর্শক’ বলতেন^{৭০}।

ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর ‘ইসলামে ঐক্য’ নামে একটি রচনা ‘বেহেশতী জেওর’^{৭১} এর ইংরেজী সংস্করনে সংকলিত হয়; এবং এর বিষয়-বস্তু হচ্ছে- “দেওবন্দি-বেরেলভী দ্বন্দ্ব”। এই রচনায় ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্ম স্মরণে মিলাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন। এই সমাবেশে রাসুল (সাঃ) এর স্তুতি গাওয়া ও সালাম জানানো হয় (জীবিত জেনে), এবং এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে কিয়াম করে সম্ভাষণ জানানো হয় তাঁকে (সাঃ) সবার মাঝে উপস্থিত ভেবে^{৭২}। মিলাদ মাহফিল সম্পর্কে দেওবন্দি আলিমগণের প্রখ্যাত শাইখ্ ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী বলেন, “মিলাদে যারা কিয়াম করেনা তাদেরকে আপনারা অপছন্দ করবেন না; কারণ, এটি ওয়াজিব (কাজিত) বা ফারজ (বাধ্যতামূলক) নয়। আপনারা যদি কাউকে জানেন যে, সে কিয়ামকে ওয়াজিব মনে করে, তাহলে এটা শুধু তার জন্য বিদ'আহ্ হবে। যাহোক, যারা মিলাদে কিয়াম করেন, তাদের সবাইকে বিদ'আহ্‌তী বললে মাত্রাতিরিক্ত হবে। এটা খুবই সম্ভব যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জালাতে ফিরিশ্তা দ্বারা বা তাঁদের ছাড়া আমাদের কার্যাবলীকে দেখানো হচ্ছে, যেমনভাবে টেলিভিশনে বা অন্য মাধ্যমে দেখানো হয়।” তিনি আরও বলেন, “ইমাম আবু হানিফাহ্ ও ইমাম আশ্-শাফি'ঈর মতপার্থক্যের মত এই পার্থক্যগুলোকে গুরুত্বহীন মনে করবেন। যেখানে এগুলো প্রচলিত, সেখানে এ অনুষ্ঠানগুলোকে অবজ্ঞা করবেন না। প্রয়োজনে কিয়াম বাদ দিয়ে কিয়াম বিরোধীদেরও এ অনুষ্ঠানে ডাকা উচিত। যাহোক, যদি এরূপ করা সম্ভব না হয়, তা'হলে, কিয়াম বিরোধীরা এটা বাদ দিয়ে শুধু সালামে

৬৯। মাহশিখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ, পৃঃ ২৪২)।

৭০। মাহশিখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ, পৃঃ ২১৮)।

৭১। ‘বেহেশতী জেওর’ মাওঃ আশরাফ আলী থানভী কর্তৃক প্রণীত দেওবন্দিগণের নিকট অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষক একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ফিকহ্ এর একটি দৈনন্দিন বিষয় রয়েছে, এবং ঐতিহ্যগতভাবে বিয়ের সময় কনেদের যৌতুক দেয়া হয়।

৭২। দক্ষিণ আফ্রিকার দেওবন্দ-পন্থী ‘মাজলিস উলেমা’ বলে, মিলাদের সময় দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে এই বিশ্বাস যে, রাসুল (সাঃ) এ সকল সমাবেশে হাজির হন। এই বিশ্বাস বা ধারণা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর সর্বত্র বিরাজমানতা (সব স্থানে সব সময় বর্তমান বা হাজির) এর গুণ বর্ডায়। একই গ্রন্থে বলেন যে, পেগান (নাস্তিক) থেকে মিলাদের উৎপত্তি। (দক্ষিণ আফ্রিকার দেওবন্দ-পন্থী ‘মাজলিস উলেমা’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘মিলাদ কি?’ বইয়ের ১২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া উদ্ধৃতি সমূহ)।

বাকীদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করবে^{৭৩}।” গান-বাজনা (যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম) সম্পর্কে মন্তব্য^{৭৪} করতে গিয়ে মুহাজির মাক্কী বলেন, “একে অপরকে বিদ’আহতী ও ওয়াহাবী বলবেন না, মধ্য পন্থায় শান্তিতে থাকুন। শামা ও কাওয়ালী যন্ত্রসহ বা যন্ত্রবিহীন সমবেত গান ও এমনই বিতর্কিত। কিছু প্রণয় পছন্দকারী সুফি (আহলে-মুহাব্বাত) যন্ত্র-সঙ্গীত (গান-বাজনা) এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন; এবং সব চাইতে ভাল, অন্যকে ভদ্র না বলা। যারা এগুলোর প্রয়োজন অনুভব করবে না, তারা পালনও করবে না; তথাপি, গুরুত্বহীন পার্থক্যে দ্বিধা-বিভক্ত হবেন না^{৭৫}।” আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নীতিগতভাবে দেওবন্দিগণ বেরেল্জীগণের সঙ্গে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একমত; শুধু ছোটখাট ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের বা সবার ধর্মাচারের ব্যাপারে কিছু ফারাক। ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কীর এই রচনাটি একটি উন্মুক্ত প্রমাণ, যাতে দু’টি দৃষ্টান্ত (মিলাদ ও গান-বাজনা) প্রতীয়মান হয়েছে।

হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী তাঁর অনুসারীদের উপদেশ দেন যে, (১) মিলাদ, (২) জলসা, (৩) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানানো (কিয়াম করা) ও (৪) মৃত্যুর পরও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একই সময় সর্বত্র বিরাজমানতার ধারণা বিদ’আহ্ নয়, যারা মিলাদে কিয়াম বাধ্যতামূলক মনে করে তাদের নিয়েই সমস্যা। অধিকন্তু, এই “পেগান (নাস্তিক) উদ্ভূত রীতিনীতি” (ইদানিংয়ের দেওবন্দিগণ এটি যেমন বলেন) কে কোন সত্যিকারের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি; যদ্বন্ধন, তাঁর অনুসারীগণ মিলাদে অংশ নেয়।

ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী উল্লেখিত তথাকথিত ‘আহলে-মুহাব্বাত’ হচ্ছে তাঁরা, যারা আল্লাহকে তুষ্ট করার জন্য হারাম গান-বাজনা করা এবং শুনায় আপুত (নাউযবিলাহ্)। ধর্মীয় কাজের অতিরঞ্জন খুবই খারাপ; কিন্তু, হারাম কাজের অনুবর্তী হয়ে আল্লাহকে রাজী-খুশী করার দাবী সবচেয়ে জঘন্য। এই নিবন্ধ আরেকটি প্রশ্নের

৭৩। বেহেশতী জেওর (ইং অনুঃ, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২২)।

৭৪। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “আমি দু’টি আওরাজ নিবেদন করি (যা হচ্ছে নিবুদ্ধিতা ও গর্হিত নির্লক্ষ্যতা) : একটি হচ্ছে, বাস্যবস্ত্রের সাথে কর্তৃশ্বর (গান), আর একটি শয়তানের বাণী” (আল-হাকিম বর্ণিত)। যারা গান-বাজনাকে বৈধ মনে করে, তাদের হুঁশিয়ার করে নাবী (সাঃ) বলেন, “আমার উম্মাহর মধ্যে কিছু লোক থাকবে যারা চেষ্টা করবে বৈধ করতে-ব্যভিচারকে, রেশমী বস্ত্র পরিধানকে (পুরুষ কর্তৃক), মদ্যপান ও গান-বাজনা (মা’আযিক) কে। তখন আল্লাহ তাদের উপর রাতের বেলায় পাহাড় ধসিয়ে ধ্বংস করবেন, যখন অন্যদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করেন। কিয়ামাহ পর্যন্ত তারা এই অবস্থায়ই থাকবে।” (সহীহ্-আল-বুখারী, ইং অনুঃ ৭ম খণ্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)। সুফিগণ এই হারাম কাজকে আত্মার খোরাক মনে করেন। আবু বাকুর আল-কালাবাদি বলেন, “আমি আবুল-কাসিম আল-বাগদাদীকে বলতে শুনেছি যে, শ্রবণ দুই প্রকার, এক শ্রেণী শুনে ধর্মোপদেশ দিতে এবং এর থেকে সদুপদেশ নিতে; এই শ্রেণী শুনে বাহ-বিচার করে চিত্তবিনোদনের জন্য। আর এক শ্রেণী গান-বাজনা আধ্যাত্মিকতার খোরাক হিসেবে শুনে, যখন আত্মা যথাযথ অবস্থান অর্জন করে দেহের অপশাসন থেকে বেড়িয়ে আসে, তখন শ্রোতার মাঝে দোশা ও উত্তেজনার উল্লেখ ঘটে (The Doctrine of the Sufis, P-164)।

৭৫। ‘বেহেশতী জেওর’ ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৩ (ইং অনুঃ ‘Unity in Islam’, by Haji Imdadullah)। মাওঃ যাকারিয়াহ্ তাঁর ‘মাশাইখ-ই-চিশত’ বইতে মাওঃ আশরাফ আলী থানভীর ‘হাক্কাস-সামা’ বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে যেয়ে পাঁচ পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মর্মার্থ হচ্ছে, সুফিগণ কিছু শর্ত সাপেক্ষে ‘সামা’ বা গান-বাজনা শুনেতে পারবেন (মাশাইখ-ই-চিশত, ইং অনুঃ, পৃষ্ঠা ১৭৪)।

অবতারণা করে যে, কিছু ক্রিয়া-কর্ম সাধারণ মুসলমানের জন্য হারাম এবং বিশেষ কারো জন্য হালাল। কেউ কি শরীয়াহর উদ্দেশ্য? তদুপরি, হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী আক্বীদাহ্, হালাল-হারামের বিষয়গুলোকে গুরুত্বহীন মনে করেন। তিনি এ ধরনের মতভেদকে উম্মাহর জন্য রাহুমাত স্বরূপ বিবেচনা করেন।^{৭৬}

মিথ্যাশ্রিত সত্যের প্রচার

দেওবন্দি ও বেরেলভী উভয়দেবই নিজস্ব বিশেষ ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ, লেখালেখি (Literature) এবং দাওয়াহ্ সংগঠন আছে। দু'দলকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করে সুফিবাদে প্রভাবান্বিত বলে মনে করা অসংগত হবে; কারণ, বেরেলভীগণ সরাসরি কুফর আখ্যা দেন এবং খোলামেলা এ ধরনের কাজকে সমর্থন করে কুরআনের কিছু আয়াত এবং হাদীসের অর্থকে বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করেন। দেওবন্দিগণ, যাহোক, খোলামেলা মাযার-পূজা, সম্ভ্র(পীর)-পূজা ও অন্যান্য শিরুক-বিদাআহ্ জাতীয় কাজ করতে বলেন না। বরং, তাঁদের দাওয়াহ্ সংগঠন তাবলীগ জামা'য়াত সালাহ্ (নামায) আদায়ের মত ধর্মীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু, তাঁদের বিশ্বাসে বহু ধরনের শিরুকের প্রভাব এবং ক্রিয়া-কর্মে বিদ'আহ্‌র চর্চা ঘটেছে। সুতরাং, তাঁরা হয়তো কম গোমরাহ্ হতে পারেন। কিন্তু, সাধারণভাবে তাঁরা মুসলমানদের কাছে তাঁদের লুক্কায়িত স্বভাব (তথা, ক্রিয়া-কলাপ) এর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

বিভ্রান্তিজনিত ন্যায় বা সত্যের প্রচারকদের রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ভবিষ্যবচন করেছেন। ছয়ায়ফাহ্ আল-ইয়ামান (রাঃ) বর্ণনা দেন, “লোকেরা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে শুভ (ভাল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, আর আমি জিজ্ঞাসা করতাম মন্দ (অশুভ) সম্পর্কে, এই ভয়ে যে, এটাতে আমি পতিত হতে পারি। তাই, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)। আমরা অজ্ঞতা ও অশুভের মধ্যে ছিলাম, তখন আল্লাহ্ আমাদের এই শুভ বা কল্যাণ (অর্থাৎ, ইসলাম) দান করলেন। অতএব, এই শুভর পর কোন অশুভ কি হবে (আসবে)?” তিনি (সাঃ) বললেন, ‘হ্যাঁ’। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ঐ অশুভর পর কি কোন শুভ (কল্যাণ) হবে?’ তিনি (সাঃ) জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, কিন্তু, এটি ক্রটিযুক্ত’। আমি প্রশ্ন করলাম, ‘এর ক্রটি কি হবে?’ তিনি (সাঃ) জবাব দিলেন, ‘এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার পথ ছাড়া অন্যদের পথে পরিচালিত করবে, তোমরা তাদের কিছু কাজের অনুমোদন দেবে, এবং কিছুর দেবে না।’^{৭৭}

৭৬। বেহেশতী জেওর (১২শ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২২)।

৭৭। সহীহ্ আল-বুখারী (ইং অনুঃ ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬০)। সহীহ্ মুসলিম (ইং অনুঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং ৪৫৫৩) ও ফাতহুল বারী (১৩/৩৭)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী চেতনায় তাওহীদ (একেশ্বরবাদ)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ধর্মের প্রথম মূল ভিত্তি ‘তাওহীদ’ (আল্লাহর নিরঙ্কুশ এককত্ব) অনুধাবন ও প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (অর্থ- ‘আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নাই’) সাক্ষ্যের মাধ্যমে। ধর্মের আর কোন দিক নয়, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় শুধু আল্লাহর এককত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুদীর্ঘ তের বছর ধরে। এটি এজন্য যে, সত্যিকারের বিশ্বাস (আক্বীদাহ) হচ্ছে, ইসলামের মূল বা ভিত্তি। প্রকৃত বিশ্বাস (আক্বীদাহ) থেকে উৎসারিত ক্রিয়া-কলাপই কেবল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য; তাই, একজন মুসলমানের দায়িত্ব, তাঁর আক্বীদাহকে সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি (গোমরাহী) থেকে পরিপূর্ণভাবে হিফায়তে রাখা।

ইসলামী চেতনায় তাওহীদ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত -

১। তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্,

২। তাওহীদ আল-উলুহিয়াহ্ ও

৩। তাওহীদ আল-আস্মা-ওয়াল-সিফাত; যা যথাক্রমে বুঝায় যে আল্লাহ ‘এক’...

- তাঁর রাজত্বে এবং ক্রিয়া-কলাপে (শরীকহীনভাবে) বিশ্বাস করা ও মানা।
- তাঁর উপাসনা এবং অনুসরণীয়তায় (অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে) বিশ্বাস করা ও মানা।
- তার গুণাবলীতে (সাদৃশ্যহীনভাবে) বিশ্বাস করা ও মানা।

১। তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্ (আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস) :

একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন রাক্ব (স্রষ্টা/ধারণকর্তা/দ্রাতা/পালনকর্তা/প্রভু)-এই বিশ্বাসের অর্থই ‘তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্’। তাঁর রাজত্বে ও ক্রিয়া-কলাপে কোন শরীক (অংশীদার) নেই। একমাত্র আল্লাহই কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি মানুষের নিয়তি (রিয়ক) পরিবর্তন করেন, এবং একমাত্র তিনিই নিরঙ্কুশভাবে সার্বভৌম (স্বয়ংসম্পূর্ণ), যার উপর সমগ্র সৃষ্টিজগত নির্ভরশীল। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্ম-বিধায়ক”^{৭৮}। “আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর চাষি তাঁরই নিকট। তিনি যাকে ইচ্ছা তার রিয়ক বর্ধিত বা সংকুচিত করেন। তিনি অবশ্যই সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত”^{৭৯}।

৭৮। সূরাহ আয-যুমার (৩৯ : ৯৬২)।

৭৯। সূরাহ আশ-শূরাহ্ (৪২ : ১২)।

‘তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্’র এ বিশ্বাস অন্তর্গত যে, আল্লাহ্ অনন্য, অদ্বিতীয়, তথা-অতুলনীয়। তাঁর কোন স্ত্রী-সন্তান নেই, নেই কোন মাতা-পিতা। আমাদের রাব্ব বলেন, “বলুন, তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী (সার্বভৌম), সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো জনক নন এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি^{৮০}।” আল্লাহ্ জীবিত বা মৃত কোন কিছুতে একত্বীভূত/ অঙ্গীভূত/ স্বত্বীভূত বা নিমজ্জিত হন না। কিংবা, আল্লাহ্ কোন কিছুর অংশও নন। জীবিত বা মৃত কোন সৃষ্টি আল্লাহ্‌তে একত্বীভূত/ অঙ্গীভূত/ স্বত্বীভূত বা নিমজ্জিত হয় না। অথবা, কোন সৃষ্টি আল্লাহ্‌র অংশ নয়। সমগ্র সৃষ্টি বস্তু তাঁর আদেশে সৃষ্টি হয় এবং তাঁর ইচ্ছার দাস বা গোলাম।

আরবীয় পেগানগণ তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্ বিশ্বাস করতেন :

পূর্ব যুগীয় দু’একটি জাতি (যেমন-ফিরআউন, নাস্তিকগণ ও বর্তমানের কম্যুনিষ্টগণ, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকারকারী) ছাড়া কেউই এখনো তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্ অস্বীকার করেননি। আরবীয় পেগানগণ, যাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন, তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্‌র বিশ্বাস করতেন। তারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁকে সর্বোচ্চ চরম ও পরম প্রভু হিসাবে জানতেন। তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) সমগ্র বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা বলে তারা স্বীকার করতেন এবং তাঁকে সার্বভৌম ও রিয়্যকদাতা বলে বিবেচনা করতেন, যা সূরাহ্ আল-মু’মিনুন এ প্রতিভাত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, “জিজ্ঞেস করুন, ‘এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে, তা কার, যদি তোমরা জান?’ তখন তারা বলবে, ‘আল্লাহ্‌র’; বলুন, ‘তবুও কি তোমরা শিক্ষা নেবে না?’ জিজ্ঞেস করুন, ‘কে সণ্ডাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি?’ তখন তারা বলবে, ‘আল্লাহ্‌র’; বলুন, ‘তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?’ জিজ্ঞেস করুন, ‘সবকিছুর কর্তৃত্ব কাঁর হাতে, যিনি আশ্রয় দেন ও যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জানো?’ তখন তারা বলবে, ‘আল্লাহ্‌র।’”^{৮১}

যাহোক, তাওহীদ-আর-রুবুবিয়াহ্‌র বিশ্বাস তাদের মুসলমান বানায়নি; যেহেতু, তাদের তাওহীদ আল-উলুহিয়াহ্‌র বিশ্বাস ছিল না। আরব পেগানগণ তাদের সকল ধরনের উপাসনা বা ইবাদাহ্ আল্লাহ্‌কে এককভাবে করতো না, যদিও তারা আল্লাহ্‌কে প্রভু বা রাব্ব হিসেবে মানতো। তারা মনে করতো, ফিরিশ্‌তা এবং বৃজুর্গ ব্যক্তিগণের আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ মর্যাদা রয়েছে; যদ্বকন, তারা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অনুযাচনা বা মধ্যস্থতা করতে পারে। তারা বলতো, “আমরা তো

৮০। সূরাহ্ আল-ইখলাস (১১২ : ১-৩)।

৮১। সূরাহ্ আল-মু’মিনুন (২৩ : ৮৪-৮৯), আরো দেখুন সূরাহ্ আয-যুহরুফ (৪৩ : ৯,৮৭) ও সূরাহ্ আনকাবুত (২৯ : ৬৩)।

এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।”^{৮২} কারো প্রয়োজনে আল্লাহকে ডাকা, ইবাদাহর এক মুখ্য কাজ; কিন্তু, তা যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে বা দিকে করা হয়, তা’ হলে, সেই ইবাদাহ বা উপসনায় শির্ক যুক্ত হয়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন, “তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের পূজা করে, যারা তাদের কোন অপকার বা উপকার করতে পারে না; উপরন্তু বলে- এরা হচ্ছে, আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।”^{৮৩}

তাই, আল্লাহ তাদের মধ্যস্থতা বা সুপারিশকারী তালাশ করাকে শির্ক বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদেরকে কাফির ও মুশরিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাসূল (সাঃ)কে ঘোষণা দিতে আদেশ দিয়েছেন- “আমি তার ইবাদাহ করি না, যার ইবাদাহ তোমরা কর; এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাহকারী নও, যার ইবাদাহ আমি করি; এবং আমি ইবাদাহকারী নই তার, যার ইবাদাহ তোমরা করে আসছো; এবং তোমরা তাঁর ইবাদাহকারী নও, যার ইবাদাহ আমি করি।”^{৮৪} কুর’আন কারীমের এই আয়াতগুলো তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহর সঙ্গে তাওহীদ আল-উলুহীয়াহর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

অপরিহার্য বিষয় :

আলোচিত বক্তব্য থেকে আমরা বুঝি যে, আরবীয় পেগানগণ অজ্ঞতা ও প্রগল্ভতা সত্ত্বেও ইবাদাহর অর্থ পূর্ণাঙ্গরূপেই উপলব্ধি করতো। তারা মধ্যস্থতাকারীদের কাজ ইবাদাহ বলে মনে করতো এবং বৃজুর্গ ব্যক্তিদের কাছে যাচঞা করা যে উপাসনা বা ইবাদাহ, এটা তারা অস্বীকার করেনি। তারা তাদের মূর্তিগুলোকে আ’ম্বলিহা^{৮৫} {আভিধানিক অর্থে, ‘ইলাহ’র বহুবচন, যাদের ইবাদাহ করা হয়} বলে ডাকতো। এটি আজকের ক্বাবর/মাযার পূজারীদের সঙ্গে ভীষনভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা ক্বাবরবাসীকে আল্লাহর কাছে মধ্যস্থতা বা সুপারিশকারী সাব্যস্ত করেও এটাকে শির্ক মনে করে না।

২। তাওহীদ আল-উলুহীয়াহ (আল্লাহর নিরঙ্কুশ একক ইবাদাহ) :

আল্লাহ বলেন, “আপনি বলে দিন- নিশ্চয়ই আমার সালাহ, আমার সকল

৮২। সূরাহ আয-যুমার (৩৯ : ৩)।

৮৩। সূরাহ ইউনুস (১০ : ১৮)।

৮৪। সূরাহ আল-কাফিরুন (১০৯ঃ২-৫)।

৮৫। সূরাহ সোয়াদ (৩৮ঃ৫)।

ইবাদাহ্, আমার জীবন-মরন, সবকিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ্‌র জন্য।”^{৮৬} তাওহীদ আল-উলুহিয়াহ্ বা ইবাদাহ্ (আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ একক ইবাদাহ্) হচ্ছে, তাওহীদী ধারণার সবচেয়ে স্পষ্ট অর্থ। কারণ, ইবাদাহ্‌ই হচ্ছে, ইসলামী চেতনার নির্ধারিত; যেমনটি স্বাক্ষর দেয়া হয়, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” অর্থ- ‘শুধুমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ (উপাস্য) নেই।’

ইবাদাহ্ কি?

ইবাদাহ্ একটি উপলক্ষিমূলক ও অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা- যা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল প্রকার কথা ও কাজকে আবৃত করে, যাতে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সকল পছন্দ-অপছন্দ, আদেশ-নিষেধ এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয় জড়িত। অতএব- সালাহ্, সিয়াম সাধনা, দান-খয়রাত, সত্যবাদিতা, সততা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে ভালোবাসা, অনুতাপের সঙ্গে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা (তাওবা), তাঁর জন্য দ্বীনে আন্তরিকতা, তাঁর রাহ্মাতের আশা করা, তাঁর শান্তিকে ভয় করা, আল্লাহ্‌র কাছে যাচঞা করা, পিতা-মাতার প্রতি মমত্ববোধ, প্রতিবেশী-আত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতি সদাচার, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করা, ইত্যাদি সবই বিভিন্ন ধরনের ইবাদাহ্।^{৮৬ক}

ইবাদাহ্‌র শর্তসমূহ

আল্লাহ্ বলেন, “যে প্রতিপালকের সাক্ষ্যাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের নিরঙ্কুশ একক ইবাদাহ্‌য় কাউকেও শরীক না করে।”^{৮৭} এই আয়াতের তাফসীরে হাফিজ ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন. ‘..... তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষ্যাৎ করে বিনিময় ও পুরস্কার পেতে চায়, সে যেন শরীয়াহ্ অনুযায়ী আ’মল করে এবং শিরককে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। এ দু’টো রক্ন ছাড়া কোন আ’মলই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আ’মালে আন্তরিকতা থাকতে হবে’।

অঙ্ক অনুসরণ

আল্লাহ্‌র ইবাদাহ্‌য় কুর’আন সুন্নাহ্‌র নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য কাউকে অঙ্ক অনুকরণ-অনুসরণ করা এক ধরনের শিরক। আদি ইব্নু হাতিম (রাঃ) বলেন, তিনি

৮৬। সূরাহ্ আল-আন’আম (৬ : ১৬২)।

৮৬ক। অনুবাদকের সংযোজন : মোটকথা, সংক্ষেপে, পরকালে দোযখাগ্নির ভয় এবং অকুরান নিয়ামাত (‘জান্নাত ও আল্লাহ্‌র দর্শন’) প্রাপ্তির আশায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী আত্মজীবন পরিচালনা করাই সত্যিকার ইবাদাহ্।

৮৭। সূরাহ্ আল-কাহফ (১৮ : ১১০)।

রাসূলুল্লাহ(সাঃ)কে কুর'আনের আয়াত “তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলিম ও ধর্ম যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও; অথচ, তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বুদের ইবাদাহু করবে, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র”^{৮৮} তিলাওয়াত করতে শুনেন। আদি (রাঃ) বলেন, আমরা (ইহুদী-খৃষ্টানরা) তো তাদের (আলিম দরবেশদের) উপাসনা করিনি।^{৮৯} রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বললেন, ‘তারা কি আল্লাহু যা হালাল করেছেন, তাকে হারাম করেনি? এবং তোমরা তা হারাম বলে মেনে নিয়েছিলে; এবং আল্লাহু যা হারাম করেছিলেন, তারা কি তা হালাল করে নি? এবং তোমরা তা হালাল বলে মেনে নিয়েছিলে।’ তিনি {আদি (রাঃ)} বললেন, ‘নিশ্চয়ই।’ আল্লাহর নাবী (সাঃ) বলেন, ‘ওটাই তোমাদের তাদেরকে উপাসনা।’^{৯০}

আলিম, ইমাম ও শাসকদের আনুগত্য তখনই করা যাবে, যখন তা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী হবে; কারণ, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “আনুগত্য শুধু ভালোর বেলায় {অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুল্লাহর ভিতর}”^{৯১} আরো বলেন, “যে আল্লাহকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করে অন্য কোন প্রভু, নেতা বা শাসকের আনুগত্য করে, সে হলো একজন অবিশ্বাসী ও মুশরিক। আল্লাহর কোন সৃষ্টির অনুসরণ করা যাবে না, যদি তা আল্লাহকে অগ্রাহ্য বা তাঁর অসন্তোষের কারণ হয়।”^{৯২} অতএব, “শুনা এবং মানা (বাধ্যতামূলক) কোন মুসলিমের পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শুন্যাহর কাজ করতে বলা না হয়। যদি, তাকে কোন পাপ কাজের কথা বলা হয়, তা’হলে কোন শুনা এবং মানা নেই।”^{৯৩}

ইবাদাহুর নিয়ম-পদ্ধতি বা ধরন

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওজিয়াহু (রঃ) তাঁর মাদারিয়ুস-সালিকিনে লিখেন, ‘উবুদিয়্যাহু (উপাসনা) হচ্ছে একটি সমন্বিত পরিভাষা, যা এই আয়াতের ঘোষণাকে বুঝায়-“আমরা কেবলমাত্র তোমারই উপাসনা (ইবাদাহু) করি এবং শুধুমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।”^{৯৪} এটি আল্লাহর প্রতি একাধারে অন্তর (ক্বালব), জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দাসত্বের সম্মিলন। অন্তরের দাসত্ব হচ্ছে ক্বাউল (অন্তরের কথা) ও আ’মাল (অন্তরের কাজ)। অন্তরের কথা হচ্ছে- এই

৮৮। সূরাহু আজ্-জাওবাহু (৯ : ৩১)।

৮৯। তিরমিযী (৩য় খন্ড, হাদীস নং-২৪৭, পৃষ্ঠা-৫৬)।

৯০। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ ৯ম খন্ড, হাদীস নং-২৫৯) ও সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং- ৪৫৬৫)।

৯১। সহীহ মুসলিম (ইমারাহু অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৪৬৯)।

৯২। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ ৯ম খন্ড, হাদীস নং ২৫৮), সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-৪৫৩৩) ও আবু দাউদ।

৯৩। সূরাহু আল-ফাতিহাহু (১ : ৫)।

বিশ্বাস, যা আল্লাহ তাঁর কিতাব (আল-কুর'আন) ও রাসূল (সাঃ)এর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে জানিয়েছেন; তা হচ্ছে- তাঁর নামাবলী ও গুণাবলী, তাঁর ক্রিয়া-কলাপ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ এবং আরো অনেক বিষয়। অন্তর (ক্বালব) এর কাজ বলতে আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁর উপর আস্থা, অনুতাপের সঙ্গে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন, তাঁকে ভয়, তাঁর কাছে আশা করা, তাঁর দ্বীনে আন্তরিক সমর্পণ, তাঁর আদেশ-নিষেধে সবুর করা, তাঁর বিধানে সবুর করা ও সন্তুষ্ট হওয়া, তাঁর আনুগত্যে বিনম্র হওয়া, তাঁর কাছে ক্ষমা ও প্রশান্তি ভিক্ষা করা, ইত্যাদি বুঝায়। জিহ্বার কাজ হচ্ছে-আল্লাহ্ যা নাযিল (অবতীর্ণ) করেছেন তাতে সাড়া দেওয়া, প্রচার করা, সমর্থন করা; এর বিপরীতে বিভ্রান্তিমূলক নতুনত্ব (বিদাহ্) কে উন্মোচিত করা এবং এর রক্ষণ-আহকাম ও যিক্র-এর বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ হচ্ছে-সালাহ্ আদায়, জিহাদ (আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ), জুম'আর সালাহ্ আদায়, অন্যান্য সালাহ্ (জমা'আতী সালাহ্), দীনে দয়া করা, সৃষ্টির সঙ্গে সহৃদয় ও মমত্বপূর্ণ আচরণ করা এবং এ ধরনের আরো বহুবিধ কর্মকাণ্ড।^{১৪} ইবাদতের প্রধান কিছু নিয়ম-পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলো।

প্রীতি-ভালোবাসা :

প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল্লাহ-প্রেম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সবচাইতে বড় ইবাদাহ্ এবং অন্তর (ক্বালব) এর কাজ। আল্লাহ্র প্রতি প্রেম-প্রীতি তেমন নয়, যা একজন তার আত্মীয় পরিজনের প্রতি করে থাকে। কিন্তু, ইসলামে প্রীতি হচ্ছে পরিপূর্ণ সমর্পণ ও আনুগত্য; যেমন-আল্লাহ্র ঘোষণা, “বলুন, [হে মুহাম্মাদ (সাঃ)] যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার আনুগত্য-অনুসরণ কর; তা'হলে, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।”^{১৫}

আল্লাহ-প্রেমে শির্ক হচ্ছে তাই, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি সমর্পণ ও আনুগত্যকে বুঝায়। আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম অগ্রাহ্য করার প্রীতিই হচ্ছে শির্ক। আল্লাহ বলেন, “আর মানবকুলের মাঝে এরূপ আছে- যারা অন্যান্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহকে যেমন ভালোবাসে, তাদের প্রতিও তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে। কিন্তু, যারা ঈমানদার, তাদের আল্লাহ-প্রেম ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।”^{১৬}

১৪। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযিয়াহ্র মাদারিজুস-সালেকীন (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০-১০৫)।

১৫। সূরাহ্ আল-ইমরান (৩ : ৩১)।

১৬। সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ (২ : ১৬৫)।

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা/ নির্ভরশীলতা) :

ইবাদাহর সঙ্গে তাওয়াক্কুল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ প্রদত্ত বাণী, “সুতরাং, তাঁরই ইবাদাহ কর এবং তাঁরই উপর নির্ভর কর।”^{৯৭} “এবং আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই; এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল।”^{৯৮} তাই, যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ সাহায্য করেন, ওসব ব্যাপারে আর কারো উপর ভরসা করা শিরক। এটি অন্তর (ক্বালব) এর অন্যান্য ইবাদাহ, যেমন-ভয়, ঐকান্তিকতা, ইত্যাদির বেলায়ও প্রযোজ্য।

যাচঞা বা প্রার্থনা :

আল্লাহ ঘোষণা দেন, “তোমাদের প্রতিপালক বলেন- “তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অবজ্ঞায় আমার ইবাদাহ থেকে বিন্মুখ, তারা অবশ্যই লাক্ষিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”^{৯৯} এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘যাচঞা হচ্ছে (দু’আ বা প্রার্থনা) ইবাদাহ।’^{১০০} কাজেই, যাচঞা বা চাওয়া হচ্ছে ইবাদাহ, যেমনটি আল্লাহ তাঁর বাণীতে বলেছেন এবং রাসুল (সাঃ) তাঁর হাদীসে ব্যাখ্যা করেছেন। ইব্নু আব্বাস (রাঃ) এর রিওয়াইতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘যদি কিছু চাও, আল্লাহর নিকট চাও; যদি সাহায্য চাও, তাহলে আল্লাহর কাছে চাও’^{১০১} তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন, ‘যে অন্যের কাছে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে সম্ভ্রষ্ট করেন; এবং যে স্বনির্ভর হতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করেন.....’^{১০২}

এই হুকুমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঐ সব বিষয়ে -যেগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কারো সংস্থানের ক্ষমতা নেই। যেমন-আহার, বাসস্থান, সাহায্য,

৯৭। সূরাহ হুদ (১১ : ১২৩)।

৯৮। সূরাহ আল-ফুরকান (২৫ : ৫৮)।

৯৯। সূরাহ আল-পাকির/মুমিন (৪০ : ৬০)।

১০০। সুন্নান-ই-আবু দাউদ (হাদীস নং-১৪৭৪) ও আত্-তিরমিযী।

১০১। মুসনাদ-ই-আহমাদ (১ম খণ্ড, হাদীস নং-২৯৩, হাসান) আত্-তিরমিযী (হাদীস নং-২৫১৬)।

১০২। সহীহ বুখারী (৩য় খণ্ড, হাদীস নং-২৬৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং-১০৫৩), আবু দাউদ (হাদীস নং-১৬৪৪) ও আত্-তিরমিযী (হাদীস নং- ২০২৫)।

রোগমুক্তি, পথনির্দেশ (হিদায়াহ), সন্তান, ইত্যাদি। যাহোক, এই নিষেধাজ্ঞা (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা) অন্য মুসলমান ভাইদের কাছে সাহায্য (যে ব্যাপারে প্রয়োজ্য) চাওয়ার বেলায় প্রযোজ্য নয়। যেহেতু, আল্লাহ্ বলেন, “নেক কাজ করতে ও সংযমী (আল্লাহ্ ভীরু) হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর।”^{১০৩}

৩। তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (আল্লাহুর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস) :

আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, “সকল সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞাত।”^{১০৪}

আবু হুরায়রাহু (রাঃ) রিওয়াইত করেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহুর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি ওগুলো গননা করবে ও স্মরণ রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে..’^{১০৫}

তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত^{১০৬} হচ্ছে, দৃঢ়ভাবে কুর’আন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহুর নাম ও গুণাবলীসমূহ বিশ্বাস করা ও সম্মত রাখা সুদৃঢ়ভাবে। আল্লাহুর নাম ও গুণাবলীসমূহ অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃতভাবে (শাদ্বিক ও আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে) গ্রহণ করা ও স্বীকৃতি দেয়া। মানবীয় কমতি বা অসম্পূর্ণতা থেকে মনকে পুরোপুরি মুক্ত করে ওগুলোকে অর্থের দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হবে। যেহেতু, মানবকুল ও আল্লাহুর গুণের সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য শুধু নামের, পরিমাপের বা তারতম্যের নয় কিছুতেই। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্ বলেন, “এবং মুনাফিক পুরুষ ও নারী, মুশরিক পুরুষ ও নারী, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তাদের চারিদিকে অমঙ্গলচক্র; আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন, আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, যা অতি নিকৃষ্ট আবাস।”^{১০৭} এই আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর ‘রুষ্ট’তার সিফাত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহুর ‘রুষ্টতা’ বা ‘ক্রোধ’কে মানবীয় ক্রোধের সঙ্গে

১০৩। সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্ (৫ : ২)।

১০৪। সূরাহ্ আল-হাশর (৫৯ : ২৪)।

১০৫। সহীহ বুখারী (৮ম খন্ড, হাদীস নং-৪১৯) ও সহীহ মুসলিম।

১০৬। শাইখ আল-ইসলাম ইবন তায়মিয়াহ্ (মৃত্যু-৭২৮ হিঃ) বলেন, আল্লাহ্তে ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁর বাণীতে (কুর’আনে) ও রাসূল (সাঃ)এর হাদীসে তিনি (আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়াতা’আলা) যেভাবে বর্ণিত হয়েছেন সেভাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনা- তাহরীফ (বিকৃত করা অর্থে/ব্যাখ্যায় বা উভয়ে), তা’য়াতীল (বিনষ্ট বা বিনষ্ট করা), এক তাক’যীফ (তুলনা করা) ও তামসীল (সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য) ব্যতীত। (আল-আব্বীদাহ্ আল-ওয়াজিয়াহ্, পৃষ্ঠা-৩)।

১০৭। সূরাহ্ আল-ফাভ্হ (৪৮ : ৬)।

এক মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এই আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করে এরকম বলাও ভুল যে, “তঁার রুষ্টতা অবশ্যই তঁার শক্তিকে বুঝায়, কারণ রুষ্টতা বা ক্রোধ হচ্ছে এক ধরনের দুর্বলতার লক্ষণ, এবং দুর্বলতা আল্লাহ্র গুণ বা সিফাত হতে পারে না, ইত্যাদি....।” “কোন কিছুই তঁার সদৃশ্য নয়-”^{১০৮} এই বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্র নাম- গুণে পরিপূর্ণ আল্লা স্বাপন করা যথেষ্ট। আল্লাহ্র নামাবলী ও গুণাবলী তঁার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকে সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হতে হবে। তাদের দৃশ্যমান অর্থে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক; কিন্তু, আল্লাহকে গভীরভাবে অভিব্যক্ত, প্রতিবিম্বিত, অনুধাবন বা প্রতিফলিত করা বিদ’আহ; কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘সৃষ্টিকে গভীরভাবে অনুধাবন বা প্রতিবিম্বিত কর, কিন্তু, আল্লাহকে নয়।’^{১০৯}

‘তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত’ এর বিরুদ্ধে জঘন্য শিরক :

আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার নামই তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতে শিরক। দৃষ্টান্ত সরূপ- আল্লাহ্র অনেক গুণাবলীর মধ্যে অদৃশ্য (গা’য়িব)^{১১০} জানাও একটি, এবং কেবল মাত্র তিনিই জানেন, অন্তর যা গোপন করে। আল্লাহ্র বানী- “বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউই অদৃশ্য (গা’য়িব) এর জ্ঞান রাখে না, এবং তারা জানে না, কখন তারা পুনরুদ্ভূত হবে।”^{১১১}

তাই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভূত, ভবিষ্যৎ বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখার ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শিরক (আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করা)। তাওহীদের এই চেতনা ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম থেকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য-মন্ডিত করে। যারা তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন তারা জেনেছেন যে, ইহুদীগণ ‘সৃষ্টিকে সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন’^{১১২}, আর নাসারাগণ ‘সৃষ্টিকে প্রত্যয় পরিণত’ করেছেন।^{১১৩, ১১৪ ক।}

১০৮। সূরাহ আশ-শুরাহ (৪২ : ১১)।

১০৯। শাইখ আলবানীর সিলসিলাহু আস-সহীহা (হাদীস নং-১৭৮৮)।

১১০। মানুষের কাছে যা কিছু ভূত, ভবিষ্যৎ বা অদৃশ্য-তা সবকিছুই আল্লাহ্র একান্ত জ্ঞান পরিবৃত্ত।

১১১। সূরাহ আন-না’মল (২৭ : ৬৫)।

১১২। জেনেসিস (৩৩ : ২৪-৩০) এ বর্ণিতঃ যথায় দাবী করা হয় যে, আল্লাহ একজন মানুষের রূপে এসে মল্লযুদ্ধে ইয়াকুব (আঃ) এর সাথে হেরে যান (নাউয়ুবিল্লাহ...)। সর্বোপরি, তারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে।

১১৩। তাদের দাবীর মধ্যে ছিল যে, নাবী ঈসা (আঃ), যিনি মানুষের মত জীবন যাপন করে অসহায়ের মত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং আল্লাহ (নাউয়ুবিল্লাহ...)। সর্বোপরি, তারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করে।

১১৩ক। অনুবাদকের সংযোজন : শাইখ মুহাঃ আলী আল-রিফাই তাওহীদের শ্রেণীভেদে উল্লেখিতগুলো ছাড়াও নিম্নোক্তটি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন (যা তাওহীদ আর-রুহবিরাহ্র অন্তর্গতঃ)

তাওহীদ আল-হাকিমিয়াহ: আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা, এবং এই বিশ্ব জগতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আইন প্রণয়নের অধিকার রাখেন না। অন্য কথায়, ব্যক্তি জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী একমাত্র কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হতে হবে। যদি আমরা মনে করি যে, আল্লাহর আইন (শরীয়াহ), যা রাসুল (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সেকেলে, অপ্রয়োজনীয়, নিকৃষ্ট; এবং আল্লাহর আইন (শরীয়াহ) এর তুলনায় ব্রিটিশ বা আমেরিকান আইন বা অন্য যে কোন মতাদর্শ বা জীবন ব্যবস্থা, যেমন- গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ইত্যাদি, এগুলির যে কোনটি যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়; তাহলে, এই ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ঘোষণা কার্যকর হবে না। এই ধারণাই কুফরী এবং “তাওহীদ আল-হাকিমিয়াহ”র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

দেখুন “তাওহদ” পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪ (জনাব আবু মুসয়াব সংকলিত ও সম্পাদিত, এবং সিরাতুল মুস্তাকিম পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত)।

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বেশ্বরবাদ : ‘ওয়াহদাতুল-ওজুদ’ বা ‘মোক্ষ্য’

ইসলামী চেতনায় তাওহীদ এর ব্যাখ্যার পর আমরা আসি সূফিবাদী তাওহীদ বা তাওহীদ আল-ওজুদি বা ওয়াহদাতুল-ওজুদ এ।

ওয়াহদাতুল-ওজুদ এমন একটি ধারণায় বিশ্বাসী চেতনা, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই; এবং সৃষ্টি কেবলই আল্লাহর প্রকাশ বা রূপ (নাউযবিলাহ....)। এটি বুঝায় যে, সৃষ্টিই আল্লাহ্, এবং সৃষ্টির বাইরে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই। বহু প্রখ্যাত দেওবন্দি বৃজুর্গগণের আধ্যাত্মিক গুরু, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী একটি পুস্তি কায় (একই নামে) বীজ ও গাছের দৃষ্টান্ত দিয়ে ওয়াহদাতুল-ওজুদ কে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, বীজ হচ্ছে আল্লাহ; এবং সৃষ্টি হচ্ছে কান্ড, মূল, শাখা, পত্রসহ বৃক্ষ। শুরুতে শুধু বীজই বর্তমান ছিলো এবং আস্ত প্রকান্ড বৃক্ষটি ছোট্ট বীজে গুপ্ত বা লুক্কায়িত ছিলো। যখন চারাগাছটি মহীরুহে পরিণত হলো, তখন বীজ অন্তর্ধান হয়ে গেলো। বীজ এখন বিশাল বৃক্ষে বিকশিত এবং এর বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

সূফিগণ ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর উপলব্ধিকে বিরাট বৃজুর্গীর বিষয় বলে বিবেচনা করেন। তাদের মতে, তাওহীদ (আভিধানিক অর্থ-‘এক’) হচ্ছে-আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুর অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অস্বীকার। দেওবন্দিগণ ইরশাদুল মূলক এবং ইখমা’য়লুশ শিয়াম পুস্তকে বলেন, ‘তাওহীদের মূল হচ্ছে- অস্থিত্বহীন ও ক্ষণস্থায়ী জিনিষ এবং চিরস্থায়ী জিনিষের প্রমাণ বা অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।’^{১১৪} ‘ঐশ্বরিক বা দৈব অস্তিত্বগুণ (ওজুদ) অনুযায়ী কোন কিছুর সত্যিকার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা শিরক।’^{১১৫}

সূফিগণ এ ধরনের তাওহীদকে অভিজাত বা সূধী আধ্যাত্মিকগণের উপযোগী বলে বিবেচনা করেন এবং দাবী করেন যে, শুধু তাদেরই উপলব্ধিতে ওয়াহদাতুল-ওজুদ আসে, যারা একটি স্তরে পৌঁছায় অত্যধিক মর্মপীড়া (স্বেচ্ছা-অনুশোচনা) ও যিক্র দ্বারা। কিন্তু, বাস্তবে ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর ভিত্তি হচ্ছে-

- আল্লাহ্ প্রেম ও ভীতির সঠিক দিক নির্দেশনা লাভে অঙ্গতা।
- ভিত্তিহীন নীতি-আদর্শের উপর অতিরঞ্জিত ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাস।
- কুর’আন ও সুন্নাহ-ভিত্তিক আক্বীদাহ্ অর্জনে একান্ত অনীহা ও অবহেলা।

১১৪। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৫২।

১১৫। ইখমা’য়লুশ শিয়াম (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২১৯।

ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর স্তর বা ধাপসমূহ

সূফিগণ আল্লাহ-ভীতির চেতনাকে তাঁদের পরিবৃত্তে সাংঘাতিক অতিরঞ্জন করেন; ফলশ্রুতিতে, তাঁরা সার্বক্ষণিক মাত্রাতিরিক্ত মানবিক উৎকণ্ঠায় থাকেন। তাঁরা তাঁদের ভীতিকে সুন্নাহ বহির্ভূত পন্থায় প্রকাশ করেন, যেমনটি ফাজায়েল-ই-আ'মল এ বর্ণিত লোকের কাহিনীর মত- যিনি তাঁর চেহারা কখনই আকাশের দিকে উত্থিত করতেন না; যখন জিজ্ঞাসিত হলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমি লজ্জিত! আমি কি করে এই পাপমুখ এত বড় মহান দাতা, পরোপকারীর সামনে তুলি?'^{১১৬}

এই মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রভাবে যখন তারা কুর'আন বা গীত-বাজনা বা পাখীর কলতান শুনেন, তখন তারা পরমানন্দ (আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের অনুভূতি) লাভের স্তরে পৌঁছায় বা মূর্ছা যায় অথবা মৃত্যুবরণ করে।

১। এক সন্ত (সাধু) বর্ণনা করেন, "আমি একদা তাওয়াফের সময় হযরত শাইখ সামনুনকে পরমানন্দে এক দিক থেকে আর এক দিকে আন্দোলিত হতে দেখলাম। আমি তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'যে সত্যের জোরে আপনি একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন, আপনাকে প্রশ্ন করি, 'আপনি কি করে আল্লাহর কাছে পৌঁছলেন?' যেই মাত্র তিনি- 'আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন'- কথাগুলি শুনলেন, অমনি মূর্ছা গেলেন'^{১১৭}

২। ইরশাদুল মূলক-এ উল্লেখিত আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় যে, 'হযরত হাফিয (যা'মিন) সাহেবের প্রিয় ছিলো ঘুঘু। একদা যখন তিনি পাখীগুলোকে খাওয়ানোর জন্য খাঁচার কাছে গেলেন, তখন একটি ঘুঘু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে এমন এক রম্য গীত গেয়ে উঠলো যে, তাতে তিনি পরমানন্দে মূর্ছা গেলেন।'^{১১৮}

যারা বোধগম্যতার সাথে কুর'আন শুনে, তাদের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে। কুর'আন শুনায় অন্তরে আল্লাহ ভীতি জন্মায়, ঈমান বৃদ্ধি পায়, চিন্তা বিনম্র হয় এবং চোখ হতে অশ্রু ঝরে।'^{১১৯} কিন্তু, স্বরোপিত অত্যধিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দরুন মূর্ছা যাওয়া বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, কুর'আন ও সুন্নাহ বোধগম্যতার জন্য বা কোন সত্যিকার ভীতির কারণে নয়। এবং এমনটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর কোন সাহাবী থেকে কখনও শোনা যায়নি।^{১২০}

১১৬। ফাজায়েল-ই-আ'মল (হিন্দি অনুবাদ, ফাজায়েল-ই-হাজ্জ, পৃষ্ঠা-২৫৬, কাহিনী নং-৩, ১ম সংস্করণ : ১৯৮৪ খৃঃ, ইদারা ইশাত-ই-দীনিয়াত কর্তৃক প্রকাশিত। ফাজায়েল-ই-আ'মল (ইংরেজী অনুবাদ, ফাজায়েল-ই-হাজ্জ, উপসংহার, পৃষ্ঠা-২৩৩, কাহিনী নং-৩, নতুন সংস্করণঃ ১৯৮৪ খৃঃ, ইদারা ইশাত-ই-দীনিয়াত কর্তৃক প্রকাশিত)।

১১৭। ফাজায়েল-ই-সাদাকাহ ও ফাজায়েল-ই-হাজ্জ/ফাজায়েল-ই-আ'মল (ইংরেজী অনুবাদ, কাহিনী নং-৪০ পৃষ্ঠা-২৭০, নতুন সংস্করণ : ১৯৮২ খৃঃ দ্বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

১১৮। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা-১২২)।

১১৯। দেখুন সূরাহ আল-আনফাল (৮ : ২), আয-যুমার (৩৯ : ২৩) ও মারইয়াম (১৯ : ৫৮)।

১২০। আরো জানার জন্য পড়ুন The Dispraise of Al-Hawaa, by Dr. Saleh as-Saleh, Page: 74-75।

ফাজায়েল-ই-আ'মাল-এ বর্ণিত নিম্নের ঘটনাটি আল্লাহ-প্রেম ও ভীতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অত্যধিক উদ্বেগাকুল হওয়ার আরেকটি উত্তম দৃষ্টান্ত। বলা হয়ে থাকে যে, মালিক ইব্নু দীনার হাজ্জে যাওয়ার সময় এক যুবা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, যিনি ছিলেন পদব্রজে এবং রসদ-পানীয় ছাড়া। মালিক ইব্নু দীনার তাকে (যুবাকে) তার জামাটি দিতে চাইলে তিনি প্রত্যাখান করে বলেন, 'জাগতিক জামা পড়ার চেয়ে উনুজ (উলঙ্গ) থাকা শ্রেয়ঃ'। পরে যখন হাজীগণ ইহ্রাম বেঁধে তালবীয়া পাঠ শুরু করলেন, তখন এই তরুণ এই বলে চূপ থাকলেন যে, "আমি আতংকিত যে, 'লাক্বায়িক' ধ্বনির সাথে 'লা লাক্বায়িক, লা সাদাইক' ('তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি'-এর জবাবে -'তোমার উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং তোমাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করা হবে না') এই প্রতিধ্বনি (জওয়াব) শোনা যেতে পারে"। যুবা লোকটি স্পষ্টতঃ শরীয়াহর বিরুদ্ধ কাজকে এই বলে ন্যায্যতা প্রদানের চেষ্টা করছিলো যে, 'তঁার প্রতি আমার এই প্রীতি-ভালোবাসার জন্য দোষারোপ করো না, কারণ, আমি যা দেখি তা যদি তোমরা জানতে, তা'হলে নিশ্চয়ই তোমরা কোন কিছু বলতেনা।' পরবর্তীতে যখন হাজীগণ দুম্বা-মেষ কোরবানী করছিলেন, তখন এই তরুণ লোক আল্লাহকে তার নিজ জীবন কোরবানী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বলে, এবং এর কিছু পরেই তার দেহান্তর ঘটে। এই কাহিনী এটাও দাবী করে যে, একটি গায়েবী আওয়াজ বলে, 'এই হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু এবং আল্লাহর শহীদ।' পরবর্তীতে সেই রাতে স্বপ্নে মালিক ইব্নু দীনার তরুণ লোকটিকে প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন?' সে বললো, 'আমি বদরের শহীদদের মত পুরস্কার পেয়েছি- এমন কি এর চেয়েও বেশী ... কারণ, তাঁরা জীবন দিয়েছেন কাফিরদের তরবারীর আঘাতে, আর আমার প্রাণাতিপাত ঘটেছে আল্লাহর ভালোবাসার তরবারীর আঘাতে।' ^{১১১}

এই কাহিনীতে আমরা তরুণ লোকটির সাংঘাতিক অজ্ঞতার ব্যাপার দেখতে পাই। তার নির্ধারিত পন্থায় ধর্মীয় আচার পালনের মাধ্যমে সত্যিকার আল্লাহ-প্রেমের প্রকাশ ঘটেনি। তার ক্রিয়া-কলাপ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, সত্যিকার আল্লাহ-ভীতি তার মধ্যে ছিলোনা। কারণ, আল্লাহ-ভীতি খোলামেলা গুনাহ করা থেকে বিরত রাখে। বরং, সে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগে ফেলে এই বলে আল্লাহর রাহমাতের প্রতি নিরাশা পোষণ করলো যে, আল্লাহ তার তালবীয়ার ডাক প্রত্যাখ্যান করবেন। এই কাহিনীতে তরুণ লোকটির মৃত্যুর ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। ফাজায়েল-ই-আ'মাল সহ সুফিগণের পুস্তকে এ ধরনের অসংখ্য কাহিনী বা দাবীতে ভরপুর।

১১১। দেখুন ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল-ই-সাদকাত ও ফাজায়েল-ই-হাজ্জ, কাহিনী নং- ৪, পৃষ্ঠা-২৩৪, নতুন সংস্করণ : ১৯৮২ খৃঃ বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

নিজেকে কুকুর ও শুকরের স্তরে অধঃপতিত করা

অতিরঞ্জন ও বিদ'আহপূর্ণ আল্লাহ-প্রীতি ও ভীতিতে ভর করে সুফিগণ নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদাকে আল্লাহর কাছে হেয় ভাবতে শুরু করে, এবং নিজেদেরকে তাঁর সামনে অত্যন্ত নগন্য বলে প্রতিভাত করার চেষ্টা করে। বিনয় ও বিনম্রতার আরেক ধাপ অতিরঞ্জন ঘটিয়ে তারা ভাবলো, সত্যিকার রিয়ামুক্ত হতে হলে, তাদেরকে অধঃপতিত হতে হবে। নিম্নে এর কতগুলো দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে-

- ১। মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন যে, 'সুফিদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নিজেদের অত্যন্ত দীন-হীন মনে করা'। মাওলানা যাকারিয়াহ্‌র মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা-২৫৫) পুস্তকে এটি রাশীদ আহমাদ গান্ধোহীর উদ্ধৃতি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।
- ২। মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন, "হযরত শাহ্ ইসহাক মুহাজিরি মাক্কী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরি মাক্কীকে উপদেশ দিয়ে বলেন,- 'সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সব চেয়ে দীন-হীন (নিকৃষ্ট) ভেবো'"।^{১২২}
- ৩। এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তিরিশ বছর ধরে (সারা বছর) দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতভর ছালাহ্ আদায় করতেন। তিনি আবু ইয়াজিদ আল-বাস্তামী (আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ একজন) এর আসরের একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন। তথাপি, আবু ইয়াজিদ যে ইল্মের অধিকারী ছিলেন, তার খোঁজ তিনি করতে পারেননি। তখন, আবু ইয়াজিদ তাকে বুঝালেন যে, সে যদি একাধারে তিন'শ বছর রোযা রাখে ও রাতভর ছালাহ্ আদায় করে তবুও ঐ ইল্ম (জ্ঞান) এর পিপিলিকা ওজনসম ইল্ম (জ্ঞান) অর্জন করতে পারবে না। উপশম বা সাধন পদ্ধতির কথা জিজ্ঞেস করা হলে আবু ইয়াজিদ তাকে বলেন যে, 'সে যেন চুল-দাঁড়ি কামিয়ে কাঁধে ব্যাগ ভর্তি বাদাম নিয়ে হাট-বাজারে যেয়ে শিশু-বাচ্চাদের জড়ো করে বলে, 'যে আমাকে একটা চড় মারবে, তাকে আমি একটা বাদাম দেবো'।'^{১২৩}
- ৪। শাহ্ আবু সাঈদ নাওমানী বালখে তার শাইখের কাছে গেলেন সুফিবাদের দীক্ষা নিতে। তার শাইখ তাকে শৌচাগার তত্ত্বাবধান (পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন) এর দায়িত্ব দিয়ে তার প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তাকে স্বল্প খাবার দেয়া হতো, কিন্তু শাইখের সাথে দেখা করতে দেয়া হতো না; এবং তার জন্য কোন যিক্রও নির্ধারিত ছিলো না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর শাইখ একজন পরিচ্ছন্নকর্মীকে আবু সাঈদের গায়ে এক বুড়ি ময়লা ফেলার হুকুম দিলেন। পরিচ্ছন্নকর্মীকে যা বলা

১২২। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২২৫।

১২৩। ক্বাত আল-ক্বুব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭০।

হলো, তাই করলো। এতে আবু সাঈদ সংস্কৃত হলো এবং পরিচ্ছন্নকর্মীকে সে ধমক দিলো। এর অর্থ দাঁড়ালো, সে সূফিবাদে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করেনি। কিছুদিন পর, শাইখ্ পরিচ্ছন্নকর্মীকে আবার আগের মতো করতে বললেন। এবার আবু সাঈদ রাগান্বিত হলো; কিন্তু, কিছু বললো না। এবারও তা'হলে, আবু সাঈদ যোগ্যতা অর্জন করেনি। কিছুদিন পর, শাইখ্ আবারো আবু সাঈদের গায়ে ময়লা ফেলতে বললেন। এবার তার নাফস ছিলো বিনম্র এবং সম্পূর্ণ বাধ্যগত। সে মাটিতে পরে যাওয়া ধূলি-ময়লাগুলো উঠিয়ে নিজের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো। শাইখ্ সাহেব একথা শুনে বললেন, 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্', প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত হলো।^{১২৪}

আরো এক ধাপ এগিয়ে সূফিগণ নিজেদেরকে কুকুর বলে সাব্যস্ত করা শুরু করলো এই ভেবে যে, কুকুরকে সাধারণতঃ হয় বিবেচনা করা হয়। আল-কুর'আন বলে, "তার উদাহরণ একটি কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি ভুমি কষ্ট দাও, তবে, জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই দৃষ্টান্ত হলো সেই সম্প্রদায়ের।"^{১২৫}

● ফাজায়েল-ই-আ'মাল-এ বিধৃত হয়েছে যে, দারুল-উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানোতভী এক কবিতায় বলেন, "অজস্র পাপের কারণে কুকুররাও আমার নামে খিস্তি-খেউর করে, কিন্তু, আমি তোমার (সাঃ) নাম ও সম্পর্কের কারণে গর্বিত, এবং আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে, মাদীনার (পথের) কুকুরদের নামের সাথে আমার নাম যেন অন্তর্ভুক্ত হয়,..... আমি যেন তোমার হারামের কুকুরদের সাথে বাস করতে পারি, এবং আমি যখন মৃত্যু বরণ করি, তখন আমার শবদেহ যেন মাদীনার শকুনরা খায়।"^{১২৬}

● একটি চিঠিতে এক ব্যক্তিকে মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন, যখন সে নাবী (সাঃ)এর রাওজা মুবারকে যায়, তখন সে যেন বলে, 'এক ভারতীয় কৃষ্ণ কুকুর (মাওলানা যাকারিয়াহ্ কান্ধলভী) ও তার সালাম জানায়।'^{১২৭}

● মাওলানা ইলিয়াস তাঁর চিঠিতে নিজেকে নাবী (সাঃ)এর নগরীর কুকুর পরিচয় দিয়ে সই (দস্তখত) করেন।^{১২৮}

১২৪। মাশা-ইখ্‌ই চিশত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৯২।

১২৫। সূরাহ্ আল-আ'রাফ (৭ঃ ১৭৬)।

১২৬। ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ) ফাজায়েল-ই-দরদ, পৃষ্ঠা-১৬৪, উপাখ্যান নং-৪৬, ১৯৮৫ খৃঃ, দ্বিনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

১২৭। সাবানেহ্ মুহাম্মাদ ইউসুফ, পৃষ্ঠা-১৩২ (ভারত-মক্কা তালিফাহ্ আশরাফিয়াহ্, ১৩০৪ হিজরী)।

১২৮। মাক্‌তিব হাযরাত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ ইলিয়াস (মাওলানা সৈয়দ আবুল-হাসান আলী নদভী কর্তৃক সংকলিত-ইদারা ইশা'ত আল-দীনিয়াত, নিজামুদ্দিন, নয়াদিল্লী-পৃষ্ঠা-৫৪)।

সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব অস্বীকার

অবশেষে, সূফিগণ নিজেদের, তথা-সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তারা দাবী করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। বিভ্রান্তির শীর্ষে পৌঁছে সূফিগণ একেবারে সাংঘাতিক বিপরীতমুখিতার আশ্রয় নেন। তারা ব্যাখ্যা করেন যে, সৃষ্টির অস্তিত্ব তাওহীদাল-ওজুদীকে অস্বীকার করে না; কারণ, সৃষ্টিতেই আল্লাহ্ প্রকাশিত। সৃষ্টি আল্লাহ্র নিজেরই অংশ, এবং আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির বাইরে অস্তিত্ববান বা বিরাজিত নন-হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী বীজ ও বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়ে এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

যে সকল লোক নিজেদেরকে মানুষ বলে দাবী করার যোগ্যতা আছে বলে মনে করতো না, এখন তারাই আবার নিজেদেরকে আল্লাহ্ বলে মনে করে, এবং আল্লাহ্কে কুকুর, শুকরের মত জঘন্য প্রাণীতে অস্তিত্ববান ভাবে! (নাউয়িবিল্লাহ)।^{১২৯} মানসুর আল-হান্নাজ এর মতো সূফি নিজেকে “আনা আল-হাক্ক (আমিই ধ্রুব বা সত্য, অর্থাৎ, আল্লাহ্)”, এবং আরেক সূফি, আবু ইয়াজীদ আল-বাস্তামী নিজেকে “সুবহানী মা’-আযাম-শা’নী” (সমস্ত অপূর্ণতা থেকে আমি বহু দূরে, আমার অবস্থা কত মহান!) বলে দাবী করেন। এ রকম সিফাতের দাবী শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাছ ওয়া তা’য়ালার বেলায়ই প্রযোজ্য, অন্যথায় তা শিরক।

দেওবন্দিগণের নানা পুস্তকের দৃষ্টান্ত ও উদ্ধৃতির আলোকে আমরা উপরোক্ত আলোচনায় ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর নানা ধাপ ও ধাঁচ দেখলাম। তাদের স্ব-আরোপিত মাত্রাতিরিক্ত উদ্বিগ্নের কারণে নিজেদেরকে কুকুর ও শুকরের মত ঘৃণিত স্বভাব্য অস্তিত্ববান মনে করেন। আরেক ধাপ অতিরঞ্জন, সৃষ্টির অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করে; এবং পরিশেষে বলে, ‘স্রষ্টা ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই’। ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও পরিষ্কার খন্ডন হচ্ছে- কুর’আন ও সুন্নাহ্য় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে অভ্রান্তভাবে পার্থক্য প্রদর্শন। “আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক/অভিভাবক/ভরসাস্থল।”^{১৩০} আমরা হচ্ছি, সৃষ্টি এবং আল্লাহ্ সুবহানাছ ওয়া তা’য়াল। আমাদের স্রষ্টা। তিনি সেই স্বভা, যার হাতে আমাদের সকল ক্রিয়া-কর্ম ন্যাস্ত; এবং তিনিই সেই স্বভা, যিনি নিরঙ্কুশভাবে উপাসনা (ইবাদাহ্) র যোগ্য। তাঁর সিফাত (গুণ) কে আমাদের সঙ্গে কোন ভাবেই তুলনা করা যাবে না। তাঁর স্বভা একেবারে সম্পূর্ণভাবে আমাদের বোধগম্য ও ধারণার বাইরে।

সূফিগণ প্রগল্ভতায় নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুবর্তী বা গোলাম হয়ে কুর’আন ও সুন্নাহ্কে ভীষণ ভুল বুঝে তাঁদের থেকে বহু দূরে সরে যান। ফলশ্রুতিতে, তাঁদের মাঝে এই কুধারণা (ওয়াহদাতুল-ওজুদ) এর জন্ম নেয়।

১২৯। দেখুন আল-কাশফ আনিল-হাক্কীকাত আস্-সূফিয়াহ্, পৃষ্ঠা-১৬২।

১৩০। সূরাহ্ আয-যুমার (৩৯ : ৬২)।

ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ

ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ এর মত চরম মতবাদ/ধারণা পরিত্যক্ত হয়ে পরবর্তীতে নবোদ্ভাবিত ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ ধারণার প্রবর্তন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রভাবশালী দেওবন্দিগোষ্ঠী মাজলিস উলেমা ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ-এ বিশ্বাসীদের অনেক উচ্চমার্গের ওলী হিসেবে বর্ণনা করেন, যাদের আত্মা স্বর্গীয় উপলব্ধিতে এক সুউচ্চ অবস্থায় সমাসীন থাকে।^{১০১} ইরশাদুল মূলকের উদ্ধৃতি, ‘সূফিগণের নিকট তাওহীদ মানে হচ্ছে- তাওহীদ কালীন সময়ে সকল তাওহীদ পরিত্যাগ; কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলে তা তাস্বীহ (সমকক্ষতা)র পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।’^{১০২}

এই মতবাদ সৃষ্টির অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়; কিন্তু, সূফিগণের আল্লাহ্‌তে পূর্ণ মনসংযোগের কারণে সৃষ্টি তাঁর কাছে বিস্মৃত থাকে। এই ধারণা তাঁদের পূর্বোক্ত সূফিগণ ও তাঁদের নিজলা কুফর উক্তি থেকে রেহাইয়ের একটি ওজর। অন্যথায়, ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ এর মত এই ধারণা বা মতবাদও একেবারে ভিত্তিহীন। আল্লাহুর সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম ইবাদাহকারী রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ বা ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ এর অভিজ্ঞতার একেবারে কোনই নজীর নেই।

সূফিগণের দৃষ্টিভ্রম (Hallucination) ও কল্পলোকে বসবাস হয় তাঁদের শরীরের প্রতি অত্যাধিক অনাচারের জন্য; যা ঘটে, তা বেশরা (শরীয়াহ বিরুদ্ধ) উপবাস, উদ্বিগ্ন, নির্জন তেপান্তরে পরিভ্রমণ, ইত্যাদি কারণে। আর, এ সবই হয় জরা-ব্যধিগ্রস্ত দুর্বলচিত্তে শয়তানের ওয়াস্-ওয়াসার জন্য।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমানতার ধারণা

একটি খুব সম্পৃক্ত ধারণা আম-জনগণের মধ্যে বিস্তৃত যে, আল্লাহ্‌ আছেন সর্বত্রই। মানুষ সত্যাসত্যের ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এই ধারণায় আস্থাবান। ‘আল্লাহ্‌ নিজে সর্বত্রই বিরাজিত (যাত)’ এই কথা কুর’আন ও সুন্নাহুর আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কুর’আনে সাত জায়গায়^{১০৩} বর্ণিত হয়েছে যে, “তিনি {আল্লাহ্‌, যিনি নিজেকে আল-আলা (সর্বোচ্চ) বলেছেন}; তাঁর আরশের উপর বিরাজমান আছেন”।

১০১। মাশা ইখ-ই-চিশত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৯২।

১০২। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৫৫।

১০৩। কুর’আনের যে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে তা হলো- (১) সূরাহ আল-আরাফ (৭ : ৫৪), (২) সূরাহ ইউনুস (১০ : ৩), (৩) সূরাহ আরা-রাদ (১৩ : ২), (৪) সূরাহ জুহা (২০ : ৫), (৫) সূরাহ আল-ফুরকান (২৫ : ৫৯), (৬) সূরাহ আস-সাজদা (৩২ : ৪), (৭) সূরাহ আল-হাদীদ (৫৭ : ৪)।

তিনি সৃষ্টির মাঝে বা ভিতরে নেই। তবুও তিনি সর্বদ্রষ্টা (আল-বাসির), সর্বশ্রোতা (আস-সামী) এবং সর্বজ্ঞাতা (যা অন্তর গোপন করে তাও)। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমানতার ধারণা পূর্বযুগীয় সালফ-সালেহীন, এমনকি পরবর্তী ইমামদের মধ্যেও ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইবনু আবিল-ইজ্জ আল-হানাতী আল-আক্বীদাহ্ আত-ত্বাহবীয়াহ ২৮৮ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যায় ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) এর বিশ্বাস (ধারণা) প্রসঙ্গে বর্ণনা দেন। মু'ত্তী আল-বালখী ব্যক্ত করেন, তিনি একটি শোকের প্রশ্ন- 'তার প্রভু (রাব্ব) এর স্বর্গে (আসমান) না মর্তে (এই পৃথিবীতে) অবস্থান, তা ও সে জানে না', এর উত্তর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর নিকট জানতে চান। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) জবাব দেন, 'সে অবিশ্বাস করেছে। কারণ, আল্লাহ বলেন, "পরম দয়াময় আরশে অবস্থানরত"^{১০৪} এবং তাঁর আরশ সাত আসমানের উপর।' আল-বালখী তখন জিজ্ঞেস করেন, 'কি হতো যদি সে বলতো-আল্লাহ আরশের উপর, কিন্তু আরশ স্বর্গে না মর্তে তা সে জানে না?' ইমাম আযম জবাব দেন, 'সে অবিশ্বাস করেছে। কারণ, আল্লাহ সগুর্ষিমন্ডলের উপর অবস্থানরত, এটা সে অস্বীকার করেছে, এবং এর অস্বীকারকারীই অবিশ্বাসী (কাফির)'।

হানাতী ইমাম ও আলীমগণের একটা বিরাট সংখ্যা কিভাবে আক্বীদাহ্য় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করেছেন বিভ্রান্ত সুফি ধ্যান-ধারণা থেকে, এটি তারই একটি নমুনা। ইমাম আবু হানীফাহ্ এই ব্যাপারে 'কুফর' বা 'অবিশ্বাস' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যে আল্লাহর অবস্থানকে আরশ বা নভোমন্ডলের উপর অস্বীকার করে; যা আক্বীদাহ্য় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যারা হানাতী মাযহাবে সম্পৃক্ত, তারা হানাতী ফিকাহ্ অনুসরণ করে ইমাম আবু হানীফাহ্‌র আক্বীদাহ্ (বিশ্বাস) এর পরিবর্তে, এটি তারও একটি দৃষ্টান্ত।

আল আক্বীদাহ্ আত-ত্বাহবীয়াহ্‌র ব্যাখ্যায় ইবনু আবিল-ইজ্জ যা বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, আজকের দিনের দেওবন্দি আ'লীমগণের ধ্যান-ধারণা ইমাম আবু হানীফাহ্‌র বিশ্বাস (আক্বীদাহ্)এর পরিপন্থী।

দেওবন্দি আ'লিমগণ সর্বসম্মতভাবে ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ এর ধারণা / মতবাদকে সমর্থন করেন :

দেওবন্দিগণের পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যাচ্ছে-

১। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তাঁর পীর (আধ্যাত্মিক গুরু) সম্পর্কে বলেন, 'হাজী সাহেব (হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী) তাওহীদ'^{১০৫}দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন।' ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ-এর ক্ষেত্রে মনে হয় যেন তিনি এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। একদা তিনি সূরাহ্ ত্বাহর এই আয়াত "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া

১০৪। সূরাহ্ স্বাহ (২০ : ৫)।

১০৫। এই ধরণের তাওহীদ যা আল্লাহর সৃষ্টির অস্তিত্বকে অস্বীকারের আহ্বান জানায়।

অন্য কোন মা'রুদ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই (২০৪৮)" শোনায় তাঁর মধ্যে এক বিশেষ ভাবের উদ্বেগ হয়। তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় (তাফসীর) বলেন, 'এ আয়াতের প্রথম অংশ নিয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, যেহেতু, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই নেই, তাহলে এই হাওয়াদিস'^{১৩৬} গুলো কি? জবাব হচ্ছে (আয়াতের পরবর্তী অংশ),- 'লাহল আস্মা আল-হুসনা' অর্থাৎ, সবই হচ্ছে তাঁর (আল্লাহুর) মাযাহার (প্রকাশ)^{১৩৭}। কেউ কাব্য করে বলেছেনঃ 'বাগানে যত ফুল দেখি; তাতে না আছে তোমার রঙ্গ (রূপ), না আছে তোমার সুরভি।' হাজী সাহেব (ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী) বলেন, এই কবি হচ্ছেন যাহিরী (বাহ্যিক ব্যাপারগুলোই শুধু অবগত)। যদি তিনি একজন আ'রিফ'^{১৩৮} হতেন, তা'হলে বলতেন, 'বাগানে যত ফুল দেখি; তাতে সবই তোমার রঙ্গ (রূপ), সবই তোমার সুরভি'। যাহোক, এ ধরণের উক্তি প্রকাশ বা বর্ণনা সবার জন্য নয়।'^{১৩৯} ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী *ওয়াহদাতুল-ওজুদ*-এর উপরও একটি বই লিখেছেন।^{১৪০}

২। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী বলেন, 'তিনি (ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী) বলতেন যে, মানুষ বাহ্যতঃ কৃতদাস এবং অন্তর্গতভাবে (বাতিনীতে) হাক্ক (আল্লাহ্)' (নাউয়ুবিল্লাহ্,...)। মাওলানা খানভী আর একটু ব্যাখ্যা করেন, 'বাতিন হচ্ছে বাস্তবতা-যা মানুষে বিকশিত এবং বাতিন মানুষের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।'^{১৪১}

৩। একদা মৌলভী মুহাম্মাদ আহসান (মক্কার একজন বাসিন্দা) *ওয়াহদাতুল ওজুদ* -এর ব্যাপারে মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর কাছে সন্ধিক্ষতা প্রকাশ করেন। তিনি (মৌলভী আহসান) এই ব্যাপারটিকে ঈমানের পরিপন্থী মনে হয়, বলে মন্তব্য করেন। আশরাফ আলী খানভী বলেন, 'এ বিষয়ে আমার বয়ান শুনলে, আপনি নিজেকে নিজে বলবেন যে, এর (*ওয়াহদাতুল-ওজুদ*) প্রতি আস্থাবান বা বিশ্বাসী না হলে ঈমান পূর্ণ হতে পারে না।' অতঃপর, আশরাফ আলী খানভী কোন এক শুক্রবার সকালে দু'ঘণ্টার এক বায়ান দেন। বায়ানের পর মৌলভী আহসান না বলে পারেন না যে, (*ওয়াহদাতুল-ওজুদ*) এর প্রতি বিশ্বাস এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি ছাড়া ঈমান বুঝাই যাবে না।'

আশরাফ আলী খানভীর জীবনী লেখক মন্তব্য করেন, 'আশরাফ আলী খানভী

১৩৬। হাওয়াদিস : আদিতে যে জিনিসের অস্তিত্ব ছিলো না, কিন্তু পরবর্তীতে হয়েছে।

১৩৭। মাযাহার : প্রকাশমানতার বিষয়। এখানে এর অর্থ (হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কীর মতে) সৃষ্টি আল্লাহুর প্রকাশিত রূপ বই কিছুই নয়। আল্লাহুর আস্মা আল-হুসনা (সুন্দর নাম সমূহ), সে আল্লাহ্ ছাড়া কিছু নয়; তেমনি হাওয়াদিস গুলোও সে (আল্লাহ্) ছাড়া কিছু নয়।

১৩৮। আ'রিফ : একজন সুফি, যে মা'রিফাহুর স্তরে পৌঁছেছেন, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন।

১৩৯। মালফুযাত হাকিম আল-উম্মাহ্ (মুহাম্মাদ ইকবাল কুরাইশী কর্তৃক লিখিত মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর জীবনী) ১ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

১৪০। *মাশাইখ-ই-চিশ্ত* (ইংরেজী অনুবাদ) পৃষ্ঠা-২২৫। এই বইটি *কুলিয়াত-ই-ইমদাদিয়াহ* (দশম অধ্যায়), দার আল-ইসহা'ত এ সংকলিত।

১৪১। ইমদাদুল-মুলতাক ইলা আশরাফুল-আখলাক্ (উর্দু), ৭৪ নং বায়ান, পৃষ্ঠা-৬২।

ওয়াহদাতুল-ওজুদ এ বিশ্বাসকে ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা বলে ঘোষণা দেন'। কিন্তু, মুহাম্মদ আহসান আরো এগিয়ে বলেন, 'ওয়াহদাতুল-ওজুদ এ বিশ্বাসের উপর ঈমান নির্ভরশীল'।^{১৪২} ৪। আশরাফ আলী খানভী বলেন, 'কেউ নাবুয়াতের দাবী করলে, আপনারা অবাক হয়ে থাকেন.... কেউ প্রভুত্বের দাবী করেছে। যাহোক, কেউ যেন না ভাবে যে, হুসাইন বিন মানসুর (আল-হাল্লাজ) তার কথা 'আনাল-হাক্ক (আমিই হাক্ক বা সত্য, প্রকৃত অর্থ-আল্লাহ)' দ্বারা প্রভুত্ব (আল্লাহ হওয়া) র দাবী করেছে। কারণ, তার উপর একটা অবস্থা বিরাজ করছিলো, অন্যথায় সেও আবদিয়াহ (ইবদাহকারীর অবস্থা) তে বিশ্বাস করতো। কেউ আল-হাল্লাজকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি যেহেতু আল্লাহ, তাই আপনি কাকে সিজদা করেন'? সে (আল-হাল্লাজ) জবাব দিলো, 'আমার দু'টি অবস্থা, একটা বাইরের এবং অন্যটি ভেতরের, আমার বাহ্যিক রূপ আভ্যন্তরীন রূপকে সিজদা করে'।^{১৪৩}

৫। মাওলানা যাকারিয়াহু বলেন, 'হযরত শাইখুল ইসলাম মাওলানা মাদানী বলেন যে, 'একই কৈফিয়াত (আধ্যাত্মিক অবস্থা), যা মানসুর আল-হাল্লাজকে আস্ত রিকভাবে বাধ্য করেছিলো 'আনাল হাক্ক (আমিই সত্য, অর্থাৎ- আল্লাহ)' বলে দাবী করতে- তা ছয়মাস হযরত মঈনজী (নূর মুহাম্মাদ) এর উপরও বর্তেছিলো। তিনি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর পীর বা শাইখ ছিলেন'।^{১৪৪}

৬। শামাইম-ই-ইমদাদীয়ায় ওয়াহদাতুল-ওজুদ এ বিশ্বাসী এক ফাকির (সাধু) এর কথা বর্ণিত হয়েছে। ফাকিরের আকীদাহর অনুমোদনের পর সংকলক বলেন, উপাসক (আবিদ) এবং উপাসিত (মা'বুদ) এর মাঝে ফারাক বা বিভেদ টানা শিরক.....। আমাদের পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যা থেকে এই মর্ম উদ্ধার করা যায় যে, এই অবস্থা হচ্ছে হাক্ক (সত্য) এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। যাহোক, এর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা যায় তখন, যখন কোন মুরীদ বা শিষ্য কঠিন সংগ্রাম এবং বিপদকে অগ্রাহ্য করে নিজের থেকে দূরবর্তী হয়ে যায়। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে বে-খবর হয়, তখন সে সব ব্যাপারেই বে-খবর থাকে। তার চিন্তা এবং দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সুতরাং, শাগরেদ বা মুরীদের সমগ্র মনোসংযোগ বা ধ্যান থাকে আল্লাহর উপর। তখন কোন কিছুই তার মনোসংযোগ নষ্ট করতে পারে না। তার মন এক আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে, তখন সে তার চোখ খুলে আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখে না। এই অবস্থায় 'হু-হু (সে-সে)' যিকুর 'আনা-আনা (আমি-আমি)' তে রূপান্তরিত হয়। এই পরিস্থিতিতে বলা হয় 'ফানা' দার ফানা'.....। একইভাবে বিশেষ উম্মাহু বায়াজীদ বোস্তামী^{১৪৫} বলেন, 'সুবহানী মা'

১৪২। মাক্কুতুবাৎ ওয়া মালফুজাত আশরাফিয়াহু (আশরাফ আলী খানভীর বায়ান ও লেখনী)- আশরাফ আলী খানভীর এক খলিকা, মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ কর্তৃক রচিত জীবনী, পৃষ্ঠা-১৮৫, ১৮৬।

১৪৩। মালফুজাত হাকিম আল-উম্মাহু (মুহাম্মাদ ইকবাল কুরাইশীর লেখা আশরাফ আলী খানভীর জীবনী) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫১। ইবন আল-ফরিদ এর নুজুম আস-সুলুক কবিতায় একই বিশ্বাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

১৪৪। মাশাইখ-ই-চিশত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২১৩।

১৪৫। আবু ইয়াজীদ বিন তা'ইফুর বিন ঈসা আল-বাস্তামী, সূফীবাদের একজন প্রবক্তা, প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ইরানের খামিস প্রদেশের বাস্তাম শহরের বাসিন্দা।

আযাম-শানী (মহিমা আমার প্রতি, সকল প্রকার অপূর্ণাঙ্গতা থেকে আমি বহু দূরে, আমার অবস্থা কত মহান)', এবং মানসুর আল-হাল্লাজ বলেন, 'আনাল হাক্ক (আমিই সত্য/আল্লাহ)।'^{১৪৬} মন্তব্যঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে দ্বীন-ইসলাম শিখিয়েছেন, তা পেরগানদের পুত্র-কন্যা সহ আল্লাহর দাবীকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখান করে। কারো আল্লাহ হওয়ার দাবী নিশ্চিত রূপে দূরে থাকে। "এটা এজন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"^{১৪৭}

৭। শামাইম-ই-ইমদাদিয়াহ থেকে 'উবুদিয়াহ (আবিদ বা উপাসকের পর্যায়)'-তে কালিমাহ - "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-র তিনটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

- লা'মা'বুদ (উপাস্যের যোগ্য কেউ নেই)।
- লা'মাতলুব (কাঙ্ক্ষিত কেউ নেই)।
- লা'মাওজুদ (কেউ অস্তিত্বে নেই), এই শেষেরটি সর্বোচ্চ অহংকারী অবস্থান।^{১৪৮}

৮। ইরশাদুল মূলক বইয়ে রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী কর্তৃক তাঁর পীর ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীকে লেখা এক চিঠিতে শেষের দিকে উল্লেখ করেন, 'বাস্তবে আমি কিছুই না। এটি শুধু আপনার ছায়া-শুধুই আপনার অস্তিত্ব (অর্থাৎ- আল্লাহর অস্তিত্ব)। আমি কি? আমি কিছু না, কেবল 'সে'। আপনি এবং আমি শিরক এর উপর শিরক'।^{১৪৯}

মন্তব্যঃ এই চিঠিতে রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী তাঁর পীর ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীকে তাঁর কুশলাদি জানিয়ে বলেন, "বাস্তবে, না তাঁর বা তাঁর পীরের কোন অস্তিত্ব আছে, এবং সৃষ্টি ও সৃষ্টির মাঝে বিভেদ করা শিরক! সৃষ্টি হচ্ছে শুধুই আল্লাহর ছায়া!" তা'হলে -কে কাকে চিঠিটি লিখেছে? এইভাবে, সুফিবাদ স্ববিরোধীতায় একেবারে ভরপুর!

শাইখ আল-ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রঃ) তাঁর "আল-ফুরক্বান বায়না আউলিয়া আর-রাহ্মাহ ওয়া আউলিয়া আশ্-শায়ত'ান" কিতাবের ১০১ পৃষ্ঠায় *ওয়াহদাতুল-ওজুদ* সম্পর্কে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ইবন আরাবীর *জ্ঞানের সারবত্তা* বইটি আত্-তালমাসানীকে পড়ে শোনাতে বলা হয়- 'আপনার এই কিতাবটি আল-কুর'আনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বা বিরুদ্ধবাদী'। এতে তিনি (ইবন আরাবী) বলেন, 'সম্পূর্ণ কুর'আনই সম্পৃক্ততাবাদিতা বা Associationism (শিরক), তাওহীদ কেবল আমাদের লেখাতেই পাওয়া যায়'।

১৪৬। শামাইম-ই-ইমদাদিয়াহ পৃষ্ঠা-৩৬। সাই বাবা একই রকম কথা বলেন যে, আমি পারওয়ারদিগার (প্রভুর ফার্সী), (The life and Teachings of Sai Baba, Page-4).

১৪৭। সুরাহ আল-হাক্ক (২২ : ৬)।

১৪৮। শামাইম-ই-ইমদাদিয়াহ, পৃষ্ঠা-৪৩।

১৪৯। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১১।

তখন তাকে বলা হলো, ‘যদি সমস্ত অস্তিত্ব কেবল একই হয়, তাহলে কেন একজন পুরুষের কাছে তার স্ত্রী হালাল, আর তার বোন হারাম?’ তিনি (ইবন আরাবী) বললেন, ‘আমাদের কাছে তারা উভয়ই হালাল, কিন্তু যে অবগুষ্ঠিত, সে হারাম! এবং তাই আমরা তোমার জন্য হারাম বলি।’ শাইখ আরো বলেন, ‘এই ব্যক্তি তার স্থূল ধারণা (কুফর) ছাড়াও সে স্ববিরোধীতা করেছে! যদি সব অস্তিত্ব এক হয়, তা’হলে অবগুষ্ঠিত কে, আর তাকে অবগুষ্ঠিতই বা করলো কে?’ এভাবে তাঁদের এক শাইখ তাঁর এক শাগরিদকে বললেন : ‘যে-ই তোমাকে আল্লাহ্ ছাড়া এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই অস্তিত্বের কথা বলে, সে মিথ্যা বললো।’ শাগরিদ জিজ্ঞেস করলো, ‘তা’হলে যে মিথ্যা বললো, সে কে?’ তারা আরেক শাগরিদকে বললো, ‘এগুলো অবয়ব (Appearance) বই আর কিছু নয়।’ তিনি (ইবন আরাবী) তাদের বললেন, ‘এই অবয়ব (Appearance) গুলো যে আপেক্ষিকতা (অস্তিত্বের সঙ্গতিহীনতা)-র উপস্থাপন করে, তা ছাড়া অন্য কিছু? এবং এগুলি যদি এক হয়, তা’হলে, এগুলো তাই, আমি যা বলেছি।’

ধারণা বা প্রচেষ্টা ছিলো কিছু লোকোনের

একটি প্রশ্নের উদ্বেগ ঘটে, সুফিবাদের জীবনীশক্তি যদি *ওয়াহদাতুল-ওজুদ*-এর ধারণা হয়, যা অধিকাংশ দেওবন্দি আলিমের মত; তাহলে, কেন এই মতবাদ বা চেতনা প্রচারিত হলো না এবং আম-জনতার মাঝে জনপ্রিয় করা হলো না?

মনে করা হয়, সুফি-বুজুর্গদের গুপ্ত/রহস্যময় প্রার্থনা-প্রথা সাধারণ মানুষের আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমানতার ধারণা বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট, এই ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিবরণ ছাড়াই। *ওয়াহদাতুল-ওজুদ*-এ বিশ্বাস কে আধ্যাত্মিক বুজুর্গদের তাওহীদ বলে মনে করা হয়। যেমনটি আবু বাক্র আল-কালাবাজি তার বইয়ে উল্লেখ করেন যে, আল-য়ুনায়েদ আল-শিবলীকে বলেন, ‘আমরা এই বিজ্ঞান গভীরভাবে চর্চা করলাম, অতঃপর সিন্দুকে লুকিয়ে রাখলাম, কিন্তু, আপনি এসে তা জনগণের মাথার উপর মেলে ধরলেন।’ আল-শিবলী জবাব দিলেন, ‘আমি বলি এবং শুনি, পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ আছে কি?’^{১৫০}

আশরাফ আলী খানভী তাঁর পীর (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) এর *ওয়াহদাতুল-ওজুদ*-এর মোহত্বাত্তার কথা উল্লেখ করেছেন- যা এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেন, ‘কিন্তু এই বক্তব্যগুলোর বর্ণনা সবার জন্য নয়।’^{১৫১}

এই বক্তব্য বা মন্তব্যগুলো *ওয়াহদাতুল-ওজুদ* এর বিশ্বাসকে সাধারণ মানুষ থেকে

১৫০। The Doctrines of Sufis (কিতাব আত্-তা’য়রুফ লি-মাযহাব আহল আত্-জাসাউফ, ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৪৫।

১৫১। মালফুজাত হাকিম আল-উম্মাহ (মুহাম্মাদ ইকবাল কুরাইশী কর্তৃক লিখিত আশরাফ আলী খানভীর জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪।

লুকিয়ে রাখাই প্রমাণ করে। কোন এক ঘটনায় আশরাফ আলী খানভী বলেন, ‘দুনিয়ায় হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ আল্লাহর হুজ্জত (নিদর্শন) ছিলেন! শত-শত বছর ধরে যে ইলম গোপন ছিলো, তা তাঁর ওঠে বা কঠে প্রকাশিত হলো।’^{১৫২} এভাবে যদি কোন সাধারণ মানুষ ওয়াহদাতুল-ওজুদ-এর ধারণার সাথে পরিচিত হয়, তা’হলে, তার পূর্বের আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমানতার ধারণা তাকে গূঢ় রহস্য তত্ত্ব বিশ্বাসে সাহায্য করবে। এটি কালিমাহ, ‘... (কোন বিশ্বাসী) তাঁকে (আল্লাহ) দুঃস্থাবস্থায় একমাত্র অভিভাক বা সাহায্যকারী ও সর্বত্র বিরাজিত বলে বিশ্বাস করবে’ এর ব্যাখ্যায় ছয় মূলনীতির^{১৫৩} বর্ণনায় আছে।

ইসলামে গোপন ইলম-এর ব্যাপারে আলিমদের অবস্থান

ইমাম আহমাদ আয-যুহদ (পৃঃ-৪৮)-এ এবং আদ-দারিমী তাঁর সুনান (১/২৯) এ উমার ইব্ন আব্দুল আজিজ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাঃ) বলেন, ‘তুমি যদি কাউকে সাধারণের বাইরে তাদের দ্বীন সম্পর্কে গোপনে আলোচনা করতে দেখো, তা’হলে, জেনে রেখো, তারা বিভ্রান্তির দোড় গোড়ায়।’^{১৫৪} ইব্ন আল-যাওজী তালবীস-ইবলিস এ এই বৃত্তান্ত এই বলে তুলে ধরেন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমাদের দ্বীন কোন কিছু গুপ্ত, অবরুদ্ধ বা অবদমিত না রেখে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, প্রকাশিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে সর্বসাধারণে উন্মোচিত। তাই, অংশীবাদী জনগণ তার থেকে সরে এসে যা’তেই নিয়োজিত হোক, তা হবে বিভ্রান্তির বেড়াজাল; এবং এ জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে’।^{১৫৫}

কুর’আন ও সুন্নাহর আলোকে ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর খন্ডন

আরশের উপর আল্লাহর অবস্থানের স্বচ্ছ বিশ্বাস, ওয়াহদাতুল-ওজুদ এ যারা বলেন, ‘আল্লাহ সর্বত্র বিরাজিত’ ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে খন্ডন ও বাতিল করে। নীচে এর দলিল দেয়া হল....

ক) আল-কুর’আনের অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহামহিমাম্বিত আল্লাহ যথাযোগ্য গৌরবান্বিতভাবে তাঁর আরশের উপর অবস্থানরতঃ

আল্লাহ বলেন, “নিচয়ই, আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক (রাব্ব), যিনি নভোমন্ডল ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয়দিন পরিমিত কালে, অতঃপর তিনি

১৫২। মাজলিসুল উলেমা কর্তৃক প্রণীত মালফুজাত (আশরাফ আলী খানভীর বক্তব্য ও কাহিনী), পৃষ্ঠা-৬৮।

১৫৩। ফাজায়েল-ই-আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ছয় মূলনীতি, ৮ম পর্ব/অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১ (প্রকাশনা-১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ, দ্বীন বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

১৫৪। আল-মুস্তাক্বান-নাফীস মিন তালবীনে ইবলিস, পৃষ্ঠা-৪০।

১৫৫। আল-মুস্তাক্বান-নাফীস মিন তালবীনে ইবলিস, পৃষ্ঠা-৮৯।

আরশে সমুন্নত হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন।”^{১৫৬} এধরণের আরো ছয়টি আয়াত পাওয়া যায় আল-কুর’আনে। প্রতি সুরাহর অসংখ্য আয়াতে এ ধরণের ইঙ্গিত আছে, যার কিছু হচ্ছে- “তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল।”^{১৫৭} “তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উদ্ভিত হয়, এবং সংকর্ম ওকে উন্নীত করে।”^{১৫৮}

খ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর অগণিত হাদীস অব্যর্থভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁর আরশে সমুন্নত, তাঁর কোন সৃষ্টির মাঝে তিনি বিলীন ননঃ

১। মুয়াবিয়া ইবন আল-হাকাম (রাঃ) বলেন, ‘আমার একজন দাসী ছিলো, যে ওহুদ পাহাড়ে আমার মেষপাল চড়াতো.....। একদিন দেখলাম যে, তার পাল থেকে একটি মেষ নেকড়ে নিয়ে গেছে.... (যদরুন) আমি তার মুখে প্রচণ্ড এক খাপ্পর মারি। যখন এটি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর গোচরিভূত করি, তখন তিনি একে আমার সাংঘাতিক (অন্যায়) কাজ বলে বিবেচনা করেন। তাই আমি বলি যে, ‘আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি কি তাকে আজাদ করে দিতে পারি না?’ তিনি বললেন, ‘তাকে আমার কাছে আন।’ আমি তাকে নিয়ে আসলাম। তিনি (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহ কোথায়?’ সে বললো, ‘আসমানের উপর।’ তিনি (সাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আমি কে?’ তখন সে জবাব দিলো, ‘আপনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)।’ সুতরাং, নাবী (সাঃ) বললেন, ‘তাকে আজাদ করে দাও, কারণ, সে একজন সত্যিকার ঈমানদার।’^{১৫৯}

২। আবু সায়ীদ আল খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, “আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন যে, ‘তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস কর না? এবং আমি হচ্ছি তাঁর (আল্লাহ) আহ্বাভাজন বান্দা, যিনি আছেন নভোমন্ডলের উপর। অমর্ত্যের বার্তা আসে আমার কাছে প্রাতেঃ ও সায়াকে।’^{১৬০}

৩। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘যখন আল্লাহ সৃজনশীলতা শেষ করেন, তখন তা (তাঁর কাছে রক্ষিত) এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করে আরশের উপর রাখেন, আর বলেন, “অবশ্যই, আমার করুণা আমার ক্রোধের অগ্রবর্তী।”^{১৬১}

৪। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের মহামহিমাম্বিত রাব্ব (আরশ থেকে) সর্বনিম্ন (প্রথম) আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, “কেউ আমাকে ডাকার আছে, যাতে আমি তার ডাকে সাড়া দেই? আমার

১৫৬। সুরাহ ইউনুস (১০ : ৩)।

১৫৭। সুরাহ আল-আন’আম (৬ : ১৮)।

১৫৮। সুরাহ আল-ফাতির (৩৫ : ১০)।

১৫৯। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), হাদীস নং-১০৯৪ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৭১-২৭২)।

১৬০। সহীহ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ) ৮ম খন্ড, হাদীস নং-৬৭ ও সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, হাদীস নং-৭৪২।

১৬১। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ), ৯ম খন্ড, হাদীস নং-৫১৮ ও সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং-৬৬২৮।

কাছে কারো যাচঞা আছে, যাতে আমি তা পূরণ করতে পারি? কেউ আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আছে কি, যাতে আমি ক্ষমা করতে পারি?”^{১৬২}

৫। সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর স্ত্রী যায়নাব বিন্তে জাহাশ (রাঃ) নাবী (সাঃ)এর অন্যান্য স্ত্রীগণের সাথে ফাখর করতেন যে, ‘তাদের বিয়ে তাঁদের পরিবার থেকে নাবী (সাঃ)এর সঙ্গে সম্পাদন করেছেন; আর তাঁর {যায়নাব (রাঃ)} বিয়ে আল্লাহ সন্ত-আসমানের উপর থেকে সম্পাদন করেছেন।’^{১৬৩}

গ) ফিতরাহ (স্বাভাবিক প্রবণতা) :

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘প্রতিটি শিশুই ফিতরাহ (মুসলিম)র অবস্থায় জন্মায়। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা বা মাজুসী (অগ্নি-উপাসক) বানায়’।^{১৬৪} সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি পুঁতি-গন্ধময় ময়লা স্থানও আল্লাহ— এই বিশ্বাস, স্বভাব সুলভ ‘ফিতরাহ’ বিশ্বাসের পরিপন্থি। কোন সুস্থ মুসলিম তার রাব্ব সম্পর্কে এমন নষ্ট ও অনৈতিক ধারণা পোষণ করতে পারেনা। সে-ই পারে, যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে বা ফিতরাহ কলুষিত হয়ে গেছে; যেমন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “..... পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা বা অগ্নি-উপাসক বানায়।”

এমনকি, ভারতের একজন সরলমনা হিন্দুও মনে করেন যে, প্রভু (রাব্ব) হচ্ছে উপরওয়াল্লা বা একজন, যিনি উপরে আছেন। কান্না ফিরাউনও স্বভাবগতভাবে এই বিশ্বাসে আপ্ত ছিলো, “..... ফিরাউন বললো, হে হামান! আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি অবলম্বন পাই আস্মানে আরোহণের, যেন আমি দেখতে পাই মুসা (আঃ) এর মা’বুদ কে....।”^{১৬৫}

ঘ) ইসরা আল-মিরাজ :

আরেকটি বিষয় আল্লাহর সন্তম আকাশের উপরে অবস্থানের প্রমাণ। আর তা হচ্ছে, ইসরা আল-মিরাজ-এর মুজিয়াহ; যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে সন্তম আকাশের উপরে মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহর সান্নিধ্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। যদি আল্লাহ সর্বত্র এবং সবকিছুতে বিরাজিত হতেন (নাউযবিলাহ....), তা’হলে ইসরা মি’রাজ এর হিক্‌মাহ, গুরুগাভীর্যতা, দর্শন ও মহানতা অর্থহীন, গুরুত্বহীন ও অসার ব্যাপার বলে পরিগণিত হতো।

১৬২। সহীহ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ), ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৮৬, মুয়াত্তা হাদীস নং-১৫/৩০ ও শারাহ আস-সুন্নাহ আত-তিরমিযী-হাদীস নং-২৬০১।

১৬৩। সহীহ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ), ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-৫১৭, পৃষ্ঠা-৩৮২।

১৬৪। সহীহ আল-বুখারী (ইংঃ অনুঃ), ৮ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৯৭ ও সহীহ মুসলিম (ইংঃ অনুঃ), ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৬৪২৩।

১৬৫। সূরাহ আল-মু’মিন (৪০ : ৩৬-৩৭)।

সালফে সালেহীনদের বক্তব্য থেকে আরো প্রামাণ্য দলিল

আবু বাকর (রাঃ) থেকে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘যখন আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর ওফাত হয়, আবু বাকর (রাঃ) প্রবেশ করে তাঁর (সাঃ) কপালে চুমু খেয়ে বলেন, ‘আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি জীবনে ও ওফাতে শুভ ছিলেন।’ অতঃপর তিনি মন্তব্য করেন, ‘যারা মুহাম্মদ (সাঃ)এর উপাসনা করতো, মুহাম্মাদ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। (কিন্তু) যারা আল্লাহর ইবাদাহ করে, আল্লাহ নভোমন্ডলের উপরে (আরশে), তিনি চিরজীব ও মৃত্যুঞ্জয়ী।’^{১৬৬} ইমাম মালিক (মৃঃ ১৭৯ হিঃ) : আব্দুল্লাহ ইবন না’ফী বর্ণনা করেন যে, মালিক ইবন আনাস (রঃ) বলেন, ‘আল্লাহ নভোমন্ডলের উপর, এবং তাঁর জ্ঞানের পরিধি কোন কিছু সম্পর্কে অনবহিত বা কোন কিছুতে অনুপস্থিত না থেকে সর্বব্যাপী ব্যাপ্ত এবং বিস্তৃত।’^{১৬৭}

শাইখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবন মুবারাক (মৃঃ ১৮১ হিঃ) : আলী ইবন আল-হাসান ইবন সাদিক বর্ণনা করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আল-মুবারাককে জিজ্ঞেস করি, ‘আমরা আমাদের রাব্ব সম্পর্কে কেমন জানি?’ তিনি বলেন, ‘তিনি (আল্লাহ) সাত আসমানের উপরে তাঁর আরশে। আমরা জাহিমিয়াদের’^{১৬৮} মত বলি না, তিনি (আল্লাহ) এখানে, দুনিয়ায়।’ এটি আহমাদ ইবন হাম্মাল (রঃ) কে বলা হলে তিনি বলেন, ‘ওটি এমনই আমাদের মাঝে আছে (অর্থাৎ, আমরাও তাই বিশ্বাস করি)।’^{১৬৯}

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদ্রিস আশ্-শাফি’ঈ (মৃঃ ২০৪ হিঃ) : আবু যার ও আবু শু’আইব উভয়েই বর্ণনা করেন যে, আশ্-শাফি’ঈ (রঃ) বলেন, ‘সুন্নাহ সম্পর্কে আমি যা পাই ও বিশ্বাস পোষণ করি, তা হচ্ছে- সুফিয়ান, মালিক ও অন্যান্যদের বিশ্বাস করে ও সাক্ষ্য দিতে দেখি যে, ‘নিশ্চয়ই, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রকৃত উপাসনার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ নভোমন্ডলের উপর, তাঁর আরশে। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যেমন ইচ্ছা কাছে টানেন ও যেমন ইচ্ছা তেমন নীচের আকাশে অবতরণ করেন।’^{১৭০} ইমাম আহমাদ ইবন হাম্মাল (মৃঃ ২৪১ হিঃ) : আবু

১৬৬। আদ-দারিমীতে *আবু-রাদ আল-জাহিমিয়া*-য় হাসান ইসনাদে বর্ণিত।

১৬৭। আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ কর্তৃক *আস্-সুন্নাহ*-য় (পৃঃ ৫), আবু দাউদ কর্তৃক *আল-মাসাইল*-এ (পৃঃ ২৬৩), আল-আছুরী কর্তৃক *আশ্-শারীয়াহ*-য় (পৃঃ ২৮৯) এবং *আল-লালিকা’ঈ* (১/৯২/২) তে বর্ণিত।

১৬৮। জাহিমিয়াহ হচ্ছে জাহূম ইবন শাফওয়ান এর অনুসারীগণ। যে সর্ব প্রথম আল্লাহর সীফাত (গুণের মহিমা) অস্বীকার করেছিলো। পূর্ব যুগে সে আল্লাহর সীফাত অস্বীকার করায় ইরাকের বাদশাহ খালিদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খুসারী তার গর্দান নেন। এটি তাবেঈদের যুগে ঘটেছিলো। এ কারণে তার সময়ের সালফে সালেহীনগণ তাকে *কাফির* আখ্যা দিয়েছিলো।

১৬৯। আদ-দারিমী কর্তৃক *আবু-রাদ আল-মারসী* (পৃঃ ২৪ ও ১০৩), *আবু-রাদ আল-জাহিমিয়াহ* (পৃঃ ৫০) এবং আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ কর্তৃক *আস্-সুন্নাহ* (পৃঃ ৭, ২৫, ৩৫ ও ৭২)-য় বর্ণিত।

১৭০। মুখতার আল-উলু’উ (১৯৬ পৃঃ)।

আব্দুল্লাহ্ (ইমাম আহমাদ) এর কাছে বলা হলো, ‘আব্দুল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন, সপ্তম আকাশের উর্ধ্বে তাঁর আরশে সমুন্নত। তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি সর্বত্র বিস্তৃত।’ তিনি (ইমাম আহমাদ) বলেন, ‘হ্যাঁ, তিনি (আব্দুল্লাহ্) আরশের উপর সমুন্নত এবং তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী বিস্তৃত।’^{১৭১} শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ লিখেন, ‘প্রথম যামানার মুসলিম ও ইমামগণ সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্যে ছিলেন যে, রাব্ব, তথা- স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র।’^{১৭২} এগুলো সাল্ফে-সালেহীনদের বক্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি। আয্-যাহাবী তাঁর কিতাব *আল-উলূ’য়্যুহু*-তে পূর্বযুগীয় বৃজুর্গ আলিমগণের (দু’শরও অধিক) অনুরূপ বক্তব্য তুলে ধরেন।^{১৭৩}

শ্রান্ত ধারণার অপনোদন

কুর’আনের কিছু আয়াত আব্দুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির নৈকট্যের কিছু ইঙ্গিত দেয়; যেমন, আব্দুল্লাহ্ বলেন, “তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন...”^{১৭৪}

আব্দুল্লাহ্ রাব্বুল আ’লামিনের সঙ্গে তাঁর বান্দাহ্‌র নৈকট্যের বিষয়টি তাঁর অবগতির বা ওয়াকিফহালের দিকেই ইঙ্গিত করে। এমনটিই ইমাম ইবন কাসীর (রঃ) ও তাঁর তাফসীরে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, “মহান আব্দুল্লাহ্ বলেন, ‘তোমরা- যেখানেই থাকনা কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর, আব্দুল্লাহ্ তা দেখেন;’ - তা যেমনই হোক, যাই হোক। আর তোমরা স্থলে থাক বা জলে থাক, রাত হোক বা দিন হোক, তোমরা ঘরে থাক বা মরুভূমি-জঙ্গলে থাক, সবই তাঁর অবগতি বা জ্ঞানের পক্ষে সমান। সদা-সর্বদা তাঁর দর্শন ও শ্রবণ তোমাদের সাথে রয়েছে। তোমাদের সমস্ত কথা তিনি শুনছেন এবং তোমাদের সব অবস্থা তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন।”

তাই কুর’আনের আয়াতের নৈকট্য (কাছে থাকা/আসা) আব্দুল্লাহ্‌র স্বত্তার দ্বারা নয়, বরং, তাঁর জ্ঞানের পরিধি দ্বারা। আব্দুল্লাহ্ আস্-সামী (সর্বশ্রোতা), আল্-বাসীর (সর্ব-দ্রষ্টা) ও আল্-আলিম (সর্ব-জ্ঞাতা)। সৃষ্টির ক্রিয়া-কর্ম বা অবস্থা জানার জন্য তাঁকে তাদের মাঝে বিলীন হওয়ার তুচ্ছাতি-তুচ্ছতম প্রয়োজনেরও কোনই বালাই নেই (এটি একটি বাতিল ধারণা বই কিছু নয়-অনুবাদক)।

১৭১। *আল-মুখতাসারে আল-খাল্লাল* কর্তৃক বর্ণিত।

১৭২। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ্ রচিত *আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়া আর-রাহমান ওয়া আউলিয়া আশ-শ্যায়’দুয়ান* কিতাবের ১১১ পৃষ্ঠা।

১৭৩। শাইখ আব্দুল্লাহ্ আস্-সাব্ব কর্তৃক প্রণীত *The Ever Merciful Istiwa Over the Throne*.

১৭৪। সূরাহ্ আল-হাদীদ (৫৭ : ৪)।

ইমাম ইবন কাসীর (রঃ) আয়াতে কারীমাহ্-“এবং বাস্তবিক আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি, আর আমরা জানি, তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়। আর আমরা তার গ্রীবার শাহ্-রগের চেয়েও নিকটে”^{১৭৪} এর তাফসীরে লিখেন-অর্থাৎ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ মানুষের গ্রীবার শাহ্-রগের চেয়েও কাছে। যারা আয়াতের ‘আমরা’-এর অর্থ করেছেন ‘আমাদের জ্ঞান’ হিসেবে, তারা এমনটি করেছেন অবতার বা মূর্তিমানতার ধারণায় আবর্তিত হওয়ার শংকাকে এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, এই দুই মতবাদ মুসলিম মিল্লাতের মতে ভ্রান্ত। আল্লাহ্ প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত, তাঁকে তারা যতটুকু মনে করে বা বলে তার চেয়েও তিনি অনেক বেশী পবিত্র। এই আয়াতের শব্দগুলোর (‘আমরা’ বলতে ‘আল্লাহ্‌র জ্ঞান’ কে ইঙ্গিত করে) ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; যেহেতু, আল্লাহ্ বলেন নি, ‘আর আমি তার গ্রীবার শাহ্-রগের চেয়েও নিকটে।’ বরং, তিনি বলেছেন, “আর আমরা তার.....।” যেমনটি তিনি (আল্লাহ্) মুমূর্ষু ব্যক্তির বেলায় বলেন, “আর আমরা তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু, তোমরা দেখতে পাও না।”^{১৭৫}

ওয়াহদাতুল-ওজুদ ও মোক্ষ্য, - একই মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ

যদি কেউ ভগবান ও মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে হিন্দু মতবাদের বিশ্লেষণ করে, তা’হলে, সে তার সঙ্গে পেগান (সর্বেশ্বরবাদী) দের মোক্ষ্য এবং দেওবন্দি সূফীদের ওয়াহদাতুল-ওজুদ আক্বীদাহ্‌র আশ্চর্য রকম সাজুয্য দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠবে। *The Religion of the Hindus* গ্রন্থ থেকে এখানে কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে...।^{১৭৬}

“হিন্দু ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেয় যে, মানব জীবনের চরম পরিণতি হচ্ছে সসীম মানব চৈতন্য থেকে যুক্তি বা নির্বাণ (মোক্ষ্য) লাভ, যা মানুষকে সব কিছু একে অপর থেকে আলাদা করে দেখায়- কোন সামগ্রিকের অংশ হিসেবে নয়। যখন কোন উচ্চতর চৈতন্য আমাদের উপর আবর্তিত হয়, তখন আমরা মহাবিশ্বের এক একটি অংশকে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থেকে এক তাৎপর্যপূর্ণ সত্যসহ উৎসারিত হতে দেখি। এটি হচ্ছে, অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির শুরু, যাকে হিন্দু ধর্মে দ্বিতীয় জন্ম বা তৃতীয় নয়নের উন্মোচন বা প্রাজ্ঞদৃষ্টি/দিব্যজ্ঞান বলে। এই অনুভূতি উদ্দীপ্ত চৈতন্যকে কমবেশী স্থায়ী রূপ দেয়, যা মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য, আর অর্জন।

১৭৪ক। সূরাহ্ আল-দ্বাক (৫০ : ১৬)।

১৭৫। সূরাহ্ আল-ওয়াকিয়াহ্ (৫৬ : ৮৫)।

১৭৬। Keneth W. Morgan কর্তৃক হিন্দুত্ব বা হিন্দু ধর্মের উপর সুগভীর গবেষণালব্ধ সৃষ্টিকর্ম। একাজে সহায়তা করেছেন সাত জন প্রথিতযশা হিন্দু পণ্ডিত। উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দুত্বকে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা ও তুলে ধরা, যারা ভারতবর্ষ, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ/অপরিচিত।

আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, আমাদের শিল্পকলা ও বিজ্ঞান, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো প্রকৃত অর্থে পরিণতি নয়। বরং, মুক্তি বা নির্বাণ এর পথে পাথের স্বরূপ। যখন এই লক্ষ্য অর্জিত হয়, মানুষ তখন নশ্বর পর্যায় বা জগতের ডাকে চলে যায় এবং বিপুল বিশ্বজ্ঞ অস্তিত্ব, চৈতন্য ও স্বর্গসুখীর একজন হয়ে যায়, যাকে হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ বলা হয়।

মানুষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, নির্বাণ লাভ। নির্বাণ লাভ শুধু মরদেহ বা রক্ত-মাংসের দেহ থেকেই নয়, সসীম অস্তিত্বের বেড়াজাল থেকেও। অন্যভাবে, মোক্ষ হচ্ছে, পরমাত্মার মত পরিপূর্ণ আত্মায় পরিণত হওয়া।”

সৃষ্টি কেবলই স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ

The Religion of the Hindus^{১৭৭} গ্রন্থে বলা হয়েছে— কোন আধ্যাত্মিক বাস্তবতায় আত্মভাজনতাকে সাধারণতঃ আত্মা বা গণদেবতা বলে মনে করা হয়; কর্মের বিধানে বিশ্বাস ও আত্মার পূর্ণজন্ম হিন্দুধর্ম চেতনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একজন বিচক্ষণ হিন্দু ভগবান বা প্রভুকে তার দেহাভ্যন্তরের বাসিন্দা বলে মনে করে, যা আত্ম নিয়ন্ত্রক হিসাবে তার সমস্ত কর্মযজ্ঞকে নিয়ন্ত্রণ করে। একই ভাবে, তার দেহের বাইরে ও জানা-অজানা সংখ্যাভীতভাবে প্রভু/ভগবান প্রকাশিত।

যদিও বৈদিকগণ বহু দেবতার বন্দনা করেন, তথাপি, তাদের আরাধনায় বহু দেবতা (ভগবান)-র মাঝে এক পরমাত্মার শুধু আংশিক প্রকাশ তারা সত্ত্ব উপলব্ধি করেন। এই বৈদিক চরণটি প্রায়ই উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করা হয়, ‘বাস্তবতা হচ্ছে এক, মুনিঋষিগণ একে বিভিন্নভাবে বলেছেন’।

প্রতিটি দেবতা, মানুষ যাদের পূজা করে, তা এক সীমিত আদর্শের মূর্ত প্রতীক; এবং তা হচ্ছে, নিরঙ্কুশের এক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক;— এই ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। আর এটি হচ্ছে, হিন্দু ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। এই ধারণাটিই হিন্দুধর্মকে ধর্মের মাঝে পরম সহিষ্ণুতার ধর্ম হিসেবে পরিগণিত করিয়েছে।^{১৭৮}

মন্তব্য :

যখনই কোন একক অস্তিত্ব বা ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর ধারণা উপস্থাপিত হয়, তখনই

১৭৭। Keneth W. Morgan কর্তৃক হিন্দুত্ব বা হিন্দু ধর্মের উপর সুগভীর গবেষণালব্ধ সৃষ্টিকর্ম।

১৭৮। এটিও সূফীদেরকে হিন্দুদের মত সহিষ্ণু বানায়, যেমন ইবন আরাবী বলেন, একজন সূফী হচ্ছে পরিশূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি, যে প্রতিটি উপাসনা যোগ্য বস্তুকে দেখে ওর মধ্যে সত্তা (আত্মাহু)-র প্রকাশ হিসেবে। সুতরাং, তারা সবাই একে এর নির্দিষ্ট নাম ছাড়াও প্রভু বলে ডাকে; চাই এটি কোন পাথর, পাহাড়, জল, ব্যক্তি, নক্ষত্র বা কোন দেবদূত (ফিরিশতা) হোক। আল-ফুসুস (১/১৯৫)।

প্রভু ছাড়া অন্য জিনিষের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা অপরিহার্যভাবে দাবী করা হবে। যেমন- মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, গাছ, পাহাড়-পর্বত, ইত্যাদি। হিন্দুগণ বলেন, প্রভু হচ্ছেন তার বাইরের জন, যার প্রকাশ অসংখ্যভাবে, এবং এটি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কীর বক্তব্যের মতই- যেমন, ‘একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে.... যে, যেহেতু, আল্লাহ্ ছাড়া কিছু নেই, তা’হলে এই হাওয়াদিস’^{৭৯} গুলো কি? উত্তর এরকম, লাহুল আসমাউল হুসনা অর্থাৎ, সবই হচ্ছে মাযাহার (প্রকাশের বিষয় সমূহ),^{৮০} এইভাবে সূফীগণ ও হিন্দুগণ একই ব্যাখ্যা দেন।

ওয়াহদাতুল-ওজুদ এর মত মোক্ষ ও আধ্যাত্মিক অভিজাতদের জন্য

হিন্দুত্ববাদে বলা হয়, “কোন সাধারণ মানুষ অধিবিদ্যা (সম্ভার প্রকৃতি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র) মূলক আদর্শে বেশী অগ্রসর থাকলে তার সামনে একটি ধর্ম বা তত্ত্বীয় নীতিধারা থাকে। এই স্তরে নৈর্ব্যক্তিক নিরঙ্কুশ ব্রাহ্মণ একজন ব্যক্তি বা মানবিক ভগবান/প্রভুতে পরিণত হয়; পূর্ণ বা নির্ভুল হয় শুভ, প্রকাশ/বিকাশ পরিণত হয় সৃষ্টিতে, নির্বাণ পরিণত হয় স্বর্গীয় জীবনে এবং প্রেম-ভালোবাসা অধিকার করে জ্ঞানের স্থান।

হিন্দুধর্মীয় দর্শন অনুযায়ী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বেলায় সব মানুষের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। তবে তা ভিন্ন মাত্রা ও প্রকারে তার (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) অতীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত। যখন লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়, তখন আর উপায়/পাথের এর প্রয়োজন থাকে না। ধর্মীয় জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আর আচার-অনুষ্ঠান (ধর্মীয়) এর কোন প্রয়োজন নেই। একজন সন্ন্যাসী কোন কৃত্যানুষ্ঠান বা পর্বাদি পালন করে না। যেহেতু, প্রতি ধাপে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গুলো উপাসকের বিন্যস্ততা ও কৃষ্টিগত স্তর অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাই নিরঙ্কররা শিক্ষিতদের তুলনায় স্থূল ধরণের কৃত্যানুষ্ঠান পালন করে থাকে।

যদি সে এ স্তরেরও উপযুক্ত না হয়, তা’হলে তার জন্য একটি কৃত্যানুষ্ঠান ও নৈতিক কর্মযজ্ঞের ক্রমধারা নির্ধারিত হয়। এই স্তরে মন্দিরের প্রতিমা (মূর্তি) মানবিক ভগবানের প্রতীক; ধ্যানের স্থান দখল করে কৃত্যানুষ্ঠান ও প্রার্থনা, এবং প্রেম-ভালোবাসাকে প্রতিস্থাপন করে ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ।”

১৭৯। হাওয়াদিস : আদিতে যে জিনিষের অস্তিত্ব ছিলো না, কিন্তু পরবর্তীতে হয়েছে।

১৮০। মাযাহার : প্রকাশের বিষয় সমূহ। এখানে অর্থ-সৃষ্টি আল্লাহর প্রকাশিত রূপ। আল্লাহর আসমাউল হুসনা (সুন্দর নাম সমূহ), সে (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কিছু নয়। তেমনি হাওয়াদিস গুলোও তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত আর কিছু নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বারযাখের জীবন

উপক্রমণিকা : সুফী শাইখদের মর্যাদার অতিরঞ্জন এবং তাদের মাযার পূজা করা, ঈমান ধ্বংসকারী সুফী মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম। মৌলিক যে বিশ্বাসের উপর মাযার পূজা করা হয়ে থাকে, তা'হলো, ক্বাবরবাসী বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারে। একবার যদি এই 'ঈমান ধ্বংসকারী' বিশ্বাস মানুষের মনে স্থান করে নিতে পারে, তবে অবশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানগুলি অভ্যাসে পরিণত হওয়া সহজ হয়ে যায়।

অতএব, আজকাল আমরা দেখি-

- কিছুলোক মাযার যিয়ারাহ্ করে এই ভেবে যে, বূজুর্গ লোকদের মাযারে ইবাদাহ্ করলে, আল্লাহর কাছে তা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।
- কিছুলোক মাযার যিয়ারাহ্ করে, তা থেকে আশির্বাদপ্রাপ্ত হবার জন্য, আর তার উপকরণ হলো, মাযারের ক্বাবরবাসীর উচ্চ মর্যাদা, মাটি অথবা মাযারের খাদেমদের তৈরী তাবিজ-কবজ।
- আবার কেউ মাযার যিয়ারাহ্ করে এই উদ্দেশ্যে যে, ক্বাবরবাসী তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে দেবে; যেমন, জ্ঞানের পরিধি বাড়াবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে, ইত্যাদি।
- কেউবা মাযার যিয়ারাহ্ করে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, আল্লাহ্ কামিল লোকদের ওহিলায় তার দোয়া কবুল করবেন, অথবা বূজুর্গ লোকদের ওহিলায় দোয়ার ফল তাড়াতাড়ি লাভ হবে। এরা বূজুর্গদের ওহিলা করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনেক প্রকার ইবাদাহ্ করে থাকে।
- অবশেষে, কিছু লোকের মনে বিশ্বাসই জন্মে যায় যে, বূজুর্গ লোকদেরকে আল্লাহ্ সম্ভান-সম্মতি দান করার, অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা দান করেছেন। ফলশ্রুতিতে, ক্বাবরস্থ ব্যক্তিকে খুশী করার জন্য সরাসরি তাদের (ক্বাবরবাসীদের) পূজা শুরু করে, যাতে তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

মূলতঃ ক্বাবর পূজার অর্থই ক্বাবরবাসীকে ভালোবাসা, ভয়করা এবং ক্বাবরবাসী থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। মানুষের মনে যদি একবার বিশ্বাস জন্মে যায় যে, ক্বাবরবাসীরা নিয়ামত দান করতে পারে, বিপদ

থেকে উদ্ধার করতে পারে, তবে ক্বাবর-পূজায় মানুষ এমন মশগুল হয়ে যায় যে, তখন তারা আল্লাহর ইবাদাহ্ আর সৃষ্টির পূজায় পার্থক্য করতে পারে না; ফলশ্রুতিতে, তারা ক্ববর পূজায় আসক্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানে সিজদা, তাওয়াফ এবং যবেহ্ করা শুরু করে দেয়।

সুফীবাদ, মাযার পূজা এবং পীর পূজা

সুফী মতবাদ মুসলমানদের মাঝে মাযার-পূজা, পীর-পূজা বিস্তারের জন্য বহুলাংশে দায়ী। পীরগণ তাদের শিক্ষায় নিজেদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও মৃত শাইখদের সম্পর্কে অবাস্তব অতিরঞ্জন বর্ণনা করে থাকেন। তাঁরা দাবী করেন যে, তাঁদের শাইখরা আল্লাহ্ থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করেন; মৃত্যুর পরও সুফী শাইখরা গুনতে, দেখতে এবং জীবিতদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। পীরগণ ক্বাবরস্থ তাঁদের শাইখদের ওহিলায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দোয়া করেন, এবং প্রচার করেন, মাযারে ইবাদাহ্ করা আল্লাহর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য।

যেহেতু, দেওবন্দিগণ সুফী মতবাদে বিশ্বাসী, তাই উপরোক্ত বিশ্বাসগুলিতে উদ্ধুদ্ধকরণে তাদের ভূমিকা পুরোপুরি পালন করে। সত্য বলতে কি, “ফাজায়েলে আ’মাল” নামক যে গ্রন্থটি তাবলীগ জামা’আতের নির্দেশ-পুস্তিকা, তা সুফী মতবাদ বিস্তারে বিরাট সহায়কের ভূমিকা পালনকারী হিসেবে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে! ধর্মীয় কার্যাবলীর ছত্রছায়ায় পাঠকদের কাছে সন্যাসবাদ, আহারে-বিহারে সংযমের অতিরঞ্জন, বিদ’আহর প্রচলন, শাইখদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, মাযার থেকে নিয়ামত লাভ, এই সুফী মতবাদগুলোর সবই তুলে ধরেছে সংগোপনে। এই সমস্ত বিশ্বাসের প্রায় সবগুলিই একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারে। অথচ, অগণিত লোক সেগুলিও পূরণ ক্বাবরবাসীদের দ্বারা সম্ভব বলে অতীব আশাবাদী হয়ে পড়েন।

মাযারের প্রতি অতিভক্তি অতীত জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে :

“নিশ্চয়ই, আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, এক আল্লাহর ইবাদাহ্ কর এবং তাগুতের ইবাদাহ্ থেকে দূরে থাক।”^{১৮১}

পরম দয়ালু আল্লাহ্ প্রতিটি জাতির হিদায়াহর জন্য তাওহীদের সত্যবাণী দিয়ে নাবী - রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা (নাবী-রাসুলগণ) তাঁদের জাতিকে শিক্ পরিত্যাগ করে

১৮১। সূরাহ্ আন-নাহল (১৬ : ৩৬)।

পূর্বকৃত পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসতে বলেছেন। যাহোক, সময়ের পরিক্রমায় মানুষ নাবী - রাসুলদের শিক্ষায় পরিবর্তন এনেছে বা হারিয়ে ফেলেছে; তখন আস্তে আস্তে শির্ক মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। শয়তান মানুষকে যে সকল পথে কৃতকার্যতার সাথে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, তারমধ্যে ধর্মপরায়ণ মানুষদের প্রতি অতিভক্তি, তাদের কার্য-কলাপের অতিরঞ্জন অন্যতম। শয়তান কৌশলে মানুষদেরকে ধর্মপরায়ণ লোকদের স্মৃতিচিহ্ন ও মূর্তি বানাবার অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং পরে তাদেরকে মৃতদের মূর্তিপূজায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিখ্যাত সাহাবী, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর চাচাতো ভাই, কুর'আন বিশারদ, মুফাছিরে কুর'আন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)^{১৮২} “তারা বললো, তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করবে না, ছাড়বেনা অদ্দা এবং সুওয়াকে। ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ও নয়”^{১৮৩} - এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, ‘নুহ (আঃ) এর কওমে যে সকল মূর্তির প্রচলন ছিল, পরবর্তী সময়ে, তা আরবদের মাঝেও চালু হয়েছিল। ‘অদ্দা’ ছিল কালব গোত্রের দেবমূর্তি। দাওমাতুল জান্দাল নামক স্থানে এর মন্দির ছিল। ‘সুওয়া’ ছিল মক্কার নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের দেবমূর্তি। ‘ইয়াগুস’ প্রথমে ছিল মুদার গোত্রের এবং পরে (মুদারের শাখা গোত্র) বনি গাতিফ গোত্রের দেবতা। এর মন্দির সা'বার নিকটবর্তী জাওফ নামক স্থানে ছিল। ‘ইয়াউক’ ছিল হামদান গোত্রের দেবমূর্তি, আর ‘নসর’ যুলকালা হিমইয়ার শাখার দেবমূর্তি। ‘নসর’ কওমে নুহের কিছু সৎলোকের নামও ছিল। এই লোকগুলো মারা গেলে, তাঁরা যেখানে বসে মজলিস করত, শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করতঃ তাদের কওমের লোকদের মনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করলো। সুতরাং, তারা নিজেরাও কিছু মূর্তি তৈরী করে সেখানে স্থাপন করলো। কিন্তু, তখন ও এসব মূর্তির পূজা করা হতোনা। পরে, ঐ লোকগুলি মারা গেলে এবং মূর্তিগুলি সম্পর্কে মূল ব্যাপারটি বিস্মৃত হলে, পরবর্তী লোকজন ঐগুলির পূজা শুরু করে দেয়”^{১৮৪}।

ইবনে জারীর আত-তাবারী (বিখ্যাত তাফসীর আত-তাবারীর প্রণেতা) তে মুজাহিদ কৃত নিম্ন লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন- “এখন বলতো, তোমরা কি

১৮২। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সাহাবা (রাঃ) গণের মধ্যে কুর'আনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ ছিলেন। কোন এক সময় রাসুল (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) - কে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘হে আব্দুল্লাহ! তাকে ধর্মের গভীর জ্ঞান দান কর এবং তাফসীর (কুর'আনের ব্যাখ্যা) পারদর্শী কর।’ সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ৪র্থ খন্ড, নং : ৬০৫৫; {ইবনে আব্বাস (রাঃ) যুবক হওয়া সত্ত্বেও, রাসুল (সাঃ) তাকে উপাধী দিয়েছিলেন ‘তারজুমানুল কুর'আন’ (কুর'আনের ব্যাখ্যাকার), সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ১ম খন্ড, নং : ৭৫ এবং ৫ম খন্ড, নং : ১০০-১০১}।

১৮৩। সুরাহ নুহ ৭১ : ২৩।

১৮৪। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪১৪-৪১৫, নং ৪৪২। আরও দেখুন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ কৃত ‘কিতাবুল ওয়াসীলা’।

এই ‘লাত’, এই ‘উজ্জা’ এবং তৃতীয় আর একটি দেবী ‘মানাত’-এর অন্তর্নিহিত প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে কখনও কিছু চিন্তা-গবেষণা করেছো?^{১৮৫, ১৮৬}। “সে (লা’ত) সিওয়াব্ব (বার্লির মিহি ময়দা, অথবা গমের সাথে ঘি ও পানি মিশিয়ে তৈরী করা এক ধরণের সুস্বাদু খাবার) তৈরী করে হাজীদের মাঝে বিতরণ করতো। তার মৃত্যুর পরে লোকেরা পুরস্কারের আশায় তার ক্বাবরে অবস্থান করা শুরু করে দিল^{১৮৭}।” ইবনে আবি হাতিম (রাঃ) কর্তৃক কথিত একটি কাহিনী, ইমাম ইবনে কাসীর (রাঃ) ক্বাসাসুল আখিয়াতে বর্ণনা করেছেন, “ওয়াদাহ একজন পুণ্যবান লোক ছিল এবং লোকেরা তাকে খুব ভালোবাসতো। যখন সে ইন্তিকাল করলো, তারা তাদের ঘর বাড়ী ছেড়ে বেবিলনিয়ায় তার ক্বাবরের নিকট আশ্রয় নিলো এবং তারা শোকে মুহমান হয়ে গেলো। তাঁর (ওয়াদাহ) মৃত্যুতে তাদের দুঃখ দেখে ইবলিস (শয়তান) মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে বললো, ‘এই লোকের (ওয়াদাহ) মৃত্যুতে তোমাদের কষ্ট আমি দেখেছি; আমি কি তার একটা মূর্তি বানিয়ে তোমাদের মিলনস্থলে স্থাপন করতে পারি, যাতে তোমরা তাকে স্মরণ করতে পার?’ তারা বললো, ‘হ্যাঁ তা পারো।’ সুতরাং, সে (শয়তান) তাঁর (ওয়াদাহ) আকৃতিতে একটা মূর্তি তৈরী করলো। তারা এটাকে (মূর্তি) তাদের মিলন স্থলে রাখলো, যেন তারা তাঁকে (ওয়াদাহ) স্মরণে রাখতে পারে। ইবলিস যখন দেখলো, তারা তাকে (ওয়াদাহ) স্মৃতিতে রাখার জন্য খুব উৎসুক, সে (ইবলিস) বললো, ‘আমি কি তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে একটি করে মূর্তি বানিয়ে দেব, যাতে প্রত্যেকের বাড়ীতেই সে থাকে এবং তোমরা স্মরণ রাখতে পারো?’ তারা রাবী হলো। তারা যা করেছিলো, তাদের ছেলে-মেয়েরা ও তা দেখলো। তারাও তাঁর স্মরণের নিয়ম-কানুন শিখলো, তাঁকে দেবতা বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর পূজা শুরু করে দিল। সুতরাং, আল্লাহর পরিবর্তে আগে ‘ওয়াদাহ’ পূজা করতে হবে, এভাবেই এই মূর্তির নাম ‘ওয়াদাহ’ দেয়া হলো^{১৮৮}।

এথেকে বুঝা যায়, পুণ্যবানদের প্রতি ভালবাসার অতিরঞ্জন আসলে, তাদের ক্বাবরের প্রতি অতিভক্তি করায় প্রলুব্ধ করে, ফলে মূর্তিপূজার প্রথম ধাপের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

মৃত্যু, রুহু, ক্বাবর এবং বারযাখ- ইসলামি চিন্তাধারা :

মৃত্যুঃ- পৃথিবীর সৎ-অসৎ প্রতিটি মানুষকে নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

১৮৫। ‘লাত’ ও ‘উজ্জা’ দুইজন পুণ্যবান ব্যক্তির মূর্তি।

১৮৬। সূরাহু আন-না’জম (৫৩ : ১৯-২০)।

১৮৭। শাইখু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব কৃত ‘কিতাব আত-তাওহীদ’ (ইংরেজী অনুবাদ) পৃঃ ৮৬।

১৮৮। নাবীদের কাহিনী (ক্বাসাসুল আখিয়া), (ইং অনুঃ, পৃঃ ৩৯)।

কুর'আনে আল্লাহ বলেন, “প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।”^{১৮৯} আল্লাহ কুর'আনের অন্যত্র বলেন, “আর {হে মুহাম্মাদ (সাঃ)!} চিরন্তন জীবনতো তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্যই আমরা সাব্যস্ত করে দেইনি। সূত্রাং, তোমার মৃত্যু হলে, তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? প্রত্যেক জীবন্ত সত্ত্বাকেই মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করতে হবে।”^{১৯০}

রুহ ৪- রুহ আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। রুহ মানুষের ভিতর যতদিন থাকে ততদিনই মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। মানুষকে জীবিত রাখে। রুহ যখন যে মানুষকে ছেড়ে চলে যায়, তখনই তার মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ রুহ সম্পর্কে কুর'আনে বলেন, “এই লোকেরা তোমাকে ‘রুহ’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, ‘রুহ’ আমার রাব্বের আদেশ মাত্র। কিন্তু, তোমরা সঠিক জ্ঞানের সামান্য অংশই পেয়েছো।”^{১৯১}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর রুহ কি সর্বত্র বিরাজমান? :

কিছুলোক বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর রুহ সর্বত্র বিরাজমান। বিখ্যাত হানাফী ধর্মতত্ত্ববিদ মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর রুহ প্রত্যেক মুসলমানের ঘরেই উপস্থিত থাকে।’^{১৯২}

এটি একটি ভ্রমাত্মক মতবাদ বা প্রমাদ; কারণ, মৃত্যুর পর প্রতিটি ধর্মপরায়ণ মানুষের রুহের বাসস্থান হলো বেহেশত। নিম্নোলিখিত হাদীসটি তার প্রমাণ- কা'আব ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন - ‘ইমানদারগণের রুহ আল্লাহ কর্তৃক পুনরুত্থান দিবসে তার দেহে পুনঃ প্রতিস্থাপন করার আগ পর্যন্ত পাখী হয়ে বেহেশতের ফল-মূল খেয়ে বেঁচে থাকবে’^{১৯৩}।’

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নাবী (সাঃ)এর রোগ যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলো, তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন। তখন ফাতিমা (রাঃ) বললেন, আহা! আমার পিতা কত কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি (নাবী সাঃ) বললেন- ‘তোমার পিতার উপর আজকের পরে আর কোন কষ্ট হবে না’ তারপর, তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, ফাতিমা (রাঃ) এই

১৮৯। সূরা আলে-ইমরান, (৩ : ১৮৫)।

১৯০। সূরা আল-আখিয়া, (আয়াত : ৩৪ - ৩৫)।

১৯১। সূরাহ বানি ইস্রাইল, (১৭ : ৮৫)।

অনেক সূফী ভুল বিশ্বাস ধারণ করেন যে রুহ আল্লাহর অংশ। ‘আবু বক্র আল-কালাবাদী বর্ণনা করেন, ‘এটা (রুহ) কখনও সম্পূর্ণ ‘বি’তে একাকার হয়ে যায় না- (রুহ গুলো)-র কাজ শুধু জীবনের সৃষ্টি করা এবং জীবিত হওয়া, এটা তার সিক্যাত, যা জীবন সৃষ্টির কারণ; আকার প্রদান এবং সৃষ্টি করা সৃষ্টিকর্তার গুণ। (সূফীদের ক্রম বিবরণি (কিতাব আত্-তা'আররুফ লি-মাযহাব আহলে আত্-তাসাউফ) ইং অনুঃ, পৃঃ ৫০-৫১)।

এই যুক্তি মিথ্যা, যেহেতু, রুহ নিজে থেকে জীবন সৃষ্টি করতে পারে না, এটা একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি; এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করা ভ্রষ্টাচার,তথা শিরক।

১৯২। নাহিম আর-রিয়াদ ফি শারাহ শিফা'আ ক্বাদি আইয়াজ (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬)।

১৯৩। নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং মালিক। শাইখ্ নাসিরুদ্দিন আলবানী তাঁর ‘শরহে আল-আক্বীদাহ আত্-তাহাবিয়াহ্’ কিতাবে সহীহ বলেছেন, ৪৫৫ পৃষ্ঠা এবং ১নং পাদটীকা।

বলে কাঁদতে লাগলেন, ‘হে আমার পিতা! আপনার দোয়া আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। হে আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউস আপনার স্থান। আহা, আমার পিতা! জিব্রাঈল (সাঃ) কে আমি আপনার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়ে দিই। তাঁকে দাফন করার পর ফাতিমা (রাঃ) আনাস (রাঃ)কে বললেন, ‘নাবী (সাঃ) কে মাটি চাপা দিয়ে আসাকে আপনারা কি করে সহ্য করে নিতে পারলেন?’^{১১৪}

ক্বাবরঃ- পার্থিব শরীরের মৃত্যু পরবর্তী আবাসস্থলই হল ক্বাবর। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, “নিঃসন্দেহে ইহ-জগতের পরে ক্বাবরই হলো প্রথম আবাসস্থল। এখান থেকে যদি কেউ অব্যাহতি লাভ করে, তবে পরের ধাপ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি ক্বাবর-আযাব থেকে অব্যাহতি না পায়, তবে পরবর্তী ধাপ তার জন্য অত্যন্ত কঠিন^{১১৫}।” সাধারণ মানুষের দেহ ক্বাবরে পঁচে মাটির সাথে মিশে যায়, আর নাবী-রাসূলদের দেহকে তাদের মর্যদার খাতিরে সংরক্ষিত রাখা হয়। আবার এও দেখা গেছে, কিছু শহীদ ব্যক্তির দেহ সংরক্ষিত আছে।

বারুযাখ্ঃ- সাধারণ অর্থে ‘বারুযাখ্’ হলো দুইয়ের মাঝে পরদা বা দেয়াল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বারুযাখ্কে বলেছেন, হিয়াব বা পরদা। তাফসীর বিশারদ তাবৈঈ আয্-যাহাক (রহঃ) বলেছেন, ‘বারুযাখ্ ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্তী একটি আবাসস্থল’^{১১৬}। কুরতুবী (রহঃ) এ বিষয়ে তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘বারুযাখ্ দুটি জিনিসের মাঝের দেয়াল। ইহকাল আর পরকালের মধ্যবর্তী সময়, অর্থাৎ, মৃত্যু থেকে পুনঃরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান স্থল। অতএব, যেই মৃত্যুবরণ করে, সে বারুযাখে প্রবেশ করে^{১১৭}। তা’হলে, দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাখ্যাই এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে; আর তা হলো, রুহ্ দেহ থেকে বের হয়ে এমন এক রাজ্যে প্রবেশ করে, যা এক দূর্ভেদ্য দেয়াল দিয়ে আড়াল করা এবং সেখান থেকে ফেরার আর কোনই পথ নেই।

মৃত্যু, রুহ্, ক্বাবর এবং বারুযাখ্ নিয়ে সূফীদের মাঝে অনেক অসংলগ্ন এবং সংঘাতপূর্ণ বিশ্বাস আছে। যেমন—

- কেউ দাবী করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং পূণ্যবান দরবেশরা সত্য-সত্যই সজ্ঞানে জীবিত থাকেন, যদিও তাঁদেরকে ক্বাবরস্থ করা হয়।
- কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, ক্ষণিকের জন্য তাদের মৃত্যু হয়।
- আবার কেউবা তাদের মৃত্যু হয়েছে, এটুকু বলতেও নারাজ; এবং বলেন, তাঁরা শুধুমাত্র পর্দার আড়াল হয়েছেন।

১১৪। সহীহু আল-বুখারী।

১১৫। তিরমিযী, হাদীস নং ১৩২ ও ইবনে মাজাহ্।

১১৬। তাফসীরে আল-কুরতুবী (দ্বাদশ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)।

১১৭। তাফসীরে আল-কুরতুবী (দ্বাদশ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)।

দেওবন্দিগণ আক্বীদাহুগত দিক থেকে এই কয়টি ভ্রান্ত মতবাদের সংমিশ্রণে বিশ্বাসী, যার আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হলো ।

বারুয়াখ জীবন সম্পর্কে দেওবন্দিগণের দৃষ্টিভঙ্গী :

দেওবন্দিগণ বিশ্বাস করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ক্বাবরে জীবন্ত অবস্থায় আছেন । ইহজগতে তাঁর নিকট থেকে যেরকম আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, ইত্যাদি পাওয়া গেছে; ক্বাবর থেকেও তিনি তদ্রূপ কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারেন । ফাজায়েলে আ'মাল এরকম অসংখ্য ভ্রান্ত উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ । তাঁরা দাবী করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উম্মাহুর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং যারা তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তিনি বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে তাদের সাহায্য করে থাকেন । তাঁরা আরো দাবী করেন যে, তিনি দেওবন্দি আলিমগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং দেওবন্দিগণের থেকে তিনি উর্দুতে কথা বলা শিখেছেন^{১১৮} ।

এ ছাড়াও, দেওবন্দিগণ উপরোক্ত গুণাবলী তাদের মৃত শাইখ এবং আলিমগণের প্রতিও আরোপ করেন, যা তাদের বই গুলিতে উল্লেখ করেছেন । দেওবন্দিগণের দল এবং তাবলীগ জামা'আতের কর্মীদের তাওহীদ সম্পর্কে দুর্বল জ্ঞান, ব্যাপক আক্বীদাহুগত ভুল ধারণার জন্যই তাদের মধ্যে এই সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে । ইনশা'আল্লাহ, এগুলো একে একে বিশ্লেষিত হবে ।

দেওবন্দিগণের দৃষ্টিভঙ্গি-১ : প্রকৃত ঈমানদারগণের মৃত্যু নেই :

মাওলানা যাকারিয়া ফাজায়েলে আ'মালে লিখেছেন :

১ । “শাইখ আবু ইয়াকুব সানুসি বলেন, একদা আমার এক শিষ্য এসে আমাকে বলল, ‘আমি কাল অপরাহ্নে মারা যাব ।’ পরদিন লোকটি মাসুজীদুল হারামে এসে জোহর সলাহ আদায় করে পবিত্র কাবার তাওয়াফ শেষ করে ওখান থেকে একটু দূরে গিয়ে দেহান্তরিত হলো । আমি তার গোসল দিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করলাম । আমি যখন তাঁকে গোড়ে নামালাম, সে চোখ মেলে তাঁকালো । আমি বিস্ময়াভিভূত

১১৮ । রাশীদ আহমেদ গাসোহী আল-বারাহি আল-কাতিয়াহুতে দেওবন্দ মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে লিখেছেন । তিনি বলেন, “আমার মনে হয় দেওবন্দ মাদ্রাসা আশ্চর্যের নিকট অত্যন্ত প্রশংসিত অবস্থানে রয়েছে । কারণ, বহু আলিম এখান থেকে পাশ করেছে এবং সাধারণ লোক তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে । পরবর্তীতে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখার মাধ্যমে এক মহান ব্যক্তি আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, সে সময় তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে উর্দুতে কথা বলতে শুনেছেন । এই মহান ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, ‘আপনি আরব দেশীয় লোক হয়ে উর্দু কি করে লিখলেন?’ তিনি (সাঃ) বললেন, ‘যখন থেকে দেওবন্দি আলিমগণের সাথে আমার যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে, তখন থেকেই আমি এই ভাষা জানি ।’ রাশীদ আহমেদ গাসোহী মন্তব্য করেন, ‘এথেকে আমরা এই মাদ্রাসার গুরুত্ব বুঝতে পারি ।’ (আল-বারাহি আল-কাতিয়াহু, পৃঃ ৩০) ।

হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মৃত্যুর পরেও কি জীবন আছে?’ সে উত্তর দিল ‘আমি জীবিত, এবং যারা আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক, তারা কখনও মরে না।’^{১৯৯}

২। আবু আলী রাদবারী বলেন, একদা এক ছিন্নবস্ত্র পরিহিত গরীব লোক ঈদের দিনে এসে আমাকে বললো, ‘এখানে কোথাও কি একটু পুতঃ পবিত্র জায়গা আছে, যেখানে আমার মত অভাগা প্রাণত্যাগ করতে পারে?’ আমার মনে হলো, সে হুঁশে নেই; তাই নির্লিপ্ত ভাবে বললাম, ‘এসো, যেখানে পছন্দ শুয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ কর।’ ভিতরে এসে সে গোসল করলো, কয়েক রাকাত নামায পড়লো, তারপর মাটিতে শুয়ে মৃত্যু বরণ করলো। আমি তাকে গোসল দিলাম, কাফনের কাপড় পরালাম এবং দাফনের ব্যবস্থা করলাম। কবরে নামাবার আগে আমি তার মুখের কাপড় উন্মুক্ত করে শেষবার দেখার ইচ্ছা করলাম, তখনই সে চোখ মেলে চাইলো। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, ‘মৃত্যুর পরেও কি জীবন আছে?’ সে উত্তর দিল, ‘আমি জীবিত এবং যারা আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক তারা কখনও মরেনা। ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য হাশরের দিনে শাফায়াত করব, যার ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন’^{২০০}।’ ৩। আবু সাঈদ খাজ্জাজ বলেন, কোন এক সময় তিনি মক্কায় অবস্থিত ছিলেন। একদিন তিনি বাব-ই-শাইবাহ (একটি দরজা) দিয়ে বের হয়ে দেখলেন, একজন সুদর্শন লোক মরে মাটিতে পড়ে রয়েছে। তিনি লোকটির দিকে চেয়ে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এজন্য যে, সে তার (খাজ্জাজের) দিকে চেয়ে হেসে বলছে, ‘হে আবু সাঈদ, তুমি কি জান না, যারা আল্লাহর বন্ধু (যারা আল্লাহকে প্রকৃতই ভালবাসে) তারা মরে না, শুধু এক জগৎ থেকে অন্য জগতে পদার্পণ করে’^{২০১}।

৪। এক বৃজুর্গ ব্যক্তি বলেন, ‘এক মৃত শিষ্যের গোসল দেয়ার সময় আমার পায়ের আংগুল চেপে ধরলো। আমি বললাম, জানি তুমি মরনি, এটা শুধু এক জায়গা থেকে

১৯৯। ফাজায়েল-ই-আ’মালের (ইংরেজী অনুঃ) ফাজায়েল সাদাকাহ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৫৯৯ পৃষ্ঠা, দক্ষিণ আফ্রিকান ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হিঃ- ১৯৯৩ সন, ওয়াটরভাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত।
ফাজায়েল আ’মাল, (হিন্দী অনুবাদ), ফাজায়েল সাদাকাহ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭০২ (ইদারা ইশা’হ দীনিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, (১৯৮৪)।

২০০। ফাজায়েল-ই-আ’মালের (ইংরেজী অনুঃ) ফাজায়েল সাদাকাহ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৬০৯ পৃষ্ঠা, দক্ষিণ আফ্রিকান ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হিঃ-১৯৯৩ সন, ওয়াটরভাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত।
ফাজায়েল-ই-আ’মাল, (হিন্দী অনুবাদ), ফাজায়েল সাদাকাহ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃঃ-৭১২ (ইদারা ইশা’হ দীনিয়াহ, প্রথম সংস্করণ (১৯৮৪)।

২০১। ফাজায়েল আ’মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েল সাদাকাহ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৬১০ পৃষ্ঠা, (দক্ষিণ আফ্রিকান ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হিঃ- ১৯৯৩ সন, ওয়াটরভাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত।

অন্য জায়গায় স্থানান্তর মাত্র। আমার পায়ের আংগুল ছেড়ে দাও। সে আমার পায়ের আংগুল ছেড়ে দিল^{২০২}।

৫। ইবনুল যাল্লা'আ নামে এক বিখ্যাত সুফী শায়খ বলেন, 'আমার পিতা মারা যাওয়ার পর, যখন তাকে গোসল দেয়ার জন্য কাঠের একটি তক্তায় রাখা হলো, তিনি (আমার পিতা) হাসতে লাগলেন। যারা তাকে গোসল দিতে এসেছিল, মৃত লোকের হাসি দেখে ভয়ে পালিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে আমার পিতার এক বন্ধু এসে তাকে গোসল দিলেন^{২০৩}।'

প্রতিবাদ

মৃত্যু সবাইকে ছুঁবে, এমন কি নাবী-রাসুলগণকেও :

মৃত্যু কোন অভাবিত বিষয় নয়, এমনকি, নাবী-রাসুলগণের জন্যও। একমাত্র ঈসা (আঃ) ছাড়া সমস্ত নাবী-রাসুলগণ মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বলেন, "আর [হে মুহাম্মদ সাঃ!] চিরন্তন জীবন তো আমরা তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্য সাব্যস্ত করে দেইনি। তুমি যদি মৃত্যু বরণ কর, তবে এই লোকেরা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে? প্রত্যেক জীবন্ত সত্ত্বাকেই মৃত্যুর স্বাদ আন্বাদন করতে হবে^{২০৪}।"

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) যখন ইত্তিকাল করলেন, তখন আবু বাক্র (রাঃ) (স্বীয় বাসস্থান) সুনহায় ছিলেন। বর্ণনাকারী ইসমাইল বলেন, 'সুনহা' মদীনার উচ্চ এলাকায় অবস্থিত একটি স্থানের নাম। (ইত্তিকালের সংবাদ পাওয়া মাত্র) উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম! নাবী (সাঃ) ইত্তিকাল করেননি'। ইতিমধ্যে আবু বাক্র (রাঃ) এসে পৌঁছে গেলেন এবং নাবী (সাঃ)এর মুখের আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুম্বন করলেন। তারপর বললেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, জীবনে-মরণে আপনি পাক-পবিত্র। সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ আপনাকে দুই মৃত্যুর স্বাদ কখনও গ্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বাইরে এসে উমার (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে কসমকারী! ধামো, ধৈর্যবলম্বন কর (হে-হুদ্রোড় করোনা)'। আবু বাক্র (রাঃ) এর কথা শুনে উমার (রাঃ) বসে পড়লেন। তারপর,

২০২। ফাজায়েল আ'মাল (হিন্দী অনুবাদ) ফাজায়েল সাদাকাহ্, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৭০২ পৃষ্ঠা, (ইদারা ইশা'হ দ্বীনিয়াহ্ প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪ সন।

২০৩। ফাজায়েল আ'মাল, (ইং অনুঃ) ফাজায়েল সাদাকাহ্, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৫৯৯ পৃষ্ঠা, (দক্ষিণ আফ্রিকান ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হিঃ- ১৯৯৩ সন, ওয়াটসনজাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত। ফাজায়েল আ'মাল, (হিন্দী অনুবাদ), ফাজায়েল সাদাকাহ্, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭০২ (ইদারা ইশা'হ দ্বীনিয়াহ্, প্রথম সংস্করণ, (১৯৮৪)।

২০৪। সূরাহ্ আখিয়া (আয়াত : ৩৪-৩৫)।

আবু বাকর (রাঃ) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, ‘যারা মুহাম্মদ (সাঃ)এর উপাসনাকারী, তারা জেনে নাও যে, মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তিকাল করেছেন, আর যারা আল্লাহর ইবাদাহ করছে (তারা নিশ্চিত থাক যে), নিশ্চয়ই, (তাদের) আল্লাহ চিরজীব, তাঁর কখনও মৃত্যু নেই। তিনি কুর’আন থেকে তিলাওয়াত করলেন, “মুহাম্মদ (সাঃ) একজন রাসুল বৈ তো আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে অনেক নাবী-রাসুল (দুনিয়া হতে) বিদায় নিয়েছেন। যদি তিনি ইন্তিকাল করেন, কিংবা, তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি অতীতের (বর্বরতার) দিকে ফিরে যাবে? যারা অতীতের (বর্বরতার) দিকে ফিরে যাবে, তারা (নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে) আল্লাহর এতটুকুমাত্র ক্ষতি করতে পারবেনা। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে (উত্তম) প্রতিদান দেবেন^{২০৫}।” বর্ণনাকারী ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আবু বাকর (রাঃ) এর কথা শুনে লোকগণ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। উমার (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আবু বাকর (রাঃ) এর কথা শুনে এমন ভাবে আমি মাটিতে বসে পড়লাম, যেন আমার দু’পা আর আমাকে বইতে পারছে না। তখনই মাত্র আমার বোধোদয় হলো যে, সত্যই মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তিকাল করেছেন’^{২০৬}।

যেহেতু, নাবী-রাসুলগণের ইন্তিকাল অবধারিত; সেহেতু, ধার্মিক-দরবেশদের ব্যাপারে এর অন্যথা হওয়ার কোন প্রশ্নই আসেনা। আল্লাহ কুর’আনে বলেন, “প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ আন্বাদন করতে হবে^{২০৭}”। যদি বিশ্বাস করা হয়, সুফী-সাধকরা ইন্তিকাল করেননা, তবে কি তাঁদেরকে নাবী-রাসুলদের উপরে স্থান দেয়া হয়না? (নাউযবিলাহ) তাছাড়া, জীবিত মানুষকে দাফন করা মহাপাপ। আল্লাহ বলেন, “যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে (হাশরের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে, সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল?^{২০৮}”

সন্দেহের নিরসন

সন্দেহ (১) - রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ক্বাবর থেকেও সালামের জওয়াব দান করেন :

যারা মনে করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ক্বাবরেও ইহজগতের মতই জীবন-যাপন করেন এবং ক্বাবর থেকেই তাঁর উম্মাহর সব রকম ইহজাগতিক উপকার করতে পারেন, এর

২০৫। সূরাহ আল-ইমরান, (আয়াত ১৪৪)।

২০৬। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ৫ম খন্ড, নং ৭৩৩। আরো দেখুন আবু-রাহীক আল-মাখতুম (ইং অনুঃ) পৃঃ ৪৮০-৪৮১।

২০৭। সূরাহ আল-ইমরান, (৩ঃ ১৮৫)।

২০৮। সূরাহ তাক্বীর, (৮১ঃ ৯)।

লক্ষ্যে তারা নিম্ন লিখিত হাদীস দু'টি উল্লেখ করে থাকেন—

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘মৃত কেউই সালামের উত্তর দিতে সক্ষম নয়, একমাত্র আমাকেই আল্লাহ তা’য়ালা সালামের উত্তর দেয়ার জন্য আমার রুহকে ফিরিয়ে দেন’^{২০৯} ।’

‘নাবী-রাসুলগণ জীবিত এবং তাঁদের ক্বাবরে তাঁরা ইবাদাহ করেন’^{২১০} ।’

উত্তর :

এই হাদীসগুলো বারুযাখ্ জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, ইহজগত সম্পর্কে নয় :-

১। বারুযাখের জীবন ইহজগত থেকে ভিন্ন। আল্লাহ বলেন, “আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলোনা, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু, তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অবগত নও”^{২১১} ।” আমরা বারুযাখ্ জীবন সম্পর্কে অবগত নই; কারণ, বারুযাখের জীবন পার্থিব জীবন থেকে আলাদা।

২। ইহজাগতিক জীবনে যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সালামের জওয়াব দিতেন, তা উপস্থিত সকলেই শুনতে পেত। আর তাঁর ক্বাবরের জীবনের অবস্থা সেরকম নয়। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসে উল্লেখিত পূর্ণজীবন পাওয়া এবং সালামের জওয়াব দেয়া, বারুযাখ্ জীবনের জন্যই প্রযোজ্য।

৩। হাদীস ‘নাবী-রাসুলগণ জীবিত এবং তাঁদের ক্বাবরে তাঁরা ইবাদাহ করেন’, হাদীস বিশারদদের মতে— এর সত্যতা বিতর্কিত। যাহোক, ‘জীবন’ এবং ‘ইবাদাহ’ যা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বারুযাখ্ জীবনের জন্য প্রযোজ্য।

৪। আল্লাহর রাসুল (সাঃ)র জীবিতকালে সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)র উপস্থিতিতে মাস্জিদে নব্বীতে অন্য কাউকেই ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন নি। একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)র অনুপস্থিতিতে আবু বাক্র (রাঃ) কে সালাহর ইমামতি করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পরে এসে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে যান।

অন্যান্য সাহাবীগণ রাসুল (সাঃ) এর উপস্থিতি আবু বাক্র (রাঃ) কে জানাবার জন্য হাততালি দিতে শুরু করেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আবু বাক্র (রাঃ) কে ইমামের জায়গায় থাকতে ইশারা করলেন; কিন্তু, আবু বাক্র (রাঃ) দু’হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ফিরে এসে প্রথম সারিতে দাঁড়ালেন এজন্য যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেন সালাহর ইমামতি করতে পারেন। সালাহ আদায়ের পর আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘হে আবু বাক্র! আমার আদেশের পরেও কিসে তোমাকে তোমার জায়গায় থাকতে বাধা দিল?’ আবু বাক্র (রাঃ) বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর

২০৯। সুনানে আবু দাউদ, শায়ইখ আলবানী তাঁর আস্-সহীহাতে হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

২১০। এই হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক থেকে আবু ইয়্যাহা এবং আল-বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী আল-মিয়ানে হাদীসটিকে মুন্কার বলেছেন। কারণ, এর সনদে হাজ্জাজ নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যে মুন্কার বর্ণনাকারী। ইবনে হাজার বলেন, হাজ্জাজ বিন আবি জিয়াদ আল-আসওয়াদ সেকা। এই হাদীসটি শাইখু আলবানী তার সিলসিলাতুল আহাদীস-আস্-সহীহাতে উল্লেখ করেছেন।

২১১। সূরাহ বাকারাহ, (২ঃ ১৫৪)।

উপস্থিতিতে ইবনে আবু কুহা'ফার পুত্রের সালাহুর ইমামতি করা শোভা পায় না^{২১২}। কিন্তু, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ইন্তিকালের পর, সাহাবীগণ মাসজিদে নব্বীতে অন্য ইমামের পিছনে সালাহু আদায় করেছেন। যদি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর ক্বাবরে জীবিত থাকেন, যেমন দাফনের আগে জীবিত ছিলেন, তা'হলে, উম্মাহ সম্পর্কে সতর্ক, ক্বাবরে ইবাদাহকারী এবং জীবিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর পরিবর্তে অন্য ইমামেরতো কোন প্রয়োজনীয়তা নেই!

সন্দেহ (২)- কুর'আন শহীদদেরকে জীবিত বলে উপস্থাপন করেছে :

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন সূরাহ বাক্বারায় বলেছেন, “আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলোনা, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু, তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অবগত নও^{২১৩}।” সুফীরা দাবী করেন, তাদের শাইখরাও আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করে, কাজেই তারাও শহীদ, এবং মৃত্যুর পরেও তারা অন্যকে সাহায্য করতে পারে, যেমন তারা জীবিতাবস্থায় মানুষকে সাহায্য করতো। ইমদাদুস্ সুলুক গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় এক গল্পে বলা হয়েছে, “একদা কাশ্ফের ক্ষমতা সম্পন্ন এক ব্যক্তি হযরত হাজী সাহেবের (ধামিন) মাযারে ফাহিতা পাঠ করতে গিয়েছিলেন। কাশ্ফের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি যখন ফাহিতা পাঠ শুরু করেন, ক্বাবর থেকে হাজী সাহেব বললেন, যাও এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ফাহিতা পাঠ কর। এখানে তুমি এক জীবিত ব্যক্তির জন্য ফাহিতা পাঠ করতে এসেছো। ফাহিতা পাঠ শেষে কাশ্ফধারী লোকমুখে জানতে পারেন যে, এটা এক শহীদ ব্যক্তির ক্বাবর^{২১৪}।”

উত্তর :

সূরাহ বাক্বারার এই আয়াতে আল্লাহ যারা ধর্মকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদেরকে শহীদ ও জীবিত বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মাসরুক্ক-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, আমরা আব্দুল্লাহ (রাঃ)কে কুর'আনের এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করোনা। তারাতো প্রকৃতপক্ষে জীবিত এবং তারা তাদের রাব্বের নিকট থেকে রিয়ুক পাচ্ছে^{২১৫}।”

২১২। সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম।

২১৩। সূরাহ বাক্বারা (২ঃ ১৫৪)।

২১৪। ইমদাদুস্-সুলুক, (উর্দু) পৃঃ ২৭, কাহিনী নং ৩। এখন বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায় ‘ইরশাদুল মূলক’ নামে এবং ইংরেজী অনুবাদের ১৯ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে ১ নং উপাখ্যানে।

২১৫। সূরাহ আল- ইমরান, (৩ঃ ১৬৯)।

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেছেন, ‘আব্দুল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে এই আয়াতের অর্থ জানতে চেয়েছিলাম, তিনি বলেছেন, ‘শহীদদের রুহ সবুজ পাখীর আকৃতিতে জীবন্ত আছে এবং সর্বশক্তিমান আব্দুল্লাহ তা‘আলার কুবরীর দীপাধারের সাথে তাদের বাসা। বেহেশতের যথা ইচ্ছা তথায় তারা বিচরণ করে এবং ফল-মূল খায়, আবার তাদের বাসায় ফিরে আসে। একদা আব্দুল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, “তোমরা আরো কিছু চাও?” তারা বললো, “আর বেশী কি আমরা চাইতে পারি? আমরা বেহেশতের যথা ইচ্ছা তথায় ঘুরে-ঘুরে ফল খেতে পারি।” আব্দুল্লাহ রাক্বুল আ‘লামিন একই প্রশ্ন তিনবার করলেন। যখন তারা বুঝতে পারলো, উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এই প্রশ্ন বার বার করা হবে, তখন তারা বললো, ‘আব্দুল্লাহ আমাদের রুহকে আমাদের দেহে আবার ফিরিয়ে দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও, যেন তোমার রাস্তায় আবার শহীদ হতে পারি’। তখন আব্দুল্লাহ দেখলেন, তার আর কোন প্রয়োজন নেই। তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই রাখা হলো (বেহেশতের আনন্দে)^{২১৬}।

এই হাদীসের আলোকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, মৃত্যুর পর শহীদ ব্যক্তির যে অবস্থায় বসবাস করে, তা পার্থিব জীবন থেকে ভিন্ন। তাদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনটাই বার্মা জীবন, যা তাদেরকে পার্থিব জীবনের সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অতএব, শরীয়তের নির্দেশ এই যে-

- ১। শহীদ ব্যক্তিদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাদের ওয়ারিশদের মাঝে বন্টিত হবে।
- ২। শহীদ ব্যক্তিদের জীরা তাদের স্বামীদের জন্য চার মাস দশদিন শোক পালন করবে^{২১৭}।
- ৩। ইদ্দত (মেয়াদকাল) পূর্ণ হওয়ার পর শহীদ ব্যক্তিদের জীগণ বিবাহের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে^{২১৮}।

২১৬। সহীহ মুসলিম নং ৪৬৫১, সুনানে তিরমিযী নং ১৬৩১, সুনানে ইবন মাজাহ, বায়হাক্বী (কিতাব আল-বাসওয়ান-নুত্তর)।

২১৭। উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত- ‘রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ‘কোন স্ত্রীলোক কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিনের বেশী শোক করতে পারবেনা। শুধু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। শোক পালনের মেয়াদকালে রংগীন কাপড় পরিধান করতে পারবেনা। শুধু রংগীন সুতার তৈরী বিশেষ এক রকমের কাপড় পরতে পারবে। সামান্য কষ্টস বা আয়ফার ব্যতীত অন্য কোন সুগন্ধি, সুরমা বা কাজল ব্যবহার করতে পারবেনা’। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

২১৮। উম্মে সালামা বর্ণনা করেন, ‘যখন আবু সালামা ইত্তিকাল করেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে বললাম, ‘হে আব্দুল্লাহর রাসূল (সাঃ) আবু সালামা ইত্তিকাল করেছেন। তিনি আমাকে দোয়া করতে বললেন, ‘হে আব্দুল্লাহ! আমাকে এবং আবু সালামাকে মাফ করে দিন এবং তার চেয়ে আরো ভাল কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করুন।’ সুতরাং সেই দোয়াই করলাম, ফলশ্রুতিতে আব্দুল্লাহ আমাকে তার (আবু সালামার) পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সাঃ)কে দিলেন; যিনি আমার জন্য আবু সালামার চেয়ে উত্তম।’ (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)। ‘জাফর ইবন তাইয়ার শহীদ হওয়ার পর আবু বাক্বর (রাঃ) তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইহকে বিবাহ করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বক্বর এই স্ত্রীর ঘরেই জন্মেছিলেন’ (মিয়ান আল-ইতিদাল)।

সুতরাং, পরলোকের বিবেচনায় শহীদগণ জীবিত; কিন্তু, ইহলোকের প্রেক্ষিতে তাঁরা মৃত। আর মৃতের সৎকারে যা-যা করা দরকার, (দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) শহীদগণের বেলায় ও তা-ই করা হয়। তাই সূরাহ্ বাক্বারাহ্‌র পূর্বোক্ত (০২ঃ১৫৪) আয়াত শহীদত্বের বিরাট মর্যাদার অকাট্য দলিল; কিন্তু, তা কোনমতেই সূফীবাদের মৃত্যুর পরে ও বৃজুর্গদের পুনরায় পার্থিব জীবন প্রাপ্তির দর্শনকে সমর্থন করেনা।

দেওবন্দিগণের দৃষ্টিভঙ্গী-২: রাসুল (সাঃ) তাঁর উম্মাহ্‌র জন্য সচেতন :

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর উম্মাহ্‌র প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং তাদের প্রয়োজনে দৈহিকভাবেও সাহায্য করে থাকেন। দেওবন্দিগণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূলে ফাজায়েল আ'মালে অসংখ্য উদ্ধৃতি আছে।

মাওলানা যাকারিয়া মন্তব্য করেছেন,-

১। ‘নিঃসন্দেহে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর অপরিসীম জ্ঞান ও মর্যাদার খাতিরে এক জনের মনে ধারণা থাকা উচিত (যখন নাবী সাঃ এর ক্বাবরের সামনে দাঁড়ায়) যে, তিনি এখনও জীবিতই আছেন। কারণ, তাঁর উম্মাহ্‌র মানসিক চিন্তা-ভাবনা এবং জাগতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি সচেতন, আর তিনি পার্থিব জীবনে যেমন এসব সম্পর্কে জানতেন, এখন মৃতাবস্থায়ও তিনি সব কিছু জানেন’।^{২১৯}

২। হযরত সুলাইমান বিন সাহিম বলেন, “আমি স্বপ্নযোগে একদিন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, “হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ)! যারা আপনার ক্বাবর যিয়ারাহ্‌ এবং সালাম পেশ করে, তাদের প্রতি কি আপনি খেয়াল করেন?” পুণ্যাত্মা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমি তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারি এবং সালামের জওয়াব দিয়ে থাকি।”^{২২০}

৩। মুসা যারির নামে এক ব্যক্তি বলেন, “আমি জাহাজে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে জাহাজটি ডুবতে শুরু করে, ঐ সময় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম। এমতাবস্থায়, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে একটি দরুদ শিখিয়ে দিয়ে বললেন, জাহাজওয়ালারা এই দরুদ এক হাজারবার পড়ুক। মাত্র তিনশতবারও তাদের পড়ার

২১৯। ফাজায়েল আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল হাফ্‌ খন্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ, ১৪৮ পৃষ্ঠা, (১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত)।

২২০। ফাজায়েল আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল দরুদ, (১৯৮৫ সনের সংস্করণ, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১৯ ও ৪৬ পৃষ্ঠা, বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

সুযোগ হয়নি, জাহাজটি উদ্ধার পেয়ে যায়।^{২২১, ২২২} ৪। “একদিন এক বৃদ্ধলোক ক্বারী আবু বাক্র মুজাহিদের নিকট এসে বললো, গত রাতে আমার স্ত্রী একজন ছেলে জন্ম দিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে ঘি ও মধু আনতে বলেছে। একথা শুনে ক্বারী আবু বাক্র অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তায় পড়লো। এমতাবস্থায়, সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো এবং স্বপ্নে দেখলো, নাবী (সাঃ) তাকে (আবু বাক্রকে) উদ্দেশ্য করে বলছেন, “তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়োনা, উজির আলী ইবনে ঈমার নিকট গিয়ে আমার সালাম দেবে এবং এই সংকেতটি তাকে বলবে। সে এক হাজারবার দরুদ না পড়ে ঘুমায় না। সংকেতটি বলার পর তাকে (উজিরকে) সদ্যজন্ম দেয়া শিশুর পিতাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার জন্য বলবে”। ক্বারী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা মতই কাজ করলো এবং উজিরের নিকট থেকে বৃদ্ধ একশত স্বর্ণমুদ্রাই পেলো।^{২২৩}

প্রতিবাদ

আব্বাহুর রাসুল (সাঃ) তাঁর উম্মাহু সম্পর্কে অজ্ঞাত :

হাওজে কাউছার :

সাহল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত। আব্বাহুর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের পূর্বে হাওজের কাছে পৌঁছব। যে আমার নিকট হাজির হবে, সে (হাওজের) পানি পান করবে। আর যে (একবার) পান করবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবেনা। আমার নিকট বিভিন্ন দল উপস্থিত হবে, আমি তাদেরকে চিনতে পারবো এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর, তাদের ও আমার মাঝে আড় সৃষ্টি করে দেয়া হবে’। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি হাওজে কাউছারে তোমাদের অগ্রগামী প্রতিনিধি। তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে (আমার সম্মুখে) উপস্থিত করা হবে। তারপর, আবার তাদেরকে টানা -হেঁচড়া করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, ‘হে আমার রাক্ব!

২২১। [ফাজ্জয়েল আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজ্জয়েল দরুদ খন্ড, (১৯৮৫ সনের সংস্করণ, ৫ম পরিচ্ছেদ, ১১১ পৃষ্ঠা, ধানি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মাওলানা আশরাফ আলী খানভী লিখিত যাদু-সাইদ)।

২২২। উল্লেখ্য যে, আব্বাহু সুরা ইউনুসে অধিবাসী লোকেরা দৈহিক ও মানসিক কষ্টে পড়লে তাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা বর্ণনা করেছেন। যদিও অধিবাসীরা অতি সহজেই আব্বাহুর অংশী স্থাপন করে, কিন্তু বিশদে পড়লে শুধুমাত্র আব্বাহুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করে। কারণ, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আব্বাহুই তাদেরকে বিশদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আব্বাহু বলেন, “তিনিই আব্বাহু, যিনি তোমাদেরকে স্থূলভাষে ও জ্পভাষে পরিভ্রমণ করান। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরোহন করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্বর্জিতে সঞ্চর করতে থাক এবং সহসাই বিপরীত মুখী তীব্র হাওয়া আসে, চতুর্দিক থেকে ভরংগাঘাত এসে ধাক্কা দেয়, আর আরোহীরা মনে করে, তারা ভরংগমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজের বীনকে আব্বাহুর জন্য খালস করে তাঁরই কাছে দোওয়া করে যে, তুমি যদি এই বিশদ থেকে উদ্ধার কর, তবে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ ও শোকর-গুজার বান্দাহ হয়ে থাকব।” (সুরাহ ইউনুস, আয়াত ৪২২)।

২২৩। ফাজ্জয়েল আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজ্জয়েল দরুদ খন্ড, (১৯৮৫ সনের সংস্করণ, পঞ্চম অধ্যায়, ১৩২ পৃষ্ঠা, ধানি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

এরাতো আমার উম্মাহ’। আমাকে বলা হবে, ‘তুমি জাননা যে, তোমার অবর্তমানে তারা (ধর্ম-বিরোধী) কত নতুন কাজ (বিদ্‌আহ) করেছে।’^{২২৪}

এই হাদীস দু’টি প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইত্তিকালের পর থেকে আর তাঁর উম্মাহ সম্পর্কে খোজ-খবর রাখেননা, বা তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কেও অনবহিত। শেষ বিচারের দিনে যদিও তাঁর উম্মাহর লোকদের বাহ্যিক চেহারা (অজুর চিহ্ন^{২২৫}) দেখে চিনবেন, কিন্তু, তাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে থাকবেন অজ্ঞাত।

(২) যদিও পয়গাম্ভার ঈসা (আঃ) ইত্তিকাল করেননি, তবুও, তিনি তাঁর উম্মাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত :

নাবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত ঈসা (আঃ) ইত্তিকালও করেননি বা বান্ধু^{২২৬} জীবনেও প্রবেশ করেননি। তাঁকে শুধু বেহেশতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তারপরও তিনি তাঁর উম্মাহর কার্য-কলাপ সম্পর্কে অজ্ঞাত। শেষ বিচারের দিনে যখন আল্লাহ তাঁর উম্মাহর কার্য-কলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জওয়াব দেবেন, “আমি তাদের মাঝে যতদিন হিলাম ততদিনের জন্যই আমি তাদের কার্য-কলাপের সাক্ষী”।

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ ঈসা (আঃ) কে কি প্রশ্ন করবেন, তা কুর’আনে বলেছেন, অতঃপর, আল্লাহ যখন বলবেন, ‘হে মরিয়ম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, আল্লাহ ছাড়া আমাকে এবং আমার মাকেও ইলাহ বানিয়ে নাও?’ তখন সে উত্তরে বলবে, ‘মহান ও পবিত্র আল্লাহ! এমন কোন কথা বলা আমার কাজ নয়, এ বলার আমার কোন অধিকারই ছিল না। এমন কথা যদি আমি

২২৪। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ) ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৮২, নং ৫৮৫। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২৩৬, নং ৫৬৮২। সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুসনায়ে আহমাদ।

২২৫। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এক কুবরস্থানে যান এবং বলেন, ‘হে বিশ্বাসী স্ববরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন, নিচয়ই আমরাও তোমাদের অনুসরণ করব। আমি আশা করি, আমরাও আমাদের ভাইদের সাথে মিলিত হব’। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! আমরা কি আপনার ভাই নই?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘বরং, তোমরা আমার সাহাবী, কিন্তু আমার ভাইয়েরা এখনও আসেনি, এবং আমি তাদেরকে হাউজের দিকে নিয়ে যাবো (শেষ বিচারের দিন)। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আপনার উম্মাহর লোক যারা এখনও আসেনি তাদেরকে আপনি কি করে চিনবেন?’ তিনি বললেন, ‘কোন লোকের যদি একটা ঘোড়া থাকে, যার মুখ ও পা শুধো সাদা, সে কি অনেকগুলো সম্পূর্ণ কালো ঘোড়ার মাঝে তার ঘোড়াটা চিনতে পারবে না?’ তাঁকে বলা হলো ‘হ্যাঁ’ আল্লাহর রাসুল (সাঃ)। তিনি (সাঃ) বললেন, ‘অতএব, নিঃসন্দেহে কিয়ামাতের দিন, অজুর কারণে তারা উজ্জ্বল মুখ মন্তল, হাত ও পা নিয়ে উপস্থিত হবে [তিনি (সাঃ) তিন বার বললেন]; এবং আমি তাদেরকে হাউজের দিকে নিয়ে যাবো। আর নিচয়ই কিছু লোককে আমার হাউজের নিকট থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে, যেমন হারানো উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয় (যাতে উটের পালে কোন রোপ না ছড়ায়)। আমি তাদেরকে ডাকবো, কাছে আস। কিন্তু আমাকে বলা হবে, তোমার (মুদ্বার) পরে তারা বদলিয়ে ফেলেছে (তোমার বীনকে) এবং তারা বিপরীত মুখি হয়ে ফিরে গেছে।’ তখন আমি বলবো, ‘তাদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাদেরকে তাড়িয়ে দাও।’ (সহীহ মুসলিম)।

২২৬। ---- তারা বলেছিল (পর্ব ভরে): ‘আল্লাহর হেয়িত নাবী, মরিয়ম তনয় ঈসাকে হত্যা করেছি, কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করেনি, কুশবিহীন করেনি! কিন্তু, তাদের কাছে এমনটি মনে হয়েছে....। আল্লাহ তাঁকে (ঈসা) তাঁর (আল্লাহর) কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ সর্ব শক্তিমান (সূরাহ নিস/০৪ ১: ১৫৭, ১৫৮)।’

বলতাম, তবে আপনি নিশ্চয়ই জানতেন। আমার মনে যা কিছু আছে আপনি জানেন, কিন্তু, আপনার মনে যা আছে, তা আমি জানি না। আপনি সব গোপন খবরই জানেন। আমি তাদেরকে এ ছাড়া আর কিছুই বলিনি-বলেছি, শুধু যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে, (লোক সকল) তোমরা আল্লাহর ইবাদাহ্ কর, তিনি আমারও রাব্ব, তোমাদেরও রাব্ব। তাদের মাঝে যত সময় অবস্থান করেছি, তত সময়ই আমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক-পরিচালক ছিলাম। কিন্তু, আপনি যখন আমাকে ফেরত ডেকে পাঠালেন, তখন আপনি ছিলেন তাদের সংরক্ষক আর আপনিতো সমগ্র জিনিসের উপর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন”^{২২৭}

উপরোক্ত দু’টি উদাহরণ থেকে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইস্তিকালের পর নাবী-রাসুলগণ তাদের উম্মাহ্ সম্পর্কে সচেতন নন এবং পার্থিব জগতের সাথে তাঁরা যোগাযোগ রাখেন না।

(৩) মৃতরা পার্থিব জগৎ সম্পর্কে সচেতন নন :

মৃতব্যক্তি ঈমানদার বা অবিশ্বাসী যাই হোক, পার্থিব জগৎ সম্পর্কে সচেতন নন। যাহোক, সুফীরা দাবী করেন যে, ক্বাবরে থেকেও তাদের শাইখরা সজ্ঞানে পার্থিব জগৎ সম্পর্কে সচেতন। নিম্নে ‘ফাজায়েল আ’মাল’ থেকে দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

১। একদা একদল আরব, এক অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তির ক্বাবর যিয়ারাহ্ করতে গেল এবং সেখানে এক রাত্রি অবস্থান করল। তাদের একজন স্বপ্নে ক্বাবরবাসীকে দেখল এবং ক্বাবরবাসী তাকে বখ্তী (উন্নতমানের এক শ্রেণীর উট) উটের বদলে তার উটটি দিতে বলল। লোকটি সম্মত হলে, ক্বাবরবাসী লোকটি উঠে দাঁড়ালো এবং উটটিকে যবেহ্ করল।

যিয়ারাহ্কারী লোকটি যখন জেগে উঠলো, দেখলো সত্যি সত্যি তার উটটি যবেহ্ করা হয়েছে এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে তখন উটটির চামড়া ছাড়িয়ে মাংস বন্টন করে দিল। যখন দলটি ফিরে যাচ্ছিল, তখন কোন এক সময় একটি লোক বখ্তী উট হাঁকিয়ে এসে জানতে চাইল, ‘তাদের মাঝে অমুক নামের কোন লোক আছে কিনা?’ যে লোকটি স্বপ্ন দেখেছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, আমি সেই লোক। বখ্তী উটের আরোহী লোকটি বলল, ‘ক্বাবরবাসী লোকটি আমার পিতা এবং সে আমাকে

২২৭। সূরাহ্ আল-ময়িদা, (আয়াতঃ ১১৬-১১৭)।

স্বপ্নযোগে যার উটটি যবেহু করা হয়েছে, তাকে এই বখ্তী উটটি পৌছে দিতে বলেছে।’ সে উটটি দিয়ে চলে গেল।^{২২৮}

২। একজন ধার্মিক লোক কোন এক সময় এক দানশীল ব্যক্তির ক্বাবরের পাশে বসেছিল। মনে মনে চিন্তা করছিল, গরীব লোকদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য তার কিছু টাকা-পয়সা দরকার। কিন্তু, সে টাকা-পয়সার কোন উৎস খুঁজে পাচ্ছিল না।
রায়ে স্বপ্নযোগে সে ক্বাবরের লোকটিকে দেখল এবং ক্বাবরবাসী লোকটি সমস্ত বর্ণনা দিয়ে বলল, ‘তুমি আমার বাড়ী গিয়ে অমুক কোনায় খুঁজে দেখ, সেখানে পাঁচশত দীনার মাটির নিচে লুকানো আছে, তা উঠিয়ে নিয়ে গরীবদেরকে দিয়ে দাও।’
লোকটি পরের দিন ক্বাবরবাসী লোকটির বাড়ী গিয়ে তার পরিবারের লোকদেরকে স্বপ্নের কথা জানাল। ক্বাবরবাসীর বর্ণনামতে সেই জায়গাটিতেই দীনারগুলো পাওয়া গেল।^{২২৯}

এই কাহিনী দুটি কুর’আন নির্দেশিত আক্বীদাহর পরিপন্থী। কুর’আনে তিন ব্যক্তির সাময়িক মৃত্যু দিয়েছিলেন বলে আল্লাহ বলেছেন। যেমন, “অথবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর। যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যার বাড়ী-ঘরগুলি ভেংগে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। সে (লোকটি) বলল, ‘মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ এটিকে (নগরটিকে) জীবিত করবেন?’ তখন তাকে আল্লাহ একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, ‘তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে?’ সে বলল, ‘একদিন বা একদিনের কিছু কম’। তিনি বললেন, ‘বরং একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছিলে। আর তোমার খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর। আর (এগুলো এজন্য যে), আমরা তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব। আর (গাধার) অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কি ভাবে সেগুলোকে আমরা সংযোজিত করি এবং মাংস দ্বারা ঢেকে দিই।’ যখন এটি তার কাছে সুস্পষ্ট হলো, তখন সে বলে উঠল, ‘আমি জানি যে আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’^{২৩০}

কুর’আনে আরও একটি বর্ণনা আছে, সে বর্ণনামতে কিছু লোকের উপর আল্লাহ প্রায় তিনশ বৎসরের^{২৩০ক} জন্য নিদ্রা দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, “তুমি মনে করতে, তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত। আমরা তাদের ডানে ও বামে পার্শ্ব

২২৮। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল সাদাকাহু খন্ড, সপ্তম অধ্যায়, ১৬ নং কাহিনী, ১৯৩ পৃষ্ঠা, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, দ্বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

২২৯। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল সাদাকাহু খন্ড, সপ্তম অধ্যায়, ২৪নং কাহিনী, ১৯৫ পৃষ্ঠা, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, দ্বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

২৩০। সূরাহ আল-বাক্বারাহ (২: ২৫৯)।

২৩০ক। সূরাহ আল-কাহ্বক (১৮: ২৫)।

পরিবর্তন করাতাম এবং তাদের কুকুর সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করেছিল। জাকিয়ে তাদের দেখলে তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে জাতংকগ্রস্থ হয়ে পড়তে। এবং এভাবেই আমরা তাদের জাগরিত করলাম, যাতে, তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ।' কেউ কেউ বলল, 'একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।' কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন, তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ লগরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে, কোন খাদ্য উত্তম এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকেও কিছু না জানতে দেয়।'^{২৩১}

যে মানুষগুলো 'শ'-শ' বছর পর্যন্ত নিদ্রিত ছিল, তারা তাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং এটাও তাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল যে, তারা কত সময় মৃত অবস্থায় ছিল। এটা নিশ্চিত যে, গুহা মানবেরা জীবিতই ছিল, আল্লাহ শুধু তাদের ঘুম দিয়েছিলেন। তারা ঘুমন্ত অবস্থায়ই পার্শ্ব পরিবর্তন করত এবং তাদের রুহ স্থায়ীভাবে তাদের দেহকে ছেড়ে যায়নি।^{২৩২} তাদেরকে কবরস্থও করা হয়নি বা বারযাখ জীবনেও প্রবেশ করেনি। তারপরও, তারা পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; কারণ, নিদ্রাও এক রকম সাময়িক মৃত্যু। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই।' ^{২৩৩} নিদ্রিতাবস্থায় রুহ কবজ করার অর্থ- নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনা-অনুভূতি, বোধশক্তি, ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের সমস্ত শক্তিকে অকেজো করে দেওয়া। বস্তুত, এটা এমন একটা অবস্থা যে, প্রচলিত কথায় বলা যায়- যে নিদ্রিত হলো, সে মরলো।

অতএব, কুর'আনের এই দুটি ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মৃত ব্যক্তির পার্থিব জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

(৪) জান্নাতবাসীরা পার্থিব জগত সম্পর্কে অজ্ঞ :

মৃত্যুর পরে পৃণ্যবান লোকদের রুহ জান্নাতে আরোহণ করে এবং তারা ইহজগতে বসবাসকারী পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ইত্যাদি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। এজন্যই, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'বিশ্বাসীদের রুহ যখন জান্নাতে

২৩১। সূরাহু আল-কাহফ (১৮ : ১৮-১৯)।

২৩২। যখন কোন লোক ঘুমন্ত থাকে, তার রুহ ভিতরেই থাকে এবং সে জীবিত। যদিও সে জীবিত, কিন্তু সে জাগ্রত ব্যক্তির মত নয়, কারণ ঘুম মৃত্যুর সমতুল্য। আল্লাহ বলেন, 'মৃত্যু এলে আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন এবং জীবিতদেরও চেতনা হরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতঃপর, তিনি যার জন্য মৃত্যুর ফায়সালা করেছেন তাঁর প্রাণ রেখে দেন, আর অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরাহু আয-যুমার, আয়াতঃ ৪২)।'

২৩৩। আল-মিশকাত।

আরোহণ করে, অন্যান্য জালাতবাসী বিশ্বাসীদের রুহ তাদেরকে স্বাগতঃ জানায় এবং পার্থিব জগতের তাদের পরিচিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে খবরাখবর জিজ্ঞেস করে।^{২৩৪}

দেওবন্দিগণের দৃষ্টিভঙ্গী-৩ : আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর ক্বাবর যিয়ারাহকারীর উপস্থিতির আওয়াজ শোনে এবং সাড়া দেন :

১। শাইখ ইব্রাহীম বিন শাইবাহ্ বলেন, ‘হাজ্জ শেষে আমি যখন মদীনা ভ্রমণে আসি, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্বাবরে সালাম জানাই এবং লক্ষ্য করি, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে যে ঘরে সমাহিত করা হয়েছে, সেই ঘর থেকে আমার সালামের উত্তর আসে; এবং আমি তা শুনি।’^{২৩৫}

২। ইউসুফ ইবনে আলী বলেন, ‘হাশেমী বংশের এক মহিলা মদীনা় বাস করত। তিনজন খাদেম তাকে কষ্ট দিত। তাই, মহিলাটি ফরিয়াদ নিয়ে নাবী (সাঃ)এর ক্বাবরের নিকট হাজির হলে ক্বাবর থেকে এই আওয়াজ বের হল- “তোমার মাঝে আমার কোনই আদর্শ নেই কি? তুমি সবার কর, যেমনটি আমি করেছিলাম।” ঐ আওয়াজ শুনে মহিলাটি বলল, ‘আমার সব মুসিবত দূর হয়ে গেছে’। অতঃপর ঐ তিন খাদেমই মারা পড়ে।’^{২৩৬}

৩। সাইয়েদ আহমাদ রিফায়ী একজন বিখ্যাত বৃজর্গ ও সুফী ছিলেন। তার বিখ্যাত কিস্সা এই যে, ৫৫৫ হিজরীতে হাজ্জ শেষ করে নাবী (সাঃ)এর পবিত্র ক্বাবরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দুটি কবিতা পড়লেন; যার অর্থ-‘দূরে থাকা অবস্থায় আমার রুহকে পাঠাতাম, সে আমার নায়েব হয়ে ক্বাবরের জমিনে চুমো দিত, এখন দেহ এসে হাজির, তাই আপনার হাতটা বাড়ান, তাতে চুমো দিই’। এর ফলে, ক্বাবর থেকে হাত বের হয়ে এলো, তিনি তাতে চুমো দিলেন। কথিত আছে যে, সে সময় নব্বই হাজার লোকের সমাবেশ মাস্জিদে নববীতে ছিল, যাদের সবাই ঐ ঘটনা দেখেছিল। তাদের মধ্যে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ) এর নামও উল্লেখ করা হয়।^{২৩৭}

২৩৪। হাদীসটিকে আল্লামা সুয়ুতী সহীহ বলেছেন এবং শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী ‘সিলসিলাহু আল-আহাদীস আস-সহীহাতে সমর্থন করেছেন।

২৩৫। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েলে হাজ্জ খন্ড, নবম অধ্যায়, ৫ নং কাহিনী, ১৬৯ পৃষ্ঠা, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত। নবম অধ্যায়ে ১৪ ও ১৫ নং কাহিনীতেও একই রকমের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

২৩৬। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েলে হাজ্জ খন্ড, নবম অধ্যায়, ১৬ নং কাহিনী, ১৭৫ পৃষ্ঠা, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

২৩৭। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েলে হাজ্জ খন্ড, নবম অধ্যায়, ১৩নং কাহিনী, ১৭৪ পৃষ্ঠা, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রতিবাদ

(১) ফিরিশ্তারা সালাম পৌছে দেন :

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর কিছু ফিরিশ্তা রয়েছেন, যারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান। আমার উম্মাহর লোকদের সালাম তাঁরা আমার নিকট পৌছে দেন।’^{২৩৮} রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সরাসরি কোন সালাম শুনতে পারেননা, যদি তাই হত, তা’হলে, সালাম পৌছে দেয়ার জন্য কোন ফিরিশ্তার প্রয়োজন হতনা। সাহাবী ও সাল্ফে সালাহীনগণ বারে বারে সালাম দেয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহ পছন্দ করতেন না। কারণ, ক্বাবরের নিকট বা দূর, যেখান থেকেই সালাম জানানো হোক, ফিরিশ্তাগণই তা পৌছে দেন।

আলী (রাঃ) এর নাতি আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইন (রহঃ) লক্ষ্য করেন, এক লোক প্রায়ই রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্বাবর যিয়ারাহ করে। তিনি বললেন, “ওহে লোক! নিশ্চয়ই, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘আমার ক্বাবরকে ইবাদাহর জায়গা বানিয়ে নিও না। তুমি যেখানেই থাক, তোমার দোয়া আমার নিকট পৌছে যাবে।’ কাজেই, তুমি নিকট থেকে, আর একজন যদি স্পেন থেকেও দোয়া করে, তার ফলাফল একই”^{২৩৯}

একটি জাল হাদীসকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর কথা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ‘যে কেউ আমার ক্বাবরের নিকটে দাঁড়িয়ে দরুদ পড়ে, তা আমি শুনি এবং যারা দূর থেকে দরুদ পড়ে, তা পৌছে দেয়া হয়।’^{২৪০} এই জাল হাদীসটি ‘ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েলে হাজ্জ খন্ড, অষ্টম অধ্যায়, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১১, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, দ্বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত বইটিতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(২) শ্রবণ শক্তির সীমাবদ্ধতা :

একজন জীবন্ত মানুষ, যে জাগরিত ও সজাগ, সেও কোন দেয়াল বা প্রতিবন্ধকের পেছনে অতি সামান্য শব্দই শুনতে পায়। যদি একজন ক্বাবরবাসী জীবিতও থাকে

২৩৮। সুন্নে নাসাঈ, সুন্নে দারিমী, মুসুনাদে আহমাদ। শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

২৩৯। বর্ণনাটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তার কিতাবুল অসীলা এবং আল-ইকতিদাতে উল্লেখ করেছেন, পৃষ্ঠাঃ ১৫৫-১৫৬; শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী তার বই ‘আহকামুল জানা’য়িজে’ উল্লেখ করেছেন, ২৮০ পৃষ্ঠায়।

২৪০। এই বর্ণনাটি আল-উকাইলী তার আয-যঈফাহ্ বইতে উল্লেখ করেছেন। আল-খতীব, ইবনে আসাকির, এরা সবাই একমত যে, এটি একটি মওজু বা জাল হাদীস। শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী তার সিলসিলাতিল আহাদীস আয-যঈফাহ্‌তেও উল্লেখ করেছেন, হাদীস নং ২০৩।

এবং জীবন্ত মানুষের মত পূর্ণ শ্রবণ শক্তি সম্পন্নও হয়, তবুও বালি, মাটি অথবা পাথরের প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে শব্দ শোনা তারপক্ষে কি করে সম্ভব? মৃত্যু একজনের শ্রবণ শক্তিকে উন্নত করতে পারে না, বরঞ্চ শ্রবণ শক্তিহীন করে। যারা জীবিত আছে, তাদেরও শ্রবণ শক্তির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন—

- বেশ স্বাভাবিক আওয়াজে কথা না বললে অন্য কেউ ঠিকভাবে শুনতে পারে না।
- এক সময়ে সাধারণতঃ একজনের কথাই শোনা ও বুঝা সম্ভব।
- একজন শুধু কয়েকটি ভাষাই হয়তো বুঝতে পারবে। পৃথিবীর সব ভাষা একজনের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়।
- নিদ্রিতাবস্থায় কেউই শুনতে পারে না।

উপরোক্ত শর্তগুলো রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর জন্যও প্রযোজ্য, তিনিও মোটামুটি স্বাভাবিক আওয়াজে কেউ কথা না বললে শুনে বুঝতে পারতেননা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় ইবনে সাইয়াদ নামে এক যাদুকের মদীনায় বাস করতো। মনে করা হতো, দাজ্জালদের ভিতর সেও একজন।^{২৪১} ইবনে সাইয়াদ যাদুবিদ্যার সাহায্যে গায়েবের খবরের অনুসন্ধান করতো। কিন্তু, তার কথা সত্য থেকে অনেক দূরে থাকতো। ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণিত— “একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উবাই ইবনে কা'য়াব (রাঃ) কে নিয়ে ইবনে সাইয়াদ যে খেজুর বাগানে থাকতো, সেখানে গেলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন খেজুর বাগানে ঢুকলেন, তিনি ইবনে সাইয়াদকে দেখার আগেই যেন তার কথা শুনতে পারেন সে জন্য নিজেকে খেজুর আঁড়াল করে এগুচ্ছিলেন। ইবনে সাইয়াদ ডেলভেটের চাদরে আবৃত বিছানায় শুয়েছিলো এবং সেখান থেকে অনুচ্চস্বরে ফিস্ফিসানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। যখন খেজুর গাছের আঁড়ালে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজেকে লুকাচ্ছিলেন, সেই সময় ইবনে সাইয়াদের মা তাঁকে দেখে ফেলে। সে ইবনে সাইয়াদকে বলে, হে সাফ! (এটা ইবনে সাইয়াদের একটি নাম) ইবনে সাইয়াদ ডাক শুনে উঠে পড়লো। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘যদি মহিলা তাকে স্বগোভুক্তি করতে দিত, হয়তো, সে তাঁর ব্যাপারে আসল

(৩) মৃত ব্যক্তির শ্রবণ সম্পর্কে কুর'আনের আলোকে সাধারণ প্রতিবাদ :

দেওবন্দিগণের কিতাবগুলোর অসংখ্য কাহিনীতে দাবী করা হয়েছে যে, সুফীদের

২৪১। আল-মুনকাদির কর্তৃক বর্ণিত, “আমি শুনেছি জাবির বিন আব্দুল্লাহ আদ্রাহর নামে কসম করে বলেছেন যে, ইবনে সাইয়াদ একজন দাজ্জাল।’ আমি জাবির (রাঃ) কে বললাম, তুমি কি করে আদ্রাহর নামে কসম কর?’ জাবির (রাঃ) বললো, ‘আমি শুনেছি উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপস্থিতিতে এব্যাপারে কসম করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে নিবৃত্ত করেন নি।” (সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৫৩)।

কথাটাই প্রকাশ করতো।”^{২৪২} মাযার যিয়ারাহ্ কালে তারা সব শুনতে পায়। যেমন, মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন, ‘ফাতহুল ক্বাদির’ কিতাবের লিখক আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম কোন একসময় শাইখ্ ইবনে আতা ইস্কান্দারীর ক্ববরের পাশে দাঁড়িয়ে সুরা হুদ তিলাওয়াত করছিলেন।

যখন তিনি এই আয়াতে পৌছলেন, “তাদের মাঝে দূর্ভাগা ও ভাগ্যবান ব্যক্তি আছে।” শাইখের ক্বাবর থেকে আওয়াজ এলো, হে কামাল! আমাদের মাঝে কেউ দূর্ভাগা নেই। কুর’আনের ব্যাখ্যা এই যে, মৃত ব্যক্তি ক্বাবর থেকে শুনতে পায় না। আল্লাহ্ বলেন, “নিঃসন্দেহে, তুমি মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও তুমি শোনাতে পারবে না; কারণ, তোমার আহ্বান যখন তারা শোনে, তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়।”^{২৪৩}

এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে মৃত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ শ্রবণ শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাসীদেরকে মৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। যদিও জীবিত অবিশ্বাসীরা দৈহিকভাবে শোনে, তাদেরকে মৃত ব্যক্তির মত বধির বলা হয়েছে এজন্য যে, মৃতরা কিছুই শোনেনা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্বাবরস্থ মৃত ব্যক্তির কোন শ্রবণ শক্তি নেই। এরকম আরও একটি তুলনা, কুর’আনের সূরাহ্ ফাতিরে (৩৫ : ২২ আয়াতে) আল্লাহ্ বলেন, “এবং জীবিত (মুমিন) ও মৃত (অবিশ্বাসী) সমান নয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎবাক্য শ্রবণের সামর্থ্য দেন; তুমি মৃতকে সৎবাক্য শোনাতে সমর্থ হবে না।” এখানেও মু’মিনদেরকে জীবিত এবং অবিশ্বাসীদেরকে মৃত বলা হয়েছে। এ আয়াতেও অবিশ্বাসীদেরকে ক্বাবরবাসীর সাথে তুলনা করে আল্লাহ্ বলেন, ‘শোনার ব্যাপারে উভয়েই সমান’। অবিশ্বাসীরা দৈহিকভাবে শোনে; কিন্তু, সত্য কথা শোনেনা। তারা একেবারে ক্বাবরবাসীদের মত, যেমন ক্ববর বাসীরা বধিরত্বের শেষ সীমায় পৌঁছেছে, তারা কিছুই শোনে না।^{২৪৪}

এই বিচার্য বিষয়টি কুর’আন এবং সুন্নাহর বাড়তি সত্যায়ন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ্তে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও যখন কোন মৃত ব্যক্তির পরিবার বিলাপ করে, তার ফলে মৃতের আযাবের ব্যাপারে আয়িশা (রাঃ) কে মন্তব্য করতে বলা হলে, তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, ‘মৃত ব্যক্তিকে তার অন্যায়ের জন্য আযাব দেয়া হয় এবং তার জন্য যদি পরিবারের লোক বিলাপ করে, সে জন্য ও আযাব হয়’। তিনি আরো বললেন, ‘বদর যুদ্ধে নিহত অবিশ্বাসীদেরকে যে কূপে ফেলা হয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, এটা তারই মত— ‘আমি যা বলি, তা তারা শোনে।’ আয়িশা (রাঃ) আরো যোগ করলেন, ‘আমি আগে যা বলতাম,

২৪২। সহীহ বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ) চতুর্থ খণ্ড, হাদীস নং ২৯০।

২৪৩। সূরাহ্ আন-নামল, (২৭ : ৮০)।

২৪৪। তফসীরে তাবারী, ২১ ভূম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা ও কুরতুবী লিখিত আল- জামী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, আরও দেখুন “Mysteries of the Soul Expounded” by Abu Bilal Mustafa al- Kanadi।

তার সত্যতা এখন তারা বুঝতে পারছে।' আয়িশা (রাঃ) তখন তিলাওয়াত করলেন, “তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেনা।”^{২৪৫}। এবং “যারা ক্বাবরে আছে, তাদেরকেও শোনাতে পারবে না।”^{২৪৬, ২৪৭} এখানে আমরা দেখছি, মৃতদের শোনা সম্পর্কে যখন আলোচনা হচ্ছিল, তখন আয়িশা (রাঃ) সূরাহ রুম (৩০ঃ৫২) এবং সূরাহ ফাতির (৩৫ঃ২২) এর আয়াত দুটি প্রমাণ হিসেবে এনেছেন। এ আয়াত দুটি শুধু অবিশ্বাসীদের জন্যই প্রযোজ্য, কিছুতেই মৃতদের শ্রবণ শক্তির সপক্ষে উল্লেখ করা যাবেনা; তাঁদের বিভ্রান্তিকর দাবির উত্তর এটাই।

সন্দেহের নিরসন

সন্দেহ ১ : পদধ্বনি শোনা :

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন, ‘বান্দাহকে যখন ক্বাবরে রাখা হয় এবং তার বন্ধু-বান্ধবরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, সে তখনও জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমন সময় দুজন ফিরিশ্তা এসে তাকে বসিয়ে দেন’ ...^{২৪৮}। মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে প্রমাণ হিসেবে এই হাদীসটি তুলে ধরা হয়। কিন্তু, এই হাদীসটি শুধু ক্বাবরস্থ করার পর স্বল্প সময়ের জন্য প্রযোজ্য এবং শুধু জুতার শব্দ শোনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য কিছুই নয়।

সন্দেহ (২) : বদরের কূপের কাফির :

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আর একটি হাদীস এর প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। বদরের যুদ্ধের দিনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কুরাইশদের নিহত ২৪ জন যোদ্ধার লাশ একটা ময়লাযুক্ত ও শুকনো কূপে নিক্ষেপ করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসী কুরাইশ যোদ্ধাদের নাম ও পিতার নাম উচ্চারণ করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘হে অমুক, পিতা অমুক! হে অমুক, পিতা অমুক! তোমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কথা মানতে, তা’হলে কি ভাল হতনা? আমরা আমাদের সত্যকে পেয়েছি, যা দেয়ার জন্য আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তোমাদের ঐচ্ছিক তোমাদেরকে যা দিতে চেয়েছিলেন তা কি তোমরা পেয়েছো?’ উমার (রাঃ) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! আপনিতো নিশ্চয় দেহগুলোর সাথে কথা বলছেন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘তুমি শুনতে পাচ্ছনা, কিন্তু, আমি যা বলছি, তা তারা ভালভাবেই শুনতে পাচ্ছে’।^{২৪৯}

২৪৫। সূরাহ রুম (৩০ঃ৫২)।

২৪৬। সূরাহ ফাতির ৩৫ঃ২২।

২৪৭। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ), ৫ম খণ্ড, নংঃ ৩১৬।

২৪৮। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৪৫৬।

২৪৯। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-৩১৪।

এই হাদীসটি একটি ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যাখ্যা করেছে। বদর যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কাফিরদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের লাশগুলো অবমাননাকর অবস্থায় একটি কূপে ফেলতে আদেশ দিয়েছিলেন। কাতাদা (রহঃ) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আবার জীবিত করেছিলেন এজন্য যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাদের উপর যেন প্রতিশোধ নিতে পারেন। কঠোর ভাষায় তিরস্কার শুনে তারা অপমানিত হয় এবং অনুতাপ-অনুশোচনা করে’।^{২৫০}

উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মনে করতেন যে, মৃতরা শুনতে পায়না এবং সেই জন্যই প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আপনি এমন দেহগুলির সাথে কথা বলছেন যাদের আত্মা নেই। অনুরূপভাবে, আয়িশা (রাঃ) ও বিশ্বাস করতেন যে, মৃতরা শুনতে পায়না; এবং সেই জন্যই উপরোক্ত ঘটনা যখন আলোচনায় এসেছিল, তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, ‘এখন তারা ভালভাবেই বুঝতে পারছে যে, আমি যা বলতাম, তাই সত্য ছিল’। তারপর, তিনি কুর’ানের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “তুমিতো মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবেনা; বধিরকেও তোমার আহ্বান শোনাতে পারবে না, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।”^{২৫১, ২৫২}

এ থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন মৃতরা শুনতে পায়না। কাতাদার ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, বদরের কূপে কাফিরদেরকে সাময়িকভাবে জীবন্ত করা হয়েছিল। তারপরও, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয়, এই হাদীস প্রমাণ করে যে, মৃতরা শুনতে পায়; তা’হলে, একটি প্রশ্ন আসে, এ হাদীসে কোন শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?— উদ্ধৃত কাফির! তারাই, যারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছিল, এবং যাদের অবজ্ঞাভরে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কাজেই, তাদের এই যুক্তিও মিথ্যা। কারণ, এতে সমস্ত মৃতেরই শোনা সাব্যস্ত হচ্ছে, তারা চাই ইমানদার হোক, চাই পাপী হোক, —যা তারা দাবী করে না। তাঁরা দাবী করে যে, যারা ধার্মিক, সুফী ও শাইখ— শুধু তারাই শুনতে পায়। অতএব, তাদের এ যুক্তি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

দেওবন্দি দৃষ্টিভঙ্গী (৪) : রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দৈহিকভাবে জীবিতদেরকে সাহায্য এবং উপকার করতে পারেন :

(১) উপদেশ/উত্তর/সমাধান/সাহায্য চাওয়া রাসূল (সাঃ) থেকে :

‘ফাজায়েল আ’মাল’ বিভাগিকর বিবৃতিতে পরিপূর্ণ— যাতে দাবী করা হয়েছে যে, যাদের প্রয়োজন, তাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দৈহিকভাবে সাহায্য করেন।

২৫০। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-৩১৪।

২৫১। সুবাহ আর-রুম (৩০ : ৫২)।

২৫২। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ৫ম খণ্ড, নং-৩১৭।

১। হযরত ইবনে য়ালা' বর্ণনা করেন- “কোন এক সময় মদীনাতে আমি ভীষণ ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। ক্ষুধায় এতই অতিষ্ঠ হয়েছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত রাসুল (সাঃ)এর ক্বাবরের পাশে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ), আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত এবং এখন আপনার অতিথি। তারপর, আমি তন্দ্রাভিভূত হয়ে গেলাম এবং স্বপ্নে দেখলাম, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এক খন্ড রুটি দিচ্ছেন। আমি অর্ধেকটা রুটি আহার করলাম এবং ঘুম থেকে জেগে দেখি বাকী অর্ধেক রুটি তখনও আমার হাতেই রয়েছে।”^{২৫৩}

২। আর একটি কাহিনীতে আছে- কোন এক ব্যক্তি হাজ্জে যাচ্ছিল, অন্য এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্বাবরে তার সালাম পৌছে দেয়ার জন্য লোকটিকে অনুরোধ করলো। ঐ লোকটি (হাজ্জযাত্রী) মদীনা ভ্রমণ করে ফিরে যাচ্ছিল; কিন্তু, যুলহলাইফা পৌছে তার মনে পড়লো, অন্য লোকটির সালামতো রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জানানো হয়নি। তখন, সে যাত্রীদল ছেড়ে সালাম জানাবার জন্য আবার মদীনায়ে ফেরত আসলো এবং যথারীতি সালাম জানিয়ে সে মাস্জিদে নব্বীতে ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর, লোকটি বললো, ‘শেষ রাত্রির দিকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর দুই সংগীকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। আবু বাকর (রাঃ) বললেন, ‘হে রাসুল (সাঃ)! এইতো সেই লোক’। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘হে আবুল ওয়াফা! আমি উত্তর দিলাম, ‘হে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! আমার নাম আবুল আব্বাস’। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন, ‘না, তোমার নাম আবুল ওয়াফা (প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী)’। এরপর, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে মক্কায়ে মাস্জিদুল হারামে নামিয়ে দিলেন। সেখানে পুরো আটদিন অপেক্ষা করার পর আমার সাথী যাত্রীদল এসে পৌছলো’।^{২৫৪}

৩। শাইখ্ আহমাদ মুহাম্মদ সুফী অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে তেরো মাস বনে-জংগলে ঘুরে অস্থি-চর্মসার হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায়, তিনি মদীনা এসে পৌছলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে সালাম জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বলছেন, ‘হে আহমাদ! তুমি কি আমার নিকট এসেছো?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘জি হযর! আমি আপনার নিকট এসেছি, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং আপনার অতিথি।’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘তোমার দু’হাত খোলো’। তিনি তাই করলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দু’হাত দিরহামে ভরে দিলেন। তিনি জেগে দেখেন, তখনও তাঁর দু’হাত দিরহামে ভর্তি।^{২৫৫}

২৫৩। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েলে হাজ্জ খন্ড, ৯ম অধ্যায়, ২৩ নং কাহিনী, ১৭৮ পৃষ্ঠা, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

২৫৪। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েলে হাজ্জ খন্ড, ৯ম অধ্যায়, ১৭৩ পৃষ্ঠা, ১১ নং কাহিনী, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

২৫৫। ফাজায়েলে আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েলে হাজ্জ খন্ড, ৯ম অধ্যায়, ১৭৯ পৃষ্ঠা, ২৫ নং কাহিনী, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

৪। একদা এক মুয়াজ্জিন আজান দিচ্ছিল, এমন সময় এক লোক এসে তাকে অভ্যন্তর জোড়ে চপেটাঘাত করলো। মুয়াজ্জিন কেঁদে বললো, ‘হে রাসুল (সাঃ)! দেখুন, আপনার উপস্থিতিতে আমার সাথে কি ব্যবহার করা হলো’। অভিযোগ করার সাথে সাথেই লোকটি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। আশেপাশের লোকজন এসে তাকে ধরে তার বাড়ী নিয়ে গেলো এবং তিনদিন পরে সে মারা গেলো।^{২৫৬}

৫। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুসা বলেন, ‘যখন আলী ইবনে ছালিহ্ মারা যান, সে সময় আমি ভ্রমণার্থে দূরে ছিলাম। ফিরে এসে তাঁর ভাই হাসান ইবনে ছালিহ্‌র সাথে সাক্ষাত করলাম। হাসান বললো, ‘তিনি কিভাবে ইন্তিকাল করলেন, সে ঘটনা আমাকে আগে বলতে দিন। তিনি যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, তখন পানি চাইলেন। আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, ‘আমি পানি পান করে ফেলেছি’। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিভাবে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সারিবদ্ধ অনেক ফিরিশতা নিয়ে এসে আমাকে পানি পান করিয়েছেন’।^{২৫৭}

প্রতিবাদ

তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবু বাকরের নিকট যাবে:

যুবাইর ইবনে মুত’ঈম (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা নাবী (সাঃ)এর নিকট এলো, (প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে প্রস্থানকালে) নাবী (সাঃ) মহিলাকে তাঁর কাছে আবার আসতে বললেন। মহিলা বললো, ‘আচ্ছা ধরুন, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই?’ মহিলা নাবী (সাঃ)এর ওফাতের দিকে ইংগিত করেছিলেন। নাবী (সাঃ) বললেন, ‘তুমি যদি আমাকে না পাও, তবে আবু বাকর (রাঃ) এর নিকট যাবে’।^{২৫৮}

এই হাদীসটিতে দেখা যায় যে, আব্দুল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যু সবাইকে কারু করবে। যখন মহিলাটি বলেছিল যে, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই? একথা শুনে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কিন্তু তাকে থামিয়ে দেন নি, বা এরকম কথা বলতে নিষেধ করেননি। এটা এজন্য যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এরও

২৫৬। ফাজায়েল আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল হাফ্জ খন্ড, ৯ম অধ্যায়, ১৭৯ পৃষ্ঠা, ২৬ নং কাহিনী, ১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, দ্বীনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

২৫৭। ফাজায়েল আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল সাদাকাহ্, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৬০৫ পৃষ্ঠা, দক্ষিণ আফ্রিকান ২য় সংস্করণ, হিঃ ১৪১৪-ত্রীঃ ১৯৯৩ ওয়াটারভাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত।

২৫৮। সহীহ আল-বুখারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৮, নং- ১১।

মৃত্যু হতে পারে। তা না হলে, তিনি মহিলার কথা সংশোধন করে দিতেন। যেমন, কোন এক সময় ছোট মেয়েরা গান করছিলো এই বলে যে, ‘আমাদের একজন রাসুল আছেন যিনি জানেন আগামীকাল কি হবে’। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে অদৃশ্যের ব্যাপারে কিছু জানানো, এটা উল্লেখ করে তাদেরকে ঐ গানটি গাওয়া নিষেধ করে দিলেন।^{২৫৯}

এই হাদীসটি থেকে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা গেলো যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ইস্তিকালের পর তাঁর নিকট কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না; এবং সেই জন্যই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অনুপস্থিতিতে আবু বাক্র সিদ্দিক (রাঃ) এর নিকট যাওয়ার জন্য ভদ্র মহিলাকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর ইস্তিকালের পর তাঁর প্রতি সাহাবা (রাঃ) দের মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না।

(ক) খলীফা মনোনয়ন : রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ওফাতের পর সাহাবা (রাঃ) গণ সর্বসম্মতভাবে আবু বাক্র (রাঃ) কে খলীফা মনোনীত করলেন। উত্তরসূরী (খলীফা) মনোনীত করার জন্য জীবিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর মত সূনিপুণ শাসক এবং পথ প্রদর্শকের অনুমোদন বা উপস্থিতির প্রয়োজন হয়নি। সাহাবা (রাঃ)গণ কর্তৃক আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর উত্তরসূরী মনোনীত করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ইস্তিকালের পর আর সাহায্য, উপদেশ বা নেতৃত্ব চাওয়া যাবে না।

(খ) আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট সমস্যার সমাধান চাওয়া : রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ওফাতের পর সাহাবা (রাঃ) দের মাঝে কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। যেমন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর দেহ যুবারক কোথায় দাফন করা হবে? ইসলামী রাষ্ট্রের উত্তরসূরী কে হবেন?^{২৬০} তৃতীয় খলীফা উছমান (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার পর রাজনৈতিক হানাহানির ফলে মুসলমানদেরকে প্রচুর রক্তপাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই সব কঠিন পরীক্ষার সময়ও সাহাবা (রাঃ) গণ না আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর নিকট পরামর্শ চেয়েছেন, না ক্বাবরের নিকটে গিয়ে কিছু বলেছেন, না তাঁর কোন সাহায্য চেয়েছেন। লোকেরা ধর্মীয় ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) এর নিকট দিক নির্দেশনা চাইতো, কিন্তু, আয়িশা (রাঃ) এর ঘরেই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্বাবর থাকা সত্ত্বেও, কখনও আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে কোন প্রশ্ন করেননি।

২৫৯। সহীহ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ) ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৬।

২৬০। আবু রাহিক আল-মুখতুম (ইংরেজী অনুবাদ), ৪৮১-৪৮২ পৃষ্ঠা।

(গ) আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর নিকট ধর্মীয় সিদ্ধান্ত চাওয়া : দ্বিতীয় খলীফা উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) সব সময় দুঃখ করতেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে সুদ ও উত্তরাধিকারের কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেননি। একদা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মিশরের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়ার সময় তিনি বললেন, ‘আমি আশা করি, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তিনটি সুনির্দিষ্ট ফায়সালা না দিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে যান নি। সেগুলি এই যে, দাদা কতটুকু অংশ পাবে? আল-কালালার (যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাপ ও ছেলে নেই) উত্তরাধিকারী এবং অবৈধ সুদ।’^{২৬১}

(ঘ) বৃষ্টির জন্য দোওয়া : রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জীবিত ছিলেন, সাহাবী (রাঃ) গণ এবং লোকজন তাঁকে আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দোওয়া করতে অনুরোধ করতেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ইন্তিকালের পর সাহাবী (রাঃ) গণ তাঁর ক্বাবরের নিকটে দাঁড়িয়ে দোওয়া করতে অনুরোধ করতেননা। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘যখন অনাবৃষ্টি হতো; সাহাবী (রাঃ) গণ এবং অন্যান্য লোকজনেরা আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্তালিব (রাঃ) কে বৃষ্টির জন্য দোওয়া করতে অনুরোধ করতেন। তিনি (উমার ইব্নুল খাত্তাব রাঃ) বলতেন, “হে আল্লাহ! আমরা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বৃষ্টি চেয়ে দোওয়া করতে বলতাম, আর তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ রূপে বৃষ্টি দান করত। এখন আমরা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চাচাকে তোমার নিকট বৃষ্টি চেয়ে দোওয়া করতে বলি; অতএব, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দান কর।”^{২৬২} যদি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কেই অনুরোধ করা সম্ভব হতো এবং জায়েয হতো, তা’হলে, সাহাবী (রাঃ) গণ কখনও তাঁর পরিবর্তে তাঁর চাচাকে অনুরোধ করতেন না।

উপসংহার :

সাহাবী (রাঃ) গণ এমন কোন কার্য-কলাপই করেননি যদ্বারা আমরা মনে করতে পারি যে, ৬৩ বৎসর পার্থিব জীবনে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যেরকম ছিলেন, ক্বাবরেও সেই রকমই জীবন যাপন করছেন। অথবা তাঁর ইন্তিকালের পরও রাসুল (সাঃ) থেকে কোন সুবিধা পাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের কার্য-কলাপই প্রমাণ করে যে, বারুখা জীবনে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে কোন যোগাযোগ করা বা সহযোগীতার জন্যও প্রার্থনা করা সম্ভব বা বৈধ নয়। উপরোক্ত কাজগুলি সাহাবী (রাঃ) গণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘এই

২৬১। সহীহ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ) ৭ম খন্ড, নং ৪৯৩।

২৬২। সহীহ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৬, নং-১২৩ এবং ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪৮, নং-৫৯। আরও দেখুন ইবনে সা’দের ‘আত-তাবাক্বাত’।

জাতিকে আল্লাহ্ শ্রান্ত ধারণার উপর একতাবদ্ধ করবেননা। আল্লাহ্‌র হাত ঐক্যবদ্ধ মুসলমানদের উপর আছে।^{২৬৩} দেওবন্দিগণ দাবী করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বার্বাখ্ জীবনে থেকেও পার্থিব জগৎ সম্পর্কে খেয়াল রাখেন, জীবিতদের সাথে যোগাযোগ করেন, তাদেরকে সাহায্য ও উপদেশ দান করেন। তারপর, ঐ গুণাবলী তাদের মৃত শাইখ্ ও আলিমদের উপর আরোপ করেন, যা তাদের বই গুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে। তারা মনে করেন যে, মৃত শাইখ্ ও আলিমরা দিক নির্দেশনা ও উপদেশ দিতে পারেন।

মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন, ‘তিনি (মাওলানা শাইখ্ খাজা মহিবুল্লাহ্ ইলাহাবাদী) দিল্লীতে হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখ্‌তিয়ার কাকীর মাযারে গিয়ে ধ্যানে বসেছিলেন। হযরত কুতুবুদ্দিন আধ্যাত্মিকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাকে গান্ধোহীর শাইখ্, আবু সাঈদের সাবিরিয়া সিল্‌সিলায় যোগদান করতে বলেছেন।^{২৬৪}’

মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন, ‘হযরত আহমাদ আব্দুল হাক্ক-এর তাসারুফ (আধ্যাত্মিক শক্তি) গুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ এই যে, মৃত্যুর ৫০ বৎসর পরে রুহানী ফায়েজের মাধ্যমে তার সামান্য সত্ত্বা (অর্থাৎ, আব্দুল কুদ্দুস) এর তারবিতিয়াতে (আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ) উপস্থিত হয়েছিলেন।’^{২৬৫}

২৬৩। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন (কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২২৬৯)।

২৬৪। মাশায়িখ্-ই-চিশ্‌ত (ইংরেজী অনুবাদ), ১৯৭ পৃষ্ঠা।

২৬৫। মাশায়িখ্-ই-চিশ্‌ত (ইংরেজী অনুবাদ), ১৭৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্বাবর যিয়ারাহ

শির্ক ও ক্বাবর পূজা :

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্বাবর যিয়ারাহ নিষিদ্ধ ছিল। ধার্মিক লোক ও তাদের ক্বাবর পূজার^{২৬৬} প্রবণতা অতীত জাতিগুলির মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। এ থেকে শির্কের দিকে ঝুকে পড়ার সম্ভাবনা ছিল বলে ক্বাবর যিয়ারাহর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। ক্বাবর যিয়ারাহর সময় আত্মসংযম হারিয়ে যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হয়, সেটাকে পরিহার করার জন্যই আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ক্বাবর যিয়ারাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইসলামের আলোকে তাওহীদের (আল্লাহর একত্বের) ধারণা যখন সাহাবীগণের মনে বদ্ধমূল হলো, তখন ক্বাবর যিয়ারাহর নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে ক্বাবর যিয়ারাহ করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু, এখন তোমরা যিয়ারাহ করতে পার। কারণ, তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেবে।’^{২৬৭} অতএব, যে ইচ্ছা করে যিয়ারাহ করতে পারে; কিন্তু, কোন বিভ্রান্তিকর কথা বলবে না।^{২৬৮}

ক্বাবর যিয়ারাহর প্রয়োজনীয়তা

ক্বাবর যিয়ারাহ মাত্র দুটি কারণে প্রয়োজন :

(ক) যিয়ারাহকারীকে মৃত্যু এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদেরকে ক্বাবর যিয়ারাহ করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু, এখন যিয়ারাহ করতে পার। কারণ, তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেবে।’^{২৬৯}

২৬৬। যখন উম্মে হাবিবা ও উম্মে সালামা (রাঃ) বলেছিলেন, ‘ইম্বিতশিয়ার গির্জার একটা ছবি আছে’। তখন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, ‘এই লোকদের মাঝে যখন কোন ধার্মিক লোক ইতিকাল করে, তার ক্বাবরকে লোকেরা ইবাদাহর জায়গা বানিয়ে ফেলে এবং তার ছবি তৈরী করে টাঙ্গিয়ে দেয়। হাশরের দিনে ঐ লোকগুলি আল্লাহর নিকট অভ্যস্ত নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।’ সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ), ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫১, নং-৪১৯। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৮, নং-১০৭৬। সুনানে নাসাঈ (আল-মাসজিদ) ১ম খন্ড, নং-১১৫ এবং মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৬ষ্ঠ খন্ড, নং-৫১।

২৬৭। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬৩-৪৬৪, নং-২১৩১। সুনানে আবু দাউদ (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৯১৯, নং-৩২২৯। সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাযল এবং বায়হাক্বী।

২৬৮। সুনানে নাসাঈতে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন সুনান আন-নাসাঈ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৩৬, নং-১৯২২।

২৬৯। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬৩-৪৬৪, নং-২১৩১। সুনান আবু দাউদ (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৯১৯, নং-৩২২৯। সুনান আন-নাসাঈ, মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাযল এবং বায়হাক্বী।

(খ) যিয়ারাহকারী দোওয়ার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করতে পারে। দোওয়ার কথাগুলো এই— ‘ক্বাবরবাসীদের মধ্যে মুসলমান ও ইমানদারদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যারা আমাদের আগে চলে গেছে এবং পরে যাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন, আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো’।^{২৭০}

ক্বাবরকে ইবাদাহুর জায়গা মনে করার উপর নিষেধাজ্ঞা :

আল্লাহর নিকট ক্বাবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা ছাড়া অন্য সমস্ত ইবাদাহু ক্বাবরের নিকটে করা নিষিদ্ধ। যেমন, আনুষ্ঠানিক ইবাদাহু (নামাজ),^{২৭১} কুর’আন তিলাওয়াত^{২৭২}, যবেহু করা^{২৭৩}, ইত্যাদি। কারণ, এই ইবাদাহুগুলি ক্বাবরের নিকট করার অর্থই ক্বাবরকে ইবাদাহুর জায়গা বানানো। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ক্বাবরস্থানকে ইবাদাহুখানায় পরিণত করার বিরুদ্ধে তাঁর উম্মাহকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, ‘যারা তাদের পয়গাম্বারদের ক্বাবরে ইবাদাহুখানা তৈরী করেছে, তাদের থেকে সাবধান থেকে। যেহেতু, আমি নিষেধ করেছি, অতএব, ক্বাবরস্থানকে ইবাদাহুর জায়গায় পরিণত করো না’।^{২৭৪} আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘যারা ক্বাবরস্থানকে ইবাদাহুর জায়গা বানায়, তারা আল্লাহর সামনে শেষ বিচারের দিনে মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টরূপে আগমন করবে’।^{২৭৫} দোওয়াও এক রকম ইবাদাহু।^{২৭৬} যদি কেউ মনে করে যে, মু’মিন লোকদের ক্বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোওয়া করলে কবুল হবে, তা’হলেও ক্বাবরস্থানকে ইবাদাহুখানা মনে করা হবে।

২৭০। সহীহ মুসলিম (ইংরেজী অনুবাদ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬১-৪৬২, নং-২১২৭।

২৭১। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘পৃথিবীর সমস্ত (পাক) যমীনই ইবাদাহুর জায়গা, শুধু ক্বাবরস্থান ও শৌচাগার ছাড়া।’ সুনানে আবু দাউদ (ইং অনুঃ) ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৫, নং-৪৯২। শাইখু আলবানী সহীহ সুনানে আবু দাউদে সহীহ বলেছেন (১ম খন্ড, পৃঃ ৪৬৩) ও ‘তোমরা ঘরে ইবাদাহু কর, আর ঘরকে ক্বাবরস্থান বানিয়ে নিও না।’ {সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৬, নং-২৮০। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৬, নং-১৭০৪}।

২৭২। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা ঘরকে ক্বাবরস্থান বানিও না। যে ঘরে সূরাহ বাস্তারাহ তিলাওয়াত করা হয়, সেখান থেকে শরতান পলায়ন করে।’ {সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৭, নং-১৭০৭}। এথেকে বুঝা গেলো, কুর’আন ঘরেই তিলাওয়াত করতে হবে, এটা না করলে ঘর ক্বাবরস্থানে (যেখানে কুর’আন পড়া হয় না) পরিণত হবে।

২৭৩। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেছেন, ‘ইসলামে ক্বাবরস্থানে যবেহু করা নিষিদ্ধ।’ {সুনানে আবু দাউদ (ইংরেজী অনুবাদ), হাদীস নং-৩১১৬}।

২৭৪। সহীহ মুসলিম (ইংরেজী অনুবাদ) ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৯, নং-১০৮৩।

২৭৫। মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল (আল-ফিতান ওয়াল-আশরাফ আস-সা’ত- বিচার ও তার সময়ের লক্ষণ সমূহ)। আহকামুল জানা’রিয়ের ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

২৭৬। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘দোওয়া করাও ইবাদাহু’। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, ‘এবং তোমার স্বাক বলে, আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব।’ {সুনানে আবু দাউদ (ইং অনুঃ) ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৮৭, নং-১৪৭৪। ইমাম বুখারী সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ (৭১৪), আত-তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, নং-১৭৮ ও ২২৩। ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, নং-৪২৮-৪২৯ এবং মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খন্ড, নং-২৬৭, ২৭১, ২৭৬, ২৭৭। আরও দেখুন সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, নং-১৩১২।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, ক্বাবরস্থানকে ইবাদাহুখানা গন্য করার পিছনে যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তার পক্ষে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহুর রাসুল (সাঃ) এর সাহাবীগণ জানতেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আ‘লামিন বহুশ্বেরবাদকে সম্মুখে নির্মূল করার জন্যই তার উৎসস্থল ক্বাবরে ইবাদাহু করাকে হারাম করেছেন। একই উদ্দেশ্যে, যে ন্যায়নিষ্ঠভাবে ইবাদাহু করে, তার জন্যও সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ইবাদাহু করা হারাম করেছেন, যাতে সূর্যপূজার সাথে সাদৃশ্য না হয়। সাহাবীগণ কখনও এই পাপকাজ (ক্বাবরে ইবাদাহু করা) কে প্রশ্রয় দিতেননা’।^{২৭৭}

আল্লাহুর রাসুল (সাঃ) যখন মুমূর্ষাবস্থায়, তিনি চাদর দিয়ে একবার মুখ ঢাকছিলেন, আবার অস্বস্তিতে চাদর খুলে দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়, তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহু ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর অভিসম্পাত দিন, এজন্য যে, তারা তাদের নাবীদের ক্বাবরকে ইবাদাহুর জায়গা বানিয়েছে।’ সত্যিকার অর্থে, তিনি ইহুদী-খৃষ্টানরা যা করেছিল, তার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।^{২৭৮} আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্বাবরকে মাসুজিদ বানিয়ে ফেলা হবে, এরকম ভয় যদি না থাকতো, তবে, খোলা জায়গাতেই দাফন করা হতো।’^{২৭৯}

দেওবন্দিগণ ধার্মিকদের মাযার থেকে উপকার পাবার জন্য মাযার যিয়ারাহু ও দু‘আর অনুমোদন করে :

মাওলানা যাকারিয়াহু আউলিয়াদের মাযার যিয়ারাহু করার অনুমোদন দিয়ে ফাজায়েলে আ‘মালে বলেছেন, ‘মাযারের আশীর্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয়। আমি বলি, পয়গাম্বারদের ক্বাবর যিয়ারাহু করা কি নিষিদ্ধ? যদি তাঁদের ক্বাবর যিয়ারাহু নিষিদ্ধ না হয়ে থাকে, তা’ হলে, ধার্মিকদের ক্বাবর যিয়ারাহু করাও একই ব্যাপার’।^{২৮০}

এই বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য মাওলানা যাকারিয়াহু একটা কাহিনীর অবতারণা করেছেন। দুই ভাই ছিল, তাদের পিতা কিছু সম্পদ রেখে মারা যান, যার মধ্যে

২৭৭। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া সংকলিত কিতাবুল ওয়াসিলা, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

২৭৮। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ) ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৫, নং-৪২৭। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৯, নং-১০৮২। সুনানে আবু দাউদ (ইং অনুঃ), ২য় খন্ড, পৃঃ ৯১৭, নং-৩২২১। সুনানে নাসাঈ, ১ম খন্ড, নং-১১৫ এবং অন্যান্য।

২৭৯। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩২, নং-৪১৪। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৮, নং-১০৭৬ এবং মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, নং-১৫৬ ও ১৯৮, ৮ম খন্ড, নং-১১৪।

২৮০। ফাজায়েল আ‘মাল (হিন্দী অনুবাদ), ফাজায়েল হাক্ক খন্ড, যিয়ারাহু মদীনা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫০, ১২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা। ইমারা ইশাহ দীনিয়াহ, ১৯৮৪ সনের প্রথম সংস্করণ।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তিনটি চুল ও ছিল। দুই ভাইয়ের সব সম্পদ সমান ভাগ করে নিল এবং প্রত্যেক ভাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর একটি করে চুল পেল। কিন্তু সমস্যা হলো তৃতীয় চুলটি নিয়ে। বড় ভাই ছোট ভাইকে একটি শর্তে তিনটি চুলই দিতে চাইলো, তা'হলো, সমস্ত সম্পত্তি বড় ভাইকে দিতে হবে। ছোট ভাই খুশী মনেই তাতে রাজী হলো। ছোট ভাই যখন মারা গেলো— বহু বূজুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে নাবী (সাঃ) এর দর্শন লাভ করলো। স্বপ্নে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করলেন, ‘যদি কোন ব্যক্তির কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দেয়, সে যেন ঐ ব্যক্তি (রাসুলুল্লাহ সাঃ এর তিন চুলের মালিক) এর কবরের পার্শ্বে গিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে।’^{২৮১}

মাশায়েখ-ই-চিশ্ত বইয়ে মাওলানা যাকারিয়াহ অনেক খোলাখুলিভাবে তাঁর বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,— হাজী ইমদাদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, ‘ফাকিররা মৃত্যু বরণ করেনা, শুধু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। ফাকিরদের পার্থিব জীবনে তাদের নিকট থেকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেত, তাদের মৃত্যুর পর কবর থেকেও ঐ সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে’।^{২৮২}

প্রতিবাদ ও সন্দেহের নিরসন

সন্দেহ (১) : আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাহ করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু, এখন তোমরা কবর যিয়ারাহ করতে পার। কারণ, তা তোমাদেরকে পরলোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।’^{২৮৩}

এই হাদীসটির উপর নির্ভর করে মাওলানা যাকারিয়াহ ফাজায়েল আ’মালে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ধার্মিক লোকদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য, তাদের কবর যিয়ারাহ করা বৈধ। এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত; কারণ, হাদীসের কথাগুলি পরিস্কার ও সহজবোধ্য। হাদীসটি সাধারণ জন-মানবশূন্য কবরস্থানের কথাই বলেছে; যা একজন লোককে পরলোকের কথা মনে করিয়ে দেবে। এই হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, নির্দিষ্ট কোন একটি কবরে তীর্থযাত্রা করে দোওয়া বা অন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য যাওয়া যাবে।

২৮১। ফাজায়েল আ’মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল দরুদ, পঞ্চম অধ্যায়, ১২৮ পৃষ্ঠা, ৩৫ নং কাহিনী, ১৯৮৫ সংস্করণ, ধ্বনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

২৮২। মাশায়েখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ) পৃঃ ২১১।

২৮৩। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩-৪৬৪, নং-২১৩১। সুনানে আবু দাউদ (ইং অনুঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১৯, নং-৩২২৯। সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, বায়হাকী।

সন্দেহ (২) : মাওলানা যাকারিয়াহ ফাজায়েল আ'মালে যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে, “এই হাদীসটি ‘তিনটি মাস্জিদ ব্যতীত অন্য কোন মাস্জিদ যিয়ারাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা যাবে না- মাস্জিদুল হারাম, মাস্জিদে নববী ও মাস্জিদুল আকসা”^{২৮৪} কেবল এই তিন মাস্জিদ ছাড়া অন্য মাস্জিদে ইবাদাহ্‌র জন্য ভ্রমণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।” এই হাদীসটির অর্থও একেবারে পরিষ্কার। এই হাদীস থেকে সাহাবাগণ এটাই বুঝেছেন যে, এই তিনটি মাস্জিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইবাদাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা যাবে না

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, আবু বাসরাহ্‌ গিফারী (রাঃ) একটি ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করলেন। আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কোথা থেকে আসলে?’ আবু বাসরাহ্‌ বললেন, ‘আমি ত্বন্^{২৮৫} থেকে ইবাদাহ্‌ করে আসলাম’। আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) বললেন, ‘তুমি যাবার আগে জানলে, আমি তোমাকে যেতে দিতাম না। কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, ‘(ধর্মীয় কারণে) তিনটি মাস্জিদ ছাড়া কোথাও ভ্রমণ করোনা’।^{২৮৬}

আবু ক্বাযা'য়াহ্‌ ও ত্বরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, যখন তিনি ইবনে উমার (রাঃ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর নিষেধ বাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ‘তিনটি মাস্জিদ ছাড়া কোথাও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা যাবে না’।^{২৮৭} দুটি বর্ণনা থেকেই দেখা যায় যে, সাহাবীগণ তুর সহ অন্যান্য জায়গায় ধর্মীয় কারণে ভ্রমণের উদ্দেশ্যকে নিষেধাজ্ঞার অধীনই বুঝেছেন।

সন্দেহ (৩) : মাওলানা যাকারিয়াহ্‌ বলেন, ‘মাযারের দৌওয়া অন্য ব্যাপার। আমি বলি, নাবী-পয়গাম্বারদের ক্বাব্‌র যিয়ারাহ্‌ করা কি নিষিদ্ধ? যদি তাঁদের ক্বব্‌র যিয়ারাহ্‌ নিষিদ্ধ না হয়ে থাকে, তা'হলে, ধর্মপ্রাণদের ক্বাব্‌র যিয়ারাহ্‌ ও একই ব্যাপার’।^{২৮৮}

২৮৪। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী, সুনানে নাসাই, সুনানে ইবনে মাজাহ্‌।

২৮৫। তুর একটা পর্বতের নাম যা কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে (২৪: ৬০), সাধারণতঃ সিনাই পর্বতকেই বুঝায় {Dictionary of Islam, P-647 and Arabic English Lexicon, vol.2, P-1890}।

২৮৬। মুসনাদে আহমাদ, শাইখ্‌ আলবানী তাঁর আহ্‌কামুল জানায়িয বইয়ে সহীহ বলেছেন, পৃঃ ২২৬।

২৮৭। ‘আখবারে মক্কাত’ে আজরাবী কর্তৃক সংগৃহীত, শাইখ্‌ আলবানী ‘আহ্‌কামুল জানায়িয’ বইয়ে সহীহ বলেছেন।

২৮৮। ফাজায়েল আ'মাল (হিন্দী অনুবাদ), ফাজায়েল হাজ্জ খত, যিয়ারাহ্‌ মদীনী অধ্যায়, ১৫০ পৃষ্ঠা, ১২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা। ইদারা ইশাহ্‌ ধীনিয়াহ্‌, ১৯৮৪ সনের প্রথম সংস্করণ।

(ক) যদি নাবী-পয়গাম্বারদের ক্বাবর যিয়ারাহুর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ জায়েয ও ধরে নেয়া হয়, তাতে সুফী-সাধকদের ক্বাবর যিয়ারাহুর জন্য ভ্রমণ জায়েযের প্রমাণ হয় না।

(খ) মদীনা ভ্রমণ করা হয় মাস্জিদে নব্বীকে যিয়ারাহুর করার উদ্দেশ্যে। মাস্জিদে নব্বীতে ইবাদাহুর সওয়াব অনেক বেশী। আল্লাহুর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘আমার মাস্জিদে এক রাকাত নামাজ, মাস্জিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে নামাজ পড়ার চেয়ে ১০০০ গুণ বেশী সাওয়াব।’^{২৮৯}

মদীনা ভ্রমণ শুধু মাস্জিদে নব্বী যিয়ারাহুর উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু, ক্বাবর যিয়ারাহুর উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহুর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘তোমাদের ঘরগুলিকে ক্বাবর বানিও না। আমার ক্বাবরকে আনন্দ-উৎসবের (জমা’য়াত ও বার-বার ভ্রমণের) জায়গা^{২৯০} বানিও না। কিন্তু, আমার উপর সালাম পেশ কর। যেখান থেকেই সালাম

পেশ করা হয়, আমার নিকট পৌছে যায়।’^{২৯১}

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্বাবর যিয়ারাহুর করা, তাঁর এবং তাঁর দুই সাহাবী (রাঃ) দের জন্য আল্লাহুর নিকট দোওয়া করা, মাস্জিদে নব্বী যিয়ারাহুর আনুসংগীক কাজ, প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুরে এসেছে যে, আলী (রাঃ) এর নাতি আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইন (রহঃ), লক্ষ্য করেন যে, একলোক প্রায়ঃশই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহুর করার জন্য আসছে। তিনি তাকে (ভ্রমণকারীকে) বলেন, ‘হে লোক! আল্লাহুর রাসুল (সাঃ) অবশ্যই বলেছেন, ‘আমার ক্বাবরকে ইবাদাহুর জায়গা বানিও না। যেখান থেকেই আমার উপর সালাম পেশ কর, আমার নিকট পৌছে যায়, কাজেই, তুমি আর স্পেনের একজন লোকের মধ্যে কোন তফাৎ নেই’।’^{২৯২}

২৮৯। সহীহ বুখারী (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৭, নং-২৮২। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৯৭, নং-৩২০৯। সুনানে আত-তিরমিযী (আস-সালাহ), সুনানে নাসাঈ (আল-মাসাজিদ), সুনানে ইবনে মাজাহ (ইক্বামাতিস-সালাহ-সালাহ কায়ম করা), মুসনাদে আহমাদ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক (আল-নিদা আস-সালাহ-সালাহুর আহবান)।

২৯০। আরবী শব্দ ‘জমা’ এর দু’টি অর্থ আছে : (১) কোন জায়গায় বার-বার ভ্রমণ করা। (২) উৎসবের দিন বা জায়গা। দুটি অর্থই হাদীসটিকে বুঝতে সাহায্য করে। অতএব, এই হাদীসটি বারেবারে নাবী (সাঃ)এর ক্বাবর যিয়ারাহুর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং আল্লাহুর রাসুল (সাঃ)এর ক্বাবরের নিকটে মেলা বা আনন্দ-উৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

২৯১। সুনানে আবু দাউদ (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৪২-৫৪৩, নং-২০৩৭ এবং মুসনাদে আহমাদ। আরও দেখুন সহীহ সুনানে আবু দাউদ ১ম খন্ড, হাদীস নং ১৭৯৬।

২৯২। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর ‘কিতাবুল ওয়াছলাহুত্’ উদ্ধৃত করেছেন, (পৃষ্ঠা ১৩৬) এবং ‘আল-ইক্বতিদা’ পৃঃ ১৫৫-১৫৬। শাইখ আলবানী ‘আহ্কামুল আনাইয’ বইতে উদ্ধৃত করেছেন, পৃঃ ২৮০।

(গ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্বাবর যিয়ারাহর উদ্দেশ্যে মদীনা ভ্রমণ জায়েয করার জন্য ফাজায়েল আ'মালে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা হয় জাল, না হয় যয়ীফ। কারণ, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহ সম্পর্কিত সব হাদীসই যয়ীফ। দ্বীনের ব্যাপারে এর কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, সহীহ হাদীসের (ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম) কোন সংকলকই এ সম্পর্কিত কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। এ সকল হাদীস শুধুমাত্র যয়ীফ হাদীসের সংকলকগণই বর্ণনা করেছেন। যেমন- দারাকুতনী, বাজ্জার, প্রমুখগণ'।^{২৯০} ক্বাবর যিয়ারাহর উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে জায়িজ করার জন্য ফাজায়েল আ'মালে যে হাদীসগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, তা বিশদ বিশ্লেষণের জন্য অত্র গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট ২' দেখুন।

উপসংহার :

এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, দেওবন্দিগণ ঐ সব বিপজ্জনক বিশ্বাসের ধারক ও বাহক, যা পরিশেষে প্রকাশ্যে ক্বাবর পূজা এবং সাধু-দরবেশ পূজার দিকে চালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের আদর্শে অনেক প্রকারের শিকী ধারণা এবং কাজ দেখা যায়, যা তাদের জামা'আতে তাবলীগেও প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা ফাজায়েলে আ'মালে দেখেছি, এই বর্ণনাগুলি ফাজায়েল ও উপদেশের আকারে ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসকে উৎসাহিত করার প্রয়াস। ক্বাবরবাসী শুনতে পারে, বুঝতে পারে এবং জীবিতদেরকে সাহায্য করতে পারে, ফাজায়েলে আ'মালের এ সকল শিক্ষার প্রতি যারা ঝুঁকে পড়ে, নিঃসন্দেহে, তারা তাদের তাওহীদকে দুর্বল করে এবং এক আল্লাহ ছাড়া অন্য আরো কারো প্রতি আশাবাদী হয়। অথচ, একমাত্র আল্লাহই কারো ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। ব্যাপকভাবে দেখা গেছে যে, যদি কোন মুহর্তে এই লোকগুলো ম্যাজিক, দুষ্টচক্ষু বা জ্বিন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তারা সর্বপ্রথম যেখানে সাহায্য প্রার্থনা করেন; তা হলো, সাধু-দরবেশের মাযার। ফলশ্রুতিতে, তারা পরবর্তী সময়ে মাযারের খাদেমের নিকটও সাহায্য চাওয়া শুরু করেন। তখন, খাদেমরা তাদের থেকে অর্থ-কড়ি নেয় এবং অনেক শিকের সাথে জড়িয়ে দেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বারুয়াখ্ থেকে পূর্বাবস্থায়

মৃতব্যক্তির রুহ কি ক্ষণিকের জন্য ফিরে এসে জীবন্ত হয়ে ইহজগতের লোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারে? : ^{২৯৪}

অনেক সুফী বিশ্বাস করেন মৃতব্যক্তির রুহ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে এবং পৃথিবীর জীবিতদের (যারা জাগরিত) সাথে কথা বলতে পারে। এই দাবীর অসাড়া প্রমাণ করার জন্য এ বিষয়ে কুর'আন, সুন্নাহ এবং কুর'আনের তাফসীরের নির্দেশনা অপরিহার্য।

রুহের ফিরে আসার মতবাদ কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী :

কুর'আনের অনেক আয়াত স্পষ্ট নির্দেশনা দেয় যে, মৃতদের রুহ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না। শেষ বিচার দিবসের সত্যতাকে যে অস্বীকার করে, মৃত্যু যখন এরকম অবিশ্বাসীর নিকটবর্তী হয়, তখন সে তার বিপথগামীতা ও ভুল বুঝতে পারে এবং আল্লাহর নিকট আর্জি পেশ করে, “যখন তাদের (অবিশ্বাসী) কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি’। ‘না, এ হবার নয়। এ তো, তার একটি কথার কথা। তাদের সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যবনিকা থাকবে।” ^{২৯৫, ২৯৬} এই আয়াতটি রুহের ফিরে আসা তত্ত্বের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। এই আয়াতে বারুয়াখ্ শব্দটির অর্থ—দুই ধাপের মাঝে পর্দা বা আড়াল। ^{২৯৭} কুর'আনের তাফসীরবিদ মুজাহিদ (রহঃ) (তাবেঈ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এই আয়াতে বারুয়াখ্ অর্থ— ইহজগত ও মৃত্যুর মাঝে প্রতিবন্ধক। আর এক তাফসীরবিদ আযুযাহাক (রহঃ) (তাবেঈ) ব্যাখ্যা করেছেন, বারুয়াখ্ ইহজগত ও পরজগতের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান। ^{২৯৮} ইবনে আব্বাস (রাঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, এটা একটা পর্দা (প্রতিবন্ধপূর্ণ অবগুষ্ঠন)। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, ‘এই আলিমদের বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিতর কোনো পরস্পর

২৯৪। এই বিষয়গুলি আবু বিলাল মুত্তফা আল-কানাদী কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত ‘রুহের রহস্য’ থেকে নেয়া হয়েছে।

২৯৫। ইমাম কুরতুবীর আল ‘জামিউ লি আহকামুল কুর'আন’, হাদিশ খণ্ড, পৃঃ ১৫০।

২৯৬। সুন্নাহ আল-মু'মিনুন (২৩ঃ৯৯-১০০)।

২৯৭। ইক্বাহানীর ‘মু'জাম মুফরাদাত আলফাজ-আল কুর'আন’, পৃঃ ৪১ এবং ইবনে আশীরের ‘আন-নিহায়া ফি পারীবিলা হাদীস’, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

২৯৮। তাফসীর আল-কুরতুবী, হাদিশ খণ্ড, পৃঃ ১৫০।

বিরোধীতা নেই। যেহেতু, তাদের ব্যাখ্যা একটা অনস্বীকারযোগ্য বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে; যেমন— পার্থিব দেহ থেকে আলাদা হয়ে রুহ এমন এক জগতে প্রবেশ করে যে, তার প্রতিবন্ধকতা সেখান থেকে ফেরাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।^{২৯৯}

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এটাতো অবিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু, এই আয়াতটি বিশ্বাসীদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সম্ভান-সমৃদ্ধি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে— যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, প্রত্যেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই তা থেকে ব্যয় করবে; অন্যথায়, মৃত্যু এলে সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম’। কিন্তু, নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনও কাউকে অবকাশ দেবেননা। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।’^{৩০০}

এই আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি মারা যাবার পূর্বে আল্লাহর নিকট যে আর্জি পেশ করে, আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন। একবার একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আ’লাম এ বারুযাখে প্রবেশ করলে, তার আর ফেরার কোন প্রশ্নই আসেনা। তাছাড়া, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘শহীদ ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত প্রাপ্ত কোন বান্দাই মৃত্যুর পর পৃথিবীতে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব দিতে চাইলেও পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না। শহীদ ব্যক্তি, শহীদের যে পদমর্যাদা দেখেছে, সেজন্যই সে (শহীদ ব্যক্তি) পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে এজন্য যে, যাতে, সে আবার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে পারে।’^{৩০১}

তিনি (সাঃ) শহীদদের সম্পর্কে আরো বলেন, ‘শহীদ ব্যক্তিদের রুহ সবুজ পাখীর ভিতরে বাঁচে, তাদের বাসা সর্বশক্তিমানের আরশের ঝুলন্ত ঝালরে। একদিন প্রভু তাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ‘তোমরা কি আর কিছু চাও’। তাঁরা বললো, ‘আমরা এর চাইতে আর বেশী কি চাইতে পারি? আমরা যেখানে সেখানে ঘুরে বেহেশতের ফল খেতে পারি’। তাঁদের প্রভু একই প্রশ্ন তিনবার করলেন। যখন তাঁরা বুঝলো, উত্তর না দেয়া পর্যন্ত প্রশ্ন আসতেই থাকবে, তাঁরা বললো, ‘হে প্রভু! আপনি আমাদের রুহকে আমাদের দেহে

২৯৯। তাফসীর আল-কুরতুবী, হাদিশ খণ্ড, পৃঃ ১৫০।

৩০০। সুরাহ মুনাফিকুন, (আয়াতঃ-১১)।

৩০১। জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং-১৭১০। সহীহ জামে আত-তিরমিযীতে শাইখ আলবানী কর্তৃক সত্যায়িত, হাদীস নং-১৩৪১।

পুনঃপ্রবেশ করিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন, যাতে, আপনার কারণে আমরা আবার শহীদ হতে পারি'। যখন আল্লাহ দেখলেন, তার আর কোন প্রয়োজন নেই, তাঁদেরকে ঐ অবস্থায়ই রেখে দিলেন।^{৩০২}

অতএব কুর'আন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলো যে, মৃতদের রুহ এই পৃথিবীতে ফিরে আসা, জীবিত লোকের সাথে সাক্ষাত করা ও কথা বলা সম্ভবও নয় এবং প্রমাণিতও নয়।

দেওন্দিগণ রুহের ফিরে আসা মতবাদকে সমর্থন করে :

প্রখ্যাত দেওবন্দি বূজুর্গ মুফতি আব্দুর রাহিম লাজপুরী 'ফাতোয়া রাহীমীয়াহ'তে বলেন, 'রুহ আসতে পারে এবং আসে। ঘটনা এবং পর্যবেক্ষণই তার প্রমাণ'।^{৩০৩} কিতাবুল জানায়িযে আছে, "মৃতব্যক্তির রুহ চল্লিশদিন তার ঘরে থাকে, অথবা আসে, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদিও, এটা হয়তো সম্ভব যে আল্লাহর অনুমতি নিয়ে রুহ যে কোন জায়গায় ভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু, নির্দিষ্ট সময় ধরে নিজ ঘরে আসে, একথাটা সত্য নয়"।^{৩০৪}

আরো একটি জনপ্রিয় বই 'মৃত্যুর পরে কি হয়?' এতে এরকম অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে, যা, 'মৃতরা কথা বলে' নামক অধ্যায়ে আছে।^{৩০৫}

নিরীক্ষিত আশ্চর্যজনক ঘটনাঃ

রুহের ফিরে আসা তত্ত্বের উদ্যোক্তারা যে সব যুক্তি নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে 'নিরীক্ষনযোগ্য আশ্চর্যজনক ঘটনাতে' মুফতি আব্দুর রাহীম লাজপুরী বলেছেন, 'রুহ ফিরে আসতে পারে, এবং ঘটনা এবং পর্যবেক্ষণই তার সত্যতার প্রমাণ'। এই 'নিরীক্ষনযোগ্য আশ্চর্যজনক ঘটনা', মৃতের দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে হতে পারে, মৃতের গলার আওয়াজের মাধ্যমে হতে পারে, ইত্যাদি। যদিও এই ঘটনাগুলি অসাধারণ, জ্বিনরা এই কাজগুলি সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে।

জ্বিন জাতি ধুম্রবহীন আগুন থেকে আল্লাহরই সৃষ্টি। তারা তাদের সমাজবলয়ে বসবাস করে। মানুষের মতই তারা চিন্তা-ভাবনা ও তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। সাধারণ অবস্থায়, তারা আমাদের চোখে অদৃশ্য। কিন্তু, তারা অত্যন্ত ভারী জিনিস-পত্র উত্তোলনের ক্ষমতা রাখে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে,

৩০২। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৬৫১ ও জামে আত-তিরমিযী, হাদীসনং-১৬৩১।

৩০৩। ফাতওয়াহ রাহিমীয়াহ (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫২, প্রশ্ন নং ৩৫৫।

৩০৪। 'কিতাবুল জানায়িয' (হানাফী), পৃঃ ৩৬, মজলিশ-উলোমা, দক্ষিণ আফ্রিকান সমর্থক।

৩০৫। 'মৃত্যুর পরে কি হয়?' লিখেছেন আহমাদ সাঈদ দেহলভী, প্রকাশক-সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৬।

কোন কিছুকে যে কোন আকার দিতে ও নিরাকার বা অদৃশ্য করতে পারে।^{৩০৬} জ্বিনেরা দু'রকম হয়ে থাকে, ঈমানদার বা ধার্মিক এবং অবিশ্বাসী বা ফাসিক। অবিশ্বাসী জ্বিনদেরকে শয়তান বলা হয়ে থাকে। এরা মানুষের মধ্যে যারা তাদের অনুসারী, তাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি এবং শির্ক বিস্তারে সাহায্য করে। পূর্ব পুরুষদের পূজা, সাধু-সন্ত পূজা, ক্বাবর পূজা, ইত্যাদি, শির্ক বিস্তারের অন্যতম কার্যকর পন্থা। শয়তানরা মৃত ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে ফিরে আসা রুহের মত অভিনয় করে মানুষকে প্রতারিত করে, যাতে মানুষের মনে মৃতদের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা জন্মে। তারা অসাধারণ ও সাহসী কাজ করে থাকে; যেমন- হারানো বা লুকানো জিনিসের সন্ধান দেয়, এবং ভবিষ্যত বলতে পারার দাবী করে।^{৩০৭} অবশেষে, তারা মানুষকে মৃতের পূজার দিকে অগ্রসর করে দেয়, যা কিনা শয়তান পূজারই সমতুল্য।^{৩০৮} ভাল একটা উদাহরণ, শয়তান মানুষের আকৃতিতে যে ক্ষতিকর খবর ছড়ায়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বদর যুদ্ধের ঘটনা। এক শয়তান সুরাকাহ ইবনে মালিকের চেহারায় বহুশ্বেত্রবাদী কুরাইশদের নিকট এলো। সে (শয়তান) কুরাইশদেরকে মুসলমানদের

৩০৬। বিসমিল্লাহ তিলাওয়াত করে শয়তানকে তাড়ানো যায় (অর্থাৎ ঘরে ঢোকান সময় পড়তে হবে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) এবং কিছু ক্ষুর আনের আয়াত যা হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশেষ করে আয়াতুল ক্ষুরসী (সুরাহ বাক্বারাহ, ২ঃ২৫৫), সহীহ বুখারী।

৩০৭। শয়তান কি ভাবে ভবিষ্যত ঘটনা জানে?

আব্রাহার রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “আব্রাহ যখন উর্বজগতে কোন আদেশ ঘোষণা করেন, ফিরিশতারা তাদের পাখা নেড়ে আব্রাহার আদেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়, পাখরের উপর দিয়ে শিকল টানলে ঘেরকম আওয়াজ হয়, তাদের পাখা নাড়ার আওয়াজ সে রকম শোনার। যখন তাদের তীত্বিকর অবস্থা কেটে যায়, তখন তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার প্রভু কি আদেশ করেছেন?’ তাঁরা বলাবলি করে, ‘তিনি অতীব মহান ও মহিমান্বয়, তিনি যা সত্য তাই বলেছেন,’ (সুরাহ সাবা, ৩ঃ৪২৩)। ‘তখন, চোরাই শ্রোতারা (শয়তান) এই আদেশ শ্রবণ করে, এই চোরাই শ্রোতারা থাকে একজনের উপরে আরেকজন। একজন চোরাই শ্রোতা কিছু শুনে, সে তার নীচের জনকে বলে, সে আবার তার নীচের জনকে বলে, এই ভাবে শেষের জন যাদুকার বা ভবিষ্যত বক্তাকে বলে। কোন কোন সময় জলন্ত অগ্নিশিখা তাদের পচাঙ্কাবন করে, আবার কোন কোন সময় অগ্নিশিখা তাদেরকে আঘাত করার আগেই খবর পাচার করে দেয়; যার সাথে যাদুকার বা ভবিষ্যতবক্তারা একশটা মিথ্যা বোণ করে প্রচার করে। তখন, লোকেরা বলে, সে (ভবিষ্যতবক্তা) কি এই এই কথা অমুক অমুক দিন বলে নি? সুতরাং, ভবিষ্যতবক্তাদের কিছুকিছু কথা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠাত হয়।’ (সহীহ আল-বুখারী, ৬ঃ ৭৩, ৭৭-৩২৪)।

৩০৮। শয়তানের পূজা-নিঃসন্দেহে কিছু লোক পুরুষ জ্বীনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু, তারা (জ্বীন) তাদের (মানুষের) মনকে পাপ ও অবিশ্বাসে ভরে দিয়েছিল।’ {সুরা আল-জীন ৭২ঃ৬} ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “প্রধানতঃ কিছু মানুষের অভ্যাস জ্বীনদেরকে প্রভাতাগারে সুযোগ করে দেওয়া, কারণ, তারা গহীন বন বা বিজন প্রান্তরে গেল জ্বীনদের আশ্রয় ভিক্ষা চাইতো। জাহিলিয়াতের যুগে আরবদের অভ্যাস ছিল, যদি কেউ কোন বনে প্রবেশ করতো, তারা বলতো, ‘আমরা এই বনের সবচেয়ে বড় জ্বীনের আশ্রয় চাই।’ তারা বিশ্বাস করতো, এরকম বললে, সকল জ্বীনদের শয়তানী থেকে তারা বেঁচে যাবে। এটা তাদের পুরোনো অভ্যাস; যেমন, কোন শহরে প্রবেশ করলে, সেই শহরের নেতাদের একজনের আশ্রয় চাইতো, যাতে নিজেদের ক্ষত্রেরা কোন ক্ষতি না করতে পারে। যখন, জ্বীনরা দেখতো লোকেরা তাদের আশ্রয় ভিক্ষা করছে, তাদের প্রভাতাগার মাত্রা বাড়িয়ে দিত। এমনকি, মানুষের বেশে এসে, লোকদেরকে নানা রকম ভয়-ভীতি দেখাতো। যখন দেখতো, মানুষ ভয়ে পাগল প্রায়, তখন তারা (জ্বীনরা) ঐ জায়গা থেকে দৌড়ে পালতো। যখন, জ্বীনরা দেখতো তাদের নিকট আশ্রয় চাওয়ার শির্কে মানুষ নিজেই নিমজ্জিত হয়েছে, তখন তারা তাদের শক্তি, বাহাদুরী এবং প্রভাতাগার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল”।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস যোগাতে এসেছিল। ঘটনাটি কুর'আনের সূরাহ্ আনফা'লে (০৮:৪৮) বর্ণিত হয়েছে। “(স্মরণ কর!) শয়তান তাদের (কুরাইশদের) কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল, এবং বলেছিল, ‘আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটেই থাকবো।’ অতঃপর, দু’দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হলো, তখন, সে সবে পড়লো ও বললো, ‘তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইলোনা, তোমরা যা দেখতে পাওনা, আমি তা দেখি। আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।’^{৩০৯}

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর দাদা মৃত্যুর পর ফিরে আসেন!

আশরাফ আলী থানভীর পর-দাদা মুহাম্মাদ ফরিদ সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ঘটনা ‘আশরাফুছ ছাওয়ানেহ্ (আশরাফ আলী থানভীর জীবনী)’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এক বরযাত্রীদলে ছিলেন এবং একদল ডাকাত বরযাত্রীদেরকে আক্রমণ করলো। বরযাত্রীদেরকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিহত হলেন এবং পীর সামাউদ্দিনের মাযারের নিকটেই তাকে সমাহিত করা হলো। জীবনী লেখক লিখেছেন, তাঁর শহীদ হওয়ার পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। এক রাত্রে তিনি জীবিতদের মতই নিজ গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে কিছু মিষ্টান্ন দিলেন এবং বললেন, ‘তোমরা যদি কাউকেই (আমার আসা সম্পর্কে) কিছু না বল, আমি এইভাবে আসতেই থাকবো।’ বাচ্চারা মিষ্টি খাচ্ছে, এটা দেখে যদি লোকেরা কোন সন্দেহ করে, সেই ভয়ে তার পরিবারের লোকেরা ঘটনাটি প্রকাশ করে দিল। তারপর থেকে তার আসা বন্ধ হয়ে গেলো।^{৩১০}

৩০৯। সূরাহ্ আল-আনফা'ল (০৮:৪৮)।

৩১০। আশরাফ আস-সাওয়ানেহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২।

সপ্তম অধ্যায়

ওয়াসিলা

“হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”^{৩১১}

‘ওয়াসিলা’র অর্থঃ

ওয়াসিলার অর্থ নৈকট্য এবং কোন পস্থা, যার মাধ্যমে একজন কোন কিছুর নিকটবর্তী হতে পারে। ইসলামে এর অর্থ হলো, আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পস্থা বা উপায়। হাদীস অনুসারে ওয়াসিলার আর একটি অর্থ-পদমর্যাদা বা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ানো। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয়, সে যা বলে, তোমরাও তাই বলো; এবং আমার উপর সালাম পেশ কর ও আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোওয়া কর, যেন আমাকে ওয়াসিলা প্রদান করেন। কারণ, এটি বেহেশতের একটি স্থান, এবং এটি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনের জন্য প্রযোজ্য, এবং আশা করি, সে আমিই।’^{৩১২}

কুর’আনের ব্যাখ্যায় ‘ওয়াসিলা’র অর্থঃ

কুর’আনের ভিত্তিতে ওয়াসিলার সংজ্ঞা, ‘এটা এমন একটা পস্থা, যার মাধ্যমে একজন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।’ “এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই আপন রাব্ব এর নৈকট্য লাভের জন্য ওয়াসিলা অনুসন্ধান করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হবে, এবং তারা নিজেরাই তাঁর রাহুমাত পাওয়ার প্রত্যাশী ও তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত। আসল কথা, তোমার রাব্ব এর আযাব বাস্তবিকই ভয় করার মত”^{৩১৩}

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেছেন, ‘আয়াতটি আরবের একদল লোকের সম্পর্কে নাথিল হয়েছে, যারা একদল জ্বিনের পূজা করতো। এই জ্বিনের দলটি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা তাদের জানা ছিল না’।^{৩১৪} হাফিজ ইবনে হাজার

৩১১। সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ঃ৩৫।

৩১২। সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৪৭।

৩১৩। সূরাহ বানি-ইস্রাঈল, ১৭ঃ৫৭।

৩১৪। সহীহ আল-বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং- ২৩৮ এবং সহীহ মুসলিম।

আস্কালানী (রঃ) বলেছেন, ‘যে লোকেরা জ্বিনের পূজা করতো, তারা জ্বিন-পূজা চালিয়ে যেতে থাকলো। যেহেতু, ঐ জ্বিনেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাই তারা সম্ভ্রষ্ট হতে পারলো না এবং তারা নিজেরাই তাদের রাব্ব এর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশী ছিল।’^{৩১৫} আল্লাহ্ কুর’আনে বলেন, “হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”^{৩১৬}

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, “ওয়াসীলা, অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া।” তিনি কাতাদাহ্ (রহঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন, ‘যে সকল কাজে আল্লাহ্ খুশী হন, সেই সকল কাজ ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া।’ হাফিজ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, ‘ঐ ইমামরা {ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও কাতাদাহ্ (রহঃ)} যা বলেছেন, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলা যায় যে, এ সম্পর্কে তাফসীর বিশারদদের মাঝে কোন মতদ্বৈততা নেই। ‘ওয়াসীলা’ সেই বিষয়ই, যদ্বারা একজন তার লক্ষ্যে পৌঁছে।’^{৩১৭}

এই আয়াত দু’টি এবং এদের প্রামাণ্য তাফসীর থেকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করার নামই ‘ওয়াসীলা’। এই ব্যাখ্যাগুলো ওয়াসীলার অন্য যে কোন ব্যাখ্যার বিরোধীতা করে। যেমন, অনেকে সরাসরি মৃত সাধু-সন্তদের মাধ্যমে কল্যাণ চায়। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাধু-সন্তদের মর্যাদা ও সম্মানের খাতিরে ‘তাওয়াসুসুল’ চাওয়ার বিভ্রান্তিকর যে বিশ্বাস দেওবন্দিগণ ধারণা করে আছেন, এগুলো তারও বিরোধীতা করে।

এগুলো দেওবন্দিগণের (ইচ্ছাকৃত) অশুদ্ধ তাফসীরের ও বিরোধীতা করে। মাওলানা আশিক ইলাহী মারাঠী তার ‘ইরশাদুল মূলক’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন, “সালিক (যে পথ খোঁজে) ব্যক্তির জন্য একজন শাইখ-ই-কামিল (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) জরুরী, এ জন্য যে, শাইখ আধ্যাত্মিক পথে সাথী হিসেবে থাকবে; এবং জীবন পথ পরিক্রমায় উত্থান-পতন এবং চোরাবালি ব্যাখ্যা করবে। আল্লাহ্ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তাকওয়াহ্ (আল্লাহ্ ভীতি) অর্জন কর এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ‘ওয়াসীলা’ তাল্লাশ কর।”^{৩১৮}

৩১৫। ফাতহুল বারী, ১০/১২ এবং ১৩।

৩১৬। সুরাহ্ আল-মায়িদাহ্, ৫ঃ৩৫।

৩১৭। তাফসীর ইবনে কাসীর।

৩১৮। ইরশাদুল-মূলক (ইং অনুঃ) পৃঃ ৪৬।

কুর'আন ও সুন্নাহর তাওয়াসুসুল :

তাওয়াসুসুল অর্জনের তিনটি সহীহ পন্থা আছে :

- আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহের মাধ্যমে তাওয়াসুসুল ।
- প্রার্থনাকারীর সৎকাজের মাধ্যমে তাওয়াসুসুল ।
- কোন জীবিত সৎব্যক্তির প্রার্থনার মাধ্যমে তাওয়াসুসুল ।

(১) আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহের মাধ্যমে তাওয়াসুসুল :

আল্লাহ বলেন, “আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে, সুতরাং ঐ নাম নিয়েই তাঁকে ডাক ।”^{৩১৯}

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহের মাধ্যমে তাওয়াসুসুল অর্থ- আল্লাহকে তাঁর সুন্দর নাম সমূহের মাধ্যমে আহ্বান করা । যেমন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই চাই, কারণ তুমি রাহমানুর রাহীম, দয়ালু, দাতা, পরম করুণাময়, সর্বজ্ঞাতা এবং তুমিই নিরাপত্তা ও মংগলদান কর্তা’ । এই ধরনের তাওয়াসুসুল অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায় ।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) নামাজে সালাম ফিরানোর আগে বলতেন, ‘হে আল্লাহ! তোমার গুণ ও অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টির উপর তোমার যে ক্ষমতা, তা থেকে যতদিন জীবিত থাকি আমার জন্য মংগল মনে কর, ততদিন আমাকে জীবিত রাখ; এবং যখন মৃত্যু হলে আমার জন্য মংগল হবে, তখনই মৃত্যু দিও ।’^{৩২০}

একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দেখলেন, এক ব্যক্তি তাশাহুদে বলছে, ‘প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই জন্য । তোমার কোন অংশীদার নেই এবং সমস্ত ইবাদাহ্ তোমারই জন্য । মহান কল্যাণ দাতা, হে বেহেশ্ত ও দোযখের সৃষ্টিকর্তা! হে সমস্ত মর্যাদা ও সম্মানের মালিক! হে চিরঞ্জীব! হে নিয়ামত দাতা ও সর্বজ্ঞাতা! আমি তোমার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করি, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করি ।’ অতঃপর নাবী (সাঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, ‘তোমরা কি জান সে কি দোওয়া করেছে?’ সাহাবীরা বললেন, ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)ই ভাল জানেন’ । তিনি (সাঃ) বললেন, ‘তাঁর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, সে আল্লাহর নিকট তাঁর মহান সিকৃতি নামের ওয়াসিলায় দোওয়া করেছে, এই নামে তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং এই নামে ডেকে কিছু চাইলে, তিনি তা দান করেন ।’^{৩২১}

৩১৯ । সুরাহ আল-আ'রাফ (৭ : ১৮০) ।

৩২০ । সহীহ আল-হাকিম, আন-নাসাঈ ও অন্যান্য ।

৩২১ । আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনায়ে আহমাদ ও অন্যান্য ।

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোন এক ঘটনা নাবী (সাঃ) কে দুঃখিত করেছিলো। তিনি বলেছিলেন, ‘হে চিরঞ্জীব! হে দ্রাণকর্তা এবং সকলের রক্ষাকর্তা! তোমার দয়ার ওয়াসীলায় সাহায্য চাই।’^{৩২২}

(২) দোওয়াকারীর সংকাজের ওয়াসীলায় তাওয়াসুল :

“যারা বলে, আমাদের রাক্ব! নিঃসন্দেহে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং দোজখের আগুনের শান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।”^{৩২৩} সংকর্মের মাধ্যমে ‘তাওয়াসুল’ অর্থ- সংকর্মকে উপস্থাপন করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর দয়া ও ক্ষমার আশা করা এবং সর্বতোভাবে তাঁর আজ্ঞা পালনকারী হওয়া। যেমন, “হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছো, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণ করেছি। সুতরাং, আমাদেরকে সত্য সমর্থকদের তালিকাভুক্ত করে নাও।”^{৩২৪}

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ক রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।’ সুতরাং, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সংকর্মশীলদের মত মৃত্যু দাও।”^{৩২৫}

এই ধরনের তাওয়াসুল, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর অনেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে গুহায় তিন সাহাবীর কাহিনী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তিন ব্যক্তি এক গুহায় আটকা পড়ে এক রাত্রি গুহায়ই ছিলেন। এই কাহিনীটি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, “তিন ব্যক্তি এক গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। একটা বিরাট আকারের পাথর খন্ড গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। বহু চেষ্টার পরও তাঁরা গুহার মুখ থেকে পাথরটি সরাতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে, তাঁরা আল্লাহ রাক্বুল আ'লামিনের দরবারে বিনীত প্রার্থনা করে। প্রথম ব্যক্তি দোওয়ায় বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার সমস্ত সং আদেশ এবং নিষেধ মেনে চলি; আমার সাধ্যমত তাদের সেবা-শুশ্রূষা করি, এই সংকাজের ওয়াসীলায় আমাকে উদ্ধার কর’। দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি যিনা করার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তোমার ভয়ে যিনা থেকে বিরত থাকি; এই ওয়াসীলায়

৩২২। হাসান সুন্নে তিরমিযী, হাকিম।

৩২৩। সূরাহু আলে-ইমরান (৩ : ৬)।

৩২৪। সূরাহু আলে-ইমরান (৩ : ৫৩)।

৩২৫। সূরাহু আলে-ইমরান (৩ : ১৯৩), সূলা আলে-ইমরান (৩ : ৪৬), সূরাহু আল-মুন (২৩ : ১০৯)।

আমাকে এই বিপদ থেকে নাজাত দাও'। তৃতীয় ব্যক্তি তার দোয়ায়, কোন এক অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল, তারই উল্লেখ করে আল্লাহর নিকট উদ্ধারের আকুতি জানালো। মহান ও পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁদের এই বিনীতি প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে গুহার মুখ থেকে প্রস্তরখণ্ড সরিয়ে দিলেন।^{৩২৬}

(৩) সৎলোকের দোওয়ার মাধ্যমে 'তাওয়াসুল':

তৃতীয় প্রকার 'তাওয়াসুল'—কোন জীবিত সৎ লোককে কারো বা কোন কিছুর জন্য দোওয়া করতে অনুরোধ করা। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর সময়কালে একবার লোকেরা খরায় অত্যন্ত কষ্ট-পীড়িত হয়েছিল। যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জুম'আর দিন খুত্বা দিচ্ছিলেন, তখন এক বেদুঈন যুবক দাঁড়িয়ে বললো, 'হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! খরায় গবাদি পশু মারা যাচ্ছে, শিশুরা ক্ষুধার্ত; অতএব, আপনি আমাদের জন্য দোওয়া করুন'। তিনি যখন হাত তুলে দোওয়া করছিলেন, তখন আকাশে মেঘের কোন নাম নিশানাও ছিলনা। আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যখন তিনি হাত নামালেন; পাহাড়ের ন্যায় মেঘ জমতে লাগলো এবং তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মিম্বার থেকে নামলেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টির পানি তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়লো'।^{৩২৭}

সৎলোকের দোওয়ার বরকতে তাওয়াসুলের বর্ণনা সাহাবী (রাঃ) দের থেকেও পাওয়া যায়। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) উমার ইবনে খাওব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যখন লোকেরা খরা আক্রান্ত হয়ে পড়তো, তিনি (উমার রাঃ) আব্বাস ইবনে মুত্তালিব (রাঃ) কে বৃষ্টির জন্য দোওয়া করতে বলতেন; এবং তিনি (উমার রাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা আগে বৃষ্টির জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে দোওয়া করতে বলতাম এবং তুমি বৃষ্টি দান করতে, এখন আমরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর চাচাকে তোমার নিকট দোওয়া করতে বলি; অতএব, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর'।^{৩২৮}

মহান তাবেয়ী সলাইম ইবনে আমির আল-খাবাইরি (রহঃ) বর্ণনা করেন, 'যখন বৃষ্টি হতো না, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) এবং দামেস্কর লোক-জন বৃষ্টির জন্য দোওয়া করতে বাইরে যেতেন। মুয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বারের উপর বসে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আজ আমাদের মাঝের সব চেয়ে ভাল এবং সৎলোককে তোমার নিকট

৩২৬। সহীহ আল-বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৪৭২।

৩২৭। সহীহ আল-বুখারী।

৩২৮। সহীহ আল-বুখারী।

বৃষ্টির জন্য দোওয়া করতে বলছি, হে আল্লাহ! আমরা ইয়াজিদ ইব্নুল আস্‌ওয়াদ আল জুরাশীকে তোমার নিকট দোওয়া করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম, যখন ইয়াজিদ দোওয়া করার জন্য হাত উঠালেন এবং সাথে সব লোকজনও, এত বৃষ্টি হলো যে, লোক-জনের তাদের বাড়ী পৌছতে কষ্ট হলো।^{৩২৯}

তাওয়াস্‌সুলের এই তিনটি পদ্ধতি ছাড়া আর কোন প্রমাণিত পন্থা কুর'আন বা হাদীস থেকে পাওয়া যায় না।

দেওবন্দিগণের মতানুসারে তাওয়াস্‌সুলঃ

মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর কথা অনুসারে দেওবন্দিগণের তাওয়াস্‌সুল সম্পর্কে ধারণা হলো- কোন ধার্মিক ব্যক্তি (নাবী বা ওলী)র গুণের বরকতে দোওয়া কবুল করার জন্য আল্লাহর নিকট সরাসরি দোওয়া করা।^{৩৩০} ‘ফাজায়েলে আ’মাল’ তাওয়াস্‌সুলের এই দ্রাশ্ত ধারণার সমর্থনে কিছু সংখ্যক কাহিনী উদ্ধৃত করেছে।

ফাজায়েলে হাজ্জে হযরত আল্লামা কাস্তালানীর একটি কাহিনী- তিনি বলেন, “একদা আমি এমন মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হলাম যে, ডাক্তার আমার সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করলো। এই অবস্থায় আমি অনেক দিন থাকলাম। ২৮শে জুমাদিউল উলা, ৮৯৩ হিজরীতে আমি যখন মক্কায়; রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ওয়াসীলায় আমার রোগ যন্ত্রণার উপশমের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম, এক লোক এক টুকরো কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজটিতে লেখা ছিল, ‘রাসুলুল্লাহ(সাঃ)র আদেশে এই ঔষধ আহমাদ ইবনে কাস্তালানীর জন্য।’ আমি জেগে দেখলাম আমার অসুস্থতার কোন চিহ্নমাত্র নেই।”^{৩৩১}

সুফী শাইখগণের ‘ওয়াসীলা’ :

দেওবন্দিগণ তাদের সুফী-শাইখ ও মুকব্বীদের ইজ্জতের ওয়াসীলায় বিশ্বাস করেন। ফাজায়েলে আ’মালের লেখক মাওলানা যাকারিয়াহ্ তার বই মাশায়িখ্-ই-চিশ্তে^{৩৩২} তার শাইখ রাশীদ আহমাদ গাঙ্গেহীর শাজরাহ্ উল্লেখ করেছেন (শাজরাহ্ বংশলতিকার মতই, শাজরাহ্‌তে বায়াতের ক্রমানুসারে সুফী-শাইখদের নাম থাকে)।

মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন, ‘শাজরাহ্ পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো, তাওয়াস্‌সুল (আল্লাহর

৩২৯। হাফিজ ইবনে আসাকির তার ‘তারিখ’ বইয়ে বর্ণনা করেছেন (১৮/১৫/১/১)।

৩৩০। কিতাবুল জানায়িয় (হানারফী), পৃঃ ২১-২৪, মাজলিস-উল-উলেমা কর্তৃক প্রকাশিত।

৩৩১। ফাজায়েলে আ’মাল, বাংলা অনুবাদ, ফাজায়েলে হাজ্জ খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, ৬ নং কাহিনী, তাবলীগী ফাউন্ডেশন, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩৩২। মাশায়িখ্-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), ৯ পৃষ্ঠা।

অনুকম্পা লাভের জন্য তাদের শাইখদের নামের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দোওয়া করা), কাজেই শাজরাহর শেষের শাইখ থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে উঠাই বাঞ্ছনীয়” ৩৩৩, ৩৩৪

কুকুরের ওয়াসীলাঃ

মাওলানা যাকারিয়াহ্ আবারো মাশায়েখ্-ই-চিশ্ত বইয়ে একটা বর্ণনা এনেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমার দোওয়া কবুল কর এই কুকুরের মাধ্যমে (ওয়াসীলায়)’ ৩৩৫।

কোন ধার্মিক লোকের ব্যক্তিগত গুণ বা সম্মানকে ওয়াসীলা জ্ঞান করা, যা দেওয়বন্দিগণ উৎসাহিত করেন, কুর’আন এবং সুন্নাহর আলোকে এর কোনই প্রমাণ নেই। কুর’আনে নাবী, রাসুল, ধার্মিক বান্দা ও বিশ্বাসীদের ৩৩৬ অনেক দোওয়া

৩৩৩। এই শাজরাহ্য় সর্বমোট ৩৯ জন সূফী-শাইখগণের নাম আছে। এর শুরুতে নাম আছে খলীল আহমাদ, তারপরে রাশীদ আহমাদ গালোহী। এইভাবে উপরের দিকে তাবেরী হাসান বাসরী (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং এরপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। প্রকৃতপক্ষে আলী (রাঃ) কেই চিশ্তীয়াহ্ ভরীকাহর প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। একটা আশ্চর্যের বিষয়, চিশ্তীয়াহ্ ভরীকাহ্ নামে ভরীকাহ্টি আলী (রাঃ) থেকে কি করে শুরু হলো, যেখানে চিশ্তীর নমুনা শুরু হয়েছে ১৪ জনের পরে?

৩৩৪। মাশায়েখ্-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), ৯ পৃষ্ঠা।

৩৩৫। মাশায়েখ্-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), ৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৩৬। কুর’আনে নাবী-রাসুলদের অনেক দোওয়ার উল্লেখ রয়েছে, তার কিছু নীচে উদ্ধৃত করা হলোঃ

“হে প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের মঙ্গল দান কর এবং পরকালেরও মঙ্গল দান কর এবং দোজখের কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা কর।” {সূরাহ্ বাকারাহ, ২ঃ২০১}।

“আল্লাহর উপর আমরা নির্ভর করলাম, হে প্রতিপালক! আমাদেরকে হালিম সম্প্রদায়ের (বহু-ঈশ্বরবাদী এবং মন্দকর্ষকারী) উৎসীড়নের পাত্ত করোনা। এবং তোমার করুণা দ্বারা অবিশ্বাসী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর।” {সূরাহ্ ইউনুস, ১০ঃ৮৫-৮৬}।

“এবং (স্মরণ কর) ইব্রাহীম বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক। এই শহরকে (মক্কা) নিরাপদ ও শান্তির শহর বানিয়ে দাও, এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রেখো। হে আমার প্রতিপালক। এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সূতরাং, যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাসীল, পরম দয়ালু। হে আমার প্রতিপালক। আমি আমার বংশধরদের কিছুকে অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করলাম এ জন্য যে, তারা যেন যথাবৎ সালাহ্ আদায় করে। এখন, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয়ই, তুমি জান, যা আমরা গোপন করি ও বা আমরা প্রকাশ করি, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। প্রশংসা (কৃতজ্ঞতা) আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ষিক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শুনে থাকেন। হে আমার প্রতিপালক। আমাকে এবং আমার বংশধরদের কিছুকে যথাবৎ সালাহ্ প্রতিষ্ঠাকারী কর। হে আমাদের প্রতিপালক। আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। হে আমাদের প্রতিপালক। যেদিন হিলাব হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা কর।” {সূরাহ্ ইব্রাহীম (১৪ঃ৩৫-৪১)}

“মুসা বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক। আমার বন্ধু (আন্তরিক বিশ্বাস এবং দৃঢ়তা দিয়ে) প্রশস্ত করে দাও। এবং আমার কাজ সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও।” {সূরাহ্ ত্বা-হা (২০ঃ২৫-২৭)}

“হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর, জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ,” {সূরাহ্ আল-হূরুদ্দীন (২৫ঃ ৬৫)}

উল্লেখিত রয়েছে; কিন্তু, এই দোওয়াগুলোর কোথাও নাবী বা ধার্মিক লোকদের মর্যাদার খাতিরে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রার্থনা করা হয়নি।

দেওবন্দিগণের নিষিদ্ধ শ্রেণীর ‘ওয়াসীলা’য় ও বুঝার ভুলঃ

দেওবন্দিগণ শুধুমাত্র অনুমোদিত শ্রেণীর ‘ওয়াসীলা’রই ভুল ব্যাখ্যা করেননা, নিষিদ্ধ শ্রেণীর ‘ওয়াসীলা’রও ভুল ব্যাখ্যা করেন। তারা সরাসরি নাবী বা আওলিয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়াও অনুমোদন করেন না।

মুফতী আব্দুর রাহীম লাজপুরী বলেন, ‘আল্লাহ ব্যতীত শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি বা জিনিস প্রয়োজনের সময় কাউকে সাহায্য বা প্রতিকার করতে পারে, এটা মনে করা অনুমোদিত মাধ্যম (ওয়াসীলা) নয়। এরূপ বিশ্বাস রাখাও ঠিক নয়’।^{৩৩৭}

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন, ‘কোন সৃষ্ট জীবের নিকট দোওয়া করা মুশ্রিকদের পন্থা। এই প্রকারের তাওয়াসুল সর্বসম্মতভাবে হারাম’।^{৩৩৮} এই দু’টি উদ্ধৃতি ‘ওয়াসীলা’র কোন বিষয়ই নয়। কারণ, সরাসরি নাবী বা ওলীদের নিকট চাওয়া, কোন মাধ্যমই নয়। বরং, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সরাসরি কোন প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রার্থনা করা, প্রত্যক্ষভাবে ইবাদাহতে আল্লাহর অংশী স্থাপন করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সাহায্যকারী, প্রতিকারকারী মনে করা, এবং শুধু তারাই প্রয়োজনে সাহায্য করবে মনে করা, এক রকম শিকী আক্বীদাহ।

আরব মুশ্রিকরাও, যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে মূর্তির নিকট প্রার্থনা করতো, তারাও কিন্তু এই মূর্তিগুলো এবং সং লোকদেরও স্বাধীন বা স্বাবলম্বী সাহায্যকারী মনে করতো না। এটা তাদের হাজ্জের তাল্‌বিয়া থেকেও বুঝা যায়। তারা বলতো, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার খিদমাহতে হাজির, তোমার কোন অংশীদার নেই; শুধু একমাত্র অংশী ছাড়া, যে তোমারই অধীনস্থ, তার অধীনে কিছু নেই’।^{৩৩৯}

যখন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ইমরান ইবনে হুসাইনের পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হুসাইন, আজকাল তোমরা কতজন প্রভুর ইবাদাহ কর?’ তার পিতা উত্তর দিল, ‘সাতজন, - ছয়জন এই পৃথিবীর বুকে, আর একজন স্বর্গে’। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, ‘তার মধ্যে কার নিকট থেকে কিছু পাবার আশা কর এবং ভয় কর?’ হুসাইন উত্তর দিল, ‘মিনি স্বর্গে আছেন, তাঁর থেকে’।^{৩৪০}

৩৩৭। ফাতোয়ায়ে রাহিমীয়াহ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫, মুফতী সাইয়িদ আব্দুর রাহীম লাজপুরী।

৩৩৮। কিতাবুল জানায়িয় (হানাফী) থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২১-২৪।

৩৩৯। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), ২য় খণ্ড, হাজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং-২৬৭১।

৩৪০। জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং-২৪৬৫।

আরবের মুশ্রিকদের শিকী কাজ ছিল যে, তারা মৃত ধর্মপ্রাণ লোক এবং ফিরিশ্তাদেরকে আল্লাহর নিকট মধ্যস্থতা করার জন্য ডাকতো। তাদের এইসব কাজের জন্য আল্লাহ বলেছেন, “তারা আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করে, তা তাদের ক্ষতি ও করতে পারেনা, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, ‘এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।’”^{৩৪১} এই কারণেই, তাদের কার্যাবলী আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাহ ও শিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা শিকঃ

দেওবন্দিগণের কিতাবুল জানায়িয (হানাফী) এ বর্ণনা করা হয়েছে, ইসলামী শরীয়াহয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বা কোন সৃষ্ট জীবের নিকট ‘ওয়াসীলা’ হিসেবে প্রার্থনা বা দোওয়া করার কোন অবকাশ নেই। সমস্ত ইবাদাহ ও দোওয়া শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে, এটাই ইসলাম শিখায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুই উদ্দেশ্যে ইবাদাহ বা দোওয়া করা শিক বা বহু-ঈশ্বরবাদ, এবং শিক আল্লাহর বিরুদ্ধে সর্ব নিকৃষ্ট পাপ।^{৩৪২}

যদিও দেওবন্দিগণ জানেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা শিক; তারপরও, ফাজায়েলে আ’মালের ‘ফাজায়েলে সাদাকাহ’ ও ‘ফাজায়েলে হাজ্জ’ খণ্ডে কিছু বর্ণনা আছে, যা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট সরাসরি প্রার্থনার শামিল। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হলো—

১। এই কাহিনীতে ‘একব্যক্তি আমার পিতা (আবু মুহাম্মাদ) এর নিকট আশিটি আশরফী রেখে জিহাদে চলে যায়, এবং বলে যায় যে, আমি ফিরে এসে নেব; তবে, প্রয়োজনে আপনি খরচ করবেন। লোকটি যাওয়ার পর মদীনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং আমার পিতা টাকাগুলি খরচ করে ফেলেন। লোকটি জিহাদ থেকে ফিরে এসে পিতার নিকট টাকাগুলো চাইলো। আমার পিতা আগামীকাল দেয়ার ওয়াদা করলেন। রাত্রিবেলা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্বাবর শরীফ ও মিম্বর শরীফের নিকট খুব বিনয়ের সাথে দোওয়া করতে থাকেন। ফাজরের সময় একটু অন্ধকার থাকতে কেউ বললো, ‘আবু মুহাম্মাদ এই যে, নাও। আমার পিতা হাত বাড়িয়ে নিলেন। লোকটি যে থলেটি দিয়েছেন, তাতে আশিটি আশরফীই ছিল’।^{৩৪৩}

২। অন্য এক কাহিনীতে—শাইখ আবদুস সালাম বিন আবিল কাসিম বলেন, ‘আমার কাছে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন। “আমি মদীনা শরীফে উপস্থিত ছিলাম। আমার নিকট খাবার মত কিছুই ছিলনা। এতে আমি খুব দুর্বল হয়ে গেলাম এবং হুজুরের

৩৪১। সুরাহ ইউনুস, ১০৪১৮।

৩৪২। কিতাবুল জানায়িয (হানাফী), পৃঃ ২১-২৪।

৩৪৩। ফাজায়েলে আ’মাল, বাংলা অনুবাদ, ২য় খণ্ড, তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে হাজ্জ অধ্যায়, ১৬০ পৃষ্ঠা, ২১ নং কাহিনী।

খিদমতে গিয়ে আরজ করলাম, হে দোজাহানের সর্দার! আমি মিসরের বাসিন্দা, পাঁচ মাস পর্যন্ত হুজুরের খিদমতে পড়ে আছি। এখন আল্লাহুর নিকট ও আপনার খিদমতে আরজ করছি, এমন একজন লোক ঠিক করে দিন, যে আমার খবর নিবে, অথবা আমাকে দেশে ফেরার এন্তেজাম করে দিন। হঠাৎ, এক লোক হুজরা শরীফের নিকট এসে কি যেন বললো; অবশেষে, আমার নিকট এসে আমার হাত ধরে বললো, আমার সাথে চলো। সে আমাকে নিয়ে বা'বে জিল্লীল দিয়ে বের হয়ে জান্নাতুল বাকীর উপর দিয়ে একটা তাবুর মধ্যে নিয়ে গেলো। সেখানে খানা পাকিয়ে আমাকে খুব তৃপ্তির সাথে খাওয়ালো। পরে সে দু'টি থলের মধ্যে সাত সের পরিমাণ খেজুর দিয়ে আমাকে বললো, তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, দাদাজানের নিকট আর তুমি অভিযোগ করবেনা, এতে তাঁর খুব কষ্ট হয়। যখনই তোমার খানা শেষ হয়ে যাবে, তোমার নিকট আবার নতুন খাবার পৌছে যাবে। এই বলে সে খেজুরের থলে আপন গোলামকে হুজরা শরীফ পর্যন্ত দিয়ে আসতে বললো। আমি চারদিন পর্যন্ত ঐ খেজুর খেয়েছি, শেষ হয়ে গেলে সেই গোলাম আবার খানা পৌছে দেয়। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ইয়ানুগামী এক কাফেলার সাথে তথা চলে যাই”।^{৩৪৪}

৩। ইব্নে যা'লা (রঃ) বলেন, “আমি মদীনা মোনওয়ারায় বড় অভাবের সম্মুখীন হয়েছিলাম। হুজুরের ক্বাবরের নিকট গিয়ে আরজ করলাম, হুজুর আমি আপনার মেহমান! ইত্যবসরে, আমার একটু চোখ লেগে আসলো। হুজুর (সাঃ) আমাকে একটা রুটি দিলেন, আমি তার অর্ধেক খেলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি, বাকি অর্ধেক আমার হাতে”।^{৩৪৫}

৪। ইউসুফ বিন আলী বলেন, “জনৈক হাশেমী মহিলা মদীনায় বাস করতো। তার কয়েকজন খাদেম তাকে বড় কষ্ট দিত। সে হুজুরের দরবারে ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হলো। রওজা শরীফ থেকে আওয়াজ আসলো, ‘তোমার মধ্যে কি আমার আদর্শের প্রতি আনুগত্যের আশ্রয় নেই? তুমি ছবর কর, যেমন আমি ছবর করেছিলাম’। মহিলা বললো, এই সান্ত্বনার বানী শুনে আমার যাবতীয় দুঃখ মুছে গেলো। এদিকে বদ আখ্লামের খাদেমগুলি মরে গেলো”।^{৩৪৬}

৩৪৪। ফাজায়েলে আ'মাল, বাংলা অনুবাদ, ২য় খণ্ড, তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে হাজ্জ অধ্যায়, ১৬৩ পৃষ্ঠা, ২৮ নং কাহিনী।

৩৪৫। ফাজায়েলে আ'মাল (বাংলা অনুবাদ), ২য় খণ্ড, তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে হাজ্জ অধ্যায়, ১৬১ পৃষ্ঠা, ২৩ নং কাহিনী।

৩৪৬। ফাজায়েলে আ'মাল (বাংলা অনুবাদ), ২য় খণ্ড, তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে হাজ্জ অধ্যায়, ১৫৯ পৃষ্ঠা, ১৬ নং কাহিনী।

৫। আরও একটি কাহিনী- আবু বাকর ইবনে মুকরী বলেনঃ “আমি, ইমাম তিব্রানী ও আবু শায়েখ মদীনা শরীফে ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম। রোজার পর রোজা রাখতাম। রাত্রি বেলা নাবী (সাঃ) এর ক্বাবরে গিয়ে ক্ষুধার অভিযোগ করলাম। যাবার সময় তিব্রানী বললেন, বসে পড়, হয় কিছু খানা, না হয় মৃত্যু আসবে। ইবনে মোনকাদের বলেন, আমি ও আবু শায়েখ দাঁড়িয়ে গেলাম। তিব্রানী বসে কি যেন চিন্তা করছিলো। হঠাৎ আল্ভী গোত্রের একলোক দরজা নাড়া দেয়, আমরা দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম, তার সাথে দু’জন গোলাম, তাদের হাতে বড় বড় দু’টো থলে রেখে আল্ভী গোত্রের লোকটি বলে গেলেন, তোমরা নাবী (সাঃ) এর নিকট অভিযোগ করেছো। আমি স্বপ্নেযোগে নাবী (সাঃ) থেকে তোমাদের নিকট কিছু পৌছাবার আদেশ পেয়েছি”।^{৩৪৭}

দেওবন্দিগণ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর আকীদাহ (বিশ্বাস) এর স্পষ্ট বিপরীতঃ

মাওলানা যাকারিয়াহ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর মাধ্যম (ওয়াসীলা) তালাশের জন্য উৎসাহিত করেন এবং ফাজায়েলে হাজ্জের ১৪০ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “সালাম জানানোর পর নাবী (সাঃ) এর ওয়াসীলায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোওয়া করবে, এবং নাবী (সাঃ) এর নিকট সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করবে। অনেক বিজ্ঞ আলেম এই ধরনের ওয়াসীলা তালাশ করা নিষিদ্ধ করেন।^{৩৪৮}

মাওলানা যাকারিয়াহ উল্লেখিত বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও একজন, যিনি সৎ লোকদের সম্মান ও গুণের বদৌলতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার বিদ’আহ ওয়াসীলাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

প্রমাণ :^{৩৪৯}

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ‘দুররুল মুখতার’ (বিখ্যাত হানাফী ফিকাহ গ্রন্থ) (২/৬৩০) গ্রন্থে আছে ‘একমাত্র আল্লাহর ওয়াসীলা ব্যতীত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা জায়েয নয়। এই ধরনের দোওয়া করা জায়েয, যা আল্লাহ কর্তৃক আদেশকৃত। যেমন, “আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ রয়েছে, অতএব, ঐ সকল নামেই তাঁকে ডাকো।”

৩৪৭। ফাজায়েলে আ’মাল (বাংলা অনুবাদ), ২য় খণ্ড, তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে হাজ্জ খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, ২২ নং কাহিনী।

৩৪৮। ফাজায়েলে আ’মাল (বাংলা অনুবাদ), ২য় খণ্ড, তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে হাজ্জ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, ১৪০ পৃষ্ঠা, ৩২ নং বর্ণনা।

৩৪৯। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানীর ‘তাওয়াসুল এর শ্রকারভেদ ও সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, পৃঃ ৪৫-৪৭।

একই রকম বর্ণনা ‘ফাতোয়ায়ে হিন্দিয়াহ’তেও দেখা যায়। আল-কুদুরী^{৩৫০} তার ফিকাহ শাস্ত্রের বিরাট গ্রন্থ ‘শারাহুল খরখী’ এর ‘ঘূনিত বস্তু’ অধ্যায়ে বলেছেনঃ –
বিশ্ব ইবনুল ওয়ালিদ বলেন, ‘আবু ইউসুফ {ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর খাছ শিষ্যদের মধ্যে একজন} আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, ‘একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহর নিকট দোওয়া করা ছাড়া অন্য কোন পস্থা অবলম্বন করা জায়েয নয়। আমি তাদেরকে ঘৃণা করি, যারা বলে, অমুক অমুকের খাতিরে, অথবা নাবী-রাসুলদের খাতিরে, অথবা পবিত্র ঘরের খাতিরে, অথবা পবিত্র এলাকা (মুযদালিফা)^{৩৫১} এর খাতিরে’।

আয-যুবাইদী শরাহ-ইহীয়াহ (২/২৮৫) গ্রন্থে বলেন, ‘আবু হানিফা (রঃ) এবং তাঁর দুই শিষ্য এক ব্যক্তিকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, যে বলেছিল, ‘আমি তোমার নিকট চাই অমুক অমুকের ওয়াসীলায়, তোমার নাবী-রাসুলদের ওয়াসীলায়, অথবা পবিত্র ঘরের ওয়াসীলায়, এবং পবিত্র এলাকার (মুজদালিফাহ), এবং এই রকম অনেক কিছু’। কিন্তু, আল্লাহর উপর এদের কোনটিরই কোন কর্তৃত্ব নেই। একই ভাবে, আবু হানিফাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী^{৩৫২} এক ব্যক্তিকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি প্রার্থনা করেছিল, ‘হে আল্লাহ! তোমার কুর্সীর মহিমায় তোমার নিকট প্রার্থনা করি।’

আল-কুদুরী আরও বলেছেন, ‘যেহেতু স্রষ্টার উপর সৃষ্টির কোন কর্তৃত্ব নেই, কাজেই, সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু চাওয়া জায়েয নয়।’^{৩৫৩}

এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং তাঁর শিষ্যগণ এই ধরনের ওয়াসীলাকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু, দেওবন্দিগণ আগ্রহভরে এগুলোকে উৎসাহিত করেন। দেওবন্দিগণ নিজেদেরকে গোঁড়া হানাফী বলে দাবী করেন এবং হানাফী মাযহাবের প্রতি অনুগত। ধর্মের প্রতি ক্ষেত্রে এই আশংকায় ইমামের মাযহাব অনুসরণ করেন, যদি পাছে ধর্মচ্যুত হয়ে যান।^{৩৫৪} তারপরও,

৩৫০। ইনি আবু হাসান আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা’ফর ইবন হামদান, ফিকাহ শাস্ত্র বিশারদ এবং তিনি ‘খাতীবুল-বাগদাদী’ এর শিক্ষক ছিলেন। জন্ম-৩৬২ হিঃ, মৃত্যু- ৪২৮ হিঃ।

৩৫১। দেখুন, ‘শরাহ আক্বীদাহ আভ-তাহাবীয়াহ’, পৃঃ ২৩৭।

৩৫২। তিনিও ইমাম আবু হানিফার বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

৩৫৩। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ ‘আল-ক্বা’আইদাতুল-যালিফাহ’তে বর্ণনা করেছেন।

৩৫৪। ‘কিতাবুল ঈমান’-এ বর্ণনা করা হয়েছে ঈমান রক্ষায় অন্ধ অনুসরণ ইসলামে অতীব প্রয়োজনীয়। অন্ধ অনুসরণ ব্যতীত কেউ ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তাক্বুলীদ (কোন মাযহাবকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা) করা শরীয়াতের একটা অবশ্য পালনীয় নির্দেশ...কেউ যদি চারটি মাযহাবের বাইরে সত্যিকার পথনির্দেশ এবং সূন্নাহর অনুসন্ধান করে, তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, এবং সে বিভ্রান্ত হবে...কেউ যদি এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে যায়, তার উপর তা’জির প্রযোজ্য (তা’জির অর্থ, - ইসলামী আদালতের বিচার দ্বারা শাস্ত/কেদাওয়াত/জেল) হবে। কোন মাযহাবকে আঁকড়ে ধরে থাকা শরীয়াহর একটা আবশ্যিক কর্তব্য...এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে গেলে শেষ পর্যন্ত একজনের ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। {কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ৭২-৭৪}।

তারা ওয়াসীলার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)র শিক্ষাকে প্রত্যাখান করেন। মুফতী আবদুর রাহীম লাজপুরী, ‘ফাতোয়ায়ে রাহিমীয়াহ্’র গ্রন্থাকার ও বিখ্যাত দেওবন্দি আলিম, ইমাম আবু হানিফার কথা,- ‘অমুক অমুকের খাতিরে, অথবা নাবী-রাসুলদের খাতিরে, অথবা পবিত্র ঘরের খাতিরে, অথবা পবিত্র এলাকা (মুয়দালফা)-এর

খাতিরে যারা দোওয়া করে, আমি তাদেরকে ঘৃণা করি’ এর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি (মুফতী আবদুর রাহীম লাজপুরী) বলেন, ‘অমুক অমুকের খাতিরে’ বলা সঠিক। কিছু জালাতী ব্যক্তি ‘বাহাক্কে’ শব্দটি সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, এবং ‘স্রষ্টার উপর সৃষ্টির কোন কর্তৃত্ব নেই’, এ কথার উপর নির্ভর করে বিতর্ক করেছেন; কিন্তু, এটা ঠিক নয়’।^{৩৫৫} দেওবন্দিগণ তাদের সত্যনিষ্ঠ ইমামের বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু, তাঁর নাম উচ্চারণ করতে সাহস পাননা। বরঞ্চ, তারা বলেন, ‘অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি একে নিষিদ্ধ মনে করেন’ অথবা ‘কিছু জালাতী ব্যক্তি শব্দটি সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন’ ইত্যাদি। এটা মাওলানা যাকারিয়াহ্ ও মুফতী আবদুর রাহীম লাজপুরী, উভয়ের বিবৃতিতেই পাওয়া যায়।

অন্ধ লোকের সম্পর্কে হাদীসঃ^{৩৫৬}

যারা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ও সৎ লোকের মর্যাদা, সম্মান ও অধিকারের সাহায্যে তাওয়াসুল জায়েয মনে করেন, তারা প্রায়ই এর সমর্থনে অন্ধ লোকের হাদীসটি উল্লেখ করেন। উছমান ইবনে হানিফ বর্ণনা করেছেন ‘এক অন্ধ লোক রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট এসে বললো, ‘আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোওয়া করুন, যেন আমি আরোগ্য লাভ করি।’ তিনি (সাঃ) বললেন, ‘যদি তুমি চাও, আমি তোমার জন্য দোওয়া করবো, আর যদি তুমি ছবর কর, তা তোমার জন্য মঙ্গল।’ তখন সে বললো, ‘তাঁর নিকট দোওয়া করুন।’ অতএব, তাকে (অন্ধ লোককে) ভালভাবে অযু করে দু’রাকা’আত নামাজ পড়তে বললেন এবং নিম্নের দোওয়াটির মাধ্যমে প্রার্থনা করতে বললেন- ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার দয়াল নাবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে তোমার দিকে রুজু হই। হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমার প্রয়োজন যাতে পূর্ণ হয়, সে জন্য তোমার (দোওয়ার) মাধ্যমে আমার রাবের দিকে রুজু হয়েছি।’ এই দোওয়া করার পর লোকটি ভালো হয়ে গেল’।^{৩৫৭}

৩৫৫। ফাতোয়ায়ে রাহিমীয়াহ্ (ইং অনুঃ) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫।

৩৫৬। শাইখ্ নাসিরুদ্দিন আলবানীর ‘তাওয়াসুল, এর প্রকারভেদ ও সিদ্ধান্ত’ বই থেকে উদ্ধৃত।

৩৫৭। মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে (৪/১৩৮), আভ-তিরমিযী (২৮১-২৮২, ইবনে মাজাহ্ (১/৪১৮) এবং অন্যান্য।

এই হাদীসটি মর্যাদা বা সম্মানের খাতিরে তাওয়াসসুল প্রমাণ করে না। বরং, এটা তৃতীয় প্রকারের আইনসঙ্গত ও জায়েয তাওয়াসসুলই প্রমাণ করে। অর্থাৎ, সংলোকের দোওয়ার মাধ্যমে তাওয়াসসুল।

(ক) যে অন্ধ লোকটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট এসেছিল, তার ইচ্ছা ছিল নাবী (সাঃ)এর দোওয়ার মাধ্যমে তাওয়াসসুল অর্জন (তৃতীয় প্রকারের তাওয়াসসুল), এবং সেই জন্যই সে বলেছিল, ‘আল্লাহর নিকট দোওয়া করুন, যেন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। যদি অন্ধ লোকটি রাসুল (সাঃ) এর মর্যাদা বা সম্মানের খাতিরেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ চাইতো, তা’হলে তো তার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট গিয়ে দোওয়া করতে বলার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সে পিছনে থেকেই সরাসরি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নাম, মর্যাদা ও অবস্থানের কথা উল্লেখ করেই দোওয়া করতে পারতো। সে একজন আরবী ভাষি লোক ছিল, এবং আরবীতে তাওয়াসসুলের অর্থও পুরোপুরি বুঝতো। ‘তাওয়াসসুল’ অর্থ—একজন সংলোককে দোওয়া করতে বলা; এটা শুধু মাধ্যম হিসেবে কারো নাম উল্লেখ করে প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তির কোন বক্তব্য নয়।

(খ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অন্ধ লোকটির জন্য দোওয়া করেছিলেন, এবং তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, একথা বলার জন্য যে, ‘হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে তাঁর আর্জি কবুল কর এবং আমার আর্জিও তাঁর জন্য।’ কিন্তু তর্ক করা হয়, এই দোওয়ায় যে ‘শাফাআহ্’ উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই মাধ্যম।

‘শাফাআহ্’ অর্থ—যদি মধ্যস্থতাই হয়, তবে, এখানে অন্ধ লোকটির শাফাআহ্ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য কি? অতএব, এখানে শাফাআহ্ অর্থ, দোওয়া। তার মানে- ‘হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে তাঁর দোওয়া কবুল কর এবং আমার দোওয়াও তাঁর জন্য’। ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং তোমার রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মাধ্যমে তোমার দিকে রুজু হই’— এই বর্ণনাটির অর্থও ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং তোমার রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর (দোওয়ার) মাধ্যমে তোমার দিকে রুজু হই’। এটা ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মাধ্যমে রুজু হওয়া বুঝায় না।

উপসংহারঃ

এই পরিচ্ছেদে আমরা তাওয়াসসুলে তিনটি জায়েয পদ্ধতি পেয়েছি। কিন্তু, সংলোকের মর্যাদা এবং সম্মানের খাতিরে দোওয়া করা তার অন্তর্গত নয়। বরঞ্চ, এই ধরণের তাওয়াসসুল, যা দেওবন্দিগণ অনুসরণ করেন, তা'বিদ'আহু। দেওবন্দিগণ যাকে অনুসরণ করেন বলে দাবী করেন, সেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ)ই এর নিন্দা করেছেন।

আমরা আরও দেখেছি, দেওবন্দিগণ ভ্রান্তিপূর্ণ ওয়াসীলায় সংলোকদের নিকট সরাসরি যে প্রার্থনা করেন, এটা কোন ওয়াসীলাই নয়; বরং, প্রত্যক্ষ শির্ক। ফাজায়েলে আ'মালে অনেক কাহিনী উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা লোকদেরকে সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করে, এবং যা কোন ভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায়না, বা যথার্থতা প্রমাণ করা যায়না।

৮ম অধ্যায়

ইসলামে ইবাদাহ

অবতরণিকা :

ইবাদাহ ইসলাম ধর্মের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি পরিভাষায় ইবাদাহ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব কথা বা কাজগুলো দিয়ে ইসলামকে পরিবেষ্টন করে আছে; যেগুলিকে আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং করলে খুশী হন। এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসার রূপ প্রকাশ করে। একারণে সালাহ, যাকাত, সওম, হাজ্জ, কথায় সত্যবাদিতা রক্ষা করা, একজনের বিশ্বাসকে পূর্ণ করা, মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করা, আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক, প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় হওয়া; ইয়াতীম, গরীব, মুসাফির এবং অধীনস্থ মানুষ অথবা জীব-জন্তুর প্রতি সদয় হওয়া, দোওয়া করা, আল্লাহ্র স্মরণ, কুর'আন তিলাওয়াত এবং এই রকম সকল কাজই ইবাদাহ্র অন্তর্ভুক্ত।^{৩৫৮}

ইবাদাহ্র গুরুত্ব নিম্নের আয়াত থেকে অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীম কুর'আনে বলেন, “ওধুমাত্র আমার ইবাদাহ্র উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্যকিছুর জন্য জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করিনি।”^{৩৫৯} যেহেতু, ইবাদাহ্ই মানব জাতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়, সেহেতু, আল্লাহ্ বলেন, “হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর দাসত্ব কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টিকর্তা, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার।”^{৩৬০} এর পরেই আল্লাহ্ অংশী স্থাপনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, “অতএব, তোমরা যখন এ সব কথাই জান, তখন, কাউকেও আল্লাহ্র প্রতিপক্ষ দাঁড় করিওনা।”^{৩৬০}

মু'য়াজ্জ বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন— আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘হে মু'য়াজ্জ! তুমি কি জান, আল্লাহ্র প্রতি বান্দাদের কি দায়িত্ব রয়েছে?’ আমি (মু'য়াজ্জ বিন জাবাল) বললাম, ‘আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) ই ভাল জানেন।’

৩৫৮। ইবনে তাইমিয়ার দাসত্বের উপর লেখা প্রবন্ধের উপক্রমণিকা থেকে উদ্ধৃত।

৩৫৯। সূরাহ্ আয-যারিয়াত, ৫১ঃ৫৬।

৩৬০। সূরাহ্ বাকারাহ্, আয়াত ২ঃ২১-২২।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘আল্লাহর প্রতি বান্দাদের দায়িত্ব, শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাহ করা, এবং কাউকেই তাঁর ইবাদাহয় অংশীদার না করা।’ তারপর, তিনি বললেন, ‘তুমি কি জান, বান্দার প্রতি আল্লাহর দায়িত্ব কি?’ আমি উত্তর দিলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) ই ভাল জানেন।’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া (যদি তারা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাহ করে)।’^{৩৬১}

এসব উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, যদি কেউ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলার ইবাদাহ পরিত্যাগ করে, সে শুধু সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ধ্বংস করে না, বরং, আল্লাহর প্রতি তার দায়িত্বও অস্বীকার করে। ইবাদাহ, আল্লাহর প্রতি বিনয়ের প্রতীক, আর ইবাদাহ পরিত্যাগ করা গর্ব ও অহমিকার প্রতীক। আল্লাহ বলেন, “পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর ইবাদাহকে লজ্জাজনক মনে করে এবং গর্ব করে, আল্লাহ তাদেরকে মর্মভূদ শাস্তি দিবেন। এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।”^{৩৬২}

ইবাদাহ সম্পর্কে সুফীদের ধারণাঃ

ইবাদাহ সম্পর্কে সুফীদের ধারণা, গোঁড়ামি ও বিদ’আহর বিভ্রান্তির বেড়া জালে ঘুরণায়মান। ফাজায়েলে নামাজ, সাদাকাহ অথবা দরুদ, সমগ্র ফাজায়েলে আ’মালে পরিলক্ষিত হয়। ইবাদাহ সম্পর্কে সুফীদের ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের মোটামুটি একটা বিশ্লেষণ করার জন্য এই পরিচ্ছেদে যিক্র ও এর সাথে সম্পৃক্ত সুফীদের ধারণার উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত করবো।

‘যিক্র’- আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলার স্মরণঃ

কুর’আন ও হাদীসে যিক্র অথবা আল্লাহর স্মরণের উৎস হিসেবে ইবাদাহ, জুম’আ, দোওয়া, সদুপদেশ, কুর’আন তিলাওয়াত; এমনকি, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ইবাদাহর মত যিক্রও একটা ব্যাপক অর্থবোধক নীরবে উচ্চারিত শব্দ, যা আল্লাহকে খুশী করে। এটা বুঝা যায় আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর এক খানা হাদীস থেকে, ‘আল্লাহর স্মরণ ও এর সহায়ক কাজসমূহ, আলিম ও শিক্ষানবীশ ব্যতীত পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে, তার সবই অভিশপ্ত।’^{৩৬৩} আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা অনুমোদিত ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী সুবহানা রাব্বিওয়াল আযীম’, শাহাদাহ, সালাহর পর তাসবীহ, ইত্যাদি

৩৬১। সহীহ আল-বুখারী ৯৯ খণ্ড, হাদীস নং-৪৭০ এক সহীহ মুসলিম।

৩৬২। সূরাহ নিসা, (৪২১ ৭৩-১৭৪)।

৩৬৩। সুনানে ইবনে মাজাহ (নং ৪১১২), সহীহ আল-জামী’তে নাসিরুদ্দিন আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহর প্রশংসা সূচক বাক্যসমূহ এবং আল্লাহর নামসমূহ উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করা... যিক্রের অন্তর্ভুক্ত। অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য যিক্র হলো— কুর'আন তিলাওয়াত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উপর দরুদ পড়া ও হাদীস অনুমোদিত দোওয়া সমূহ পড়া।

বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ তাঁর অধিক স্মরণ করার জন্য আদেশ করেছেন, “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে।”^{৩৬৪} সচেতনতাসহ মনোযোগীভাবে আল্লাহর স্মরণ, একজন মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে সতর্ক রাখে, বিশ্বাস বৃদ্ধি করে, তাকওয়া সুদৃঢ় করে এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আনে। “বিশ্বাসীতো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।”^{৩৬৫} “যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ, —আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।”^{৩৬৬}

কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতগুলো যিক্রের বৈশিষ্ট্য এবং কাঙ্ক্ষিত ফল প্রকাশ করে। যাই হোক, যিক্র সম্পর্কে সুফীগণের নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা আছে, এবং তা থেকেই এক সময় তারা সহীহ যিক্রকে অতিরঞ্জিত করে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। যেমন কেউ কেউ ‘ইহঁ’ বলে যিক্র করে, যার অর্থ ‘সে সে’, এটা কোন সূন্য অনুমোদিত যিক্র নয়, বা এর কোন অর্থও নেই। তাদের যিক্রে সময়, উচ্চারণের স্থান, অবস্থান ও স্থান-প্রস্থাসের উপর শর্তারোপ করে।

এমনকি, সুফীগণ তাদের যিক্র-এ যে ফল লাভের দাবী করেন, কোন মতেই কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত যিক্র-এর ফলাফলের সাথে তার সাদৃশ্য বা অনুমোদন নেই।

সুফীগণ কোন কোন সময় যিক্র-এর তিস্কতার আতিশয্যে তাদের দেহ-মনের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেন, এবং তাদের মুখ থেকে আতিভৌতিক কথা-বার্তা বের হয়ে আসে। দেওবন্দিগণের বইয়ের উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে যিক্র সম্পর্কে সুফীগণের ধারণার পূর্ণ বিশ্লেষণ আসছে।

৩৬৪। সূরাহ আল-আহযাব, (৩৩ঃ৪১)।

৩৬৫। সূরাহ আনফাল, (৮ঃ২)।

৩৬৬। সূরাহ আদ-রাদ, (১৩ঃ২৮)।

ইবাদাহুয় সুফীদের অতিরঞ্জন ও নব উদ্ভাবন (বিদ'আহ)

(১) আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ব্যতীত অন্যদের থেকে যিক্র গ্রহণঃ

ইরশাদুল মূলক গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে যিক্র-এ শর্তারোপ করা হয়েছে, সাহাবাগণ যেমন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যিক্র গ্রহণ করতেন, তেমনি যিক্র-এ পারদর্শী কোন শাইখ্ থেকে যিক্র গ্রহণ করতে হবে।^{৩৬৭} ইরশাদুল মূলকে দেয়া শর্ত সুফীদেরকে তাদের মুরিদদের জন্য নতুন ধরনের যিক্র নির্ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। সুফী শাইখ্গণকে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর সাথে তুলনা করা একটা মারাত্মক ভুল এবং ঔদ্ধত্য; কারণ, সাহাবাগণ পথনির্দেশের জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপদেশ গ্রহণ করতেন এই জন্য যে, ঐশী প্রত্যাদেশের প্রাপক একমাত্র রাসুলুল্লাহ (সাঃ)ই ছিলেন। যেহেতু, সুফী শাইখ্গণ কোন ঐশী প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নয়, অতএব, তাদের শিষ্যরা যিক্র তাদের নিজদের উৎস থেকেই পায়। কাজেই, এরকম তুলনা করা মারাত্মক ভুল এবং জঘন্য ধৃষ্টতাপূর্ণ; কারণ, তুলনা কেবল সমকক্ষের সাথেই হতে পারে।

আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর, আর (তা না করে) তোমাদের কর্ম ব্যর্থ করোনা।’^{৩৬৮} সূন্নাহ ব্যতীত ধর্মীয় কোন কিছু কখনও কল্যাণকর হতে পারে না, বা পথনির্দেশের উৎস হতে পারে না। এজন্য সুফীগণের যিক্র-এর উৎস কঠোর, নির্যাতনমূলক, উৎকণ্ঠামূলক ও বাতিল, যা আমরা এই পরিচ্ছেদে অনেক প্রমাণ সহ দেখতে পাবো ইনশা'আল্লাহ।

(২) সুফীগণের যিক্র-এর রীতি/কার্যধারাঃ

ইরশাদুল মূলক থেকে, ‘যাকিরকে (যিক্রকারী) তার শরীর, কাপড় ও জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অজু ও গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে, তারপর, কিব্লামুখী হয়ে দু'হাত হাঁটুর সমান করে উরুতে রেখে তাশাহুদের ভঙ্গিতে বসতে হবে। বিকল্পভাবে, ডান হাতের পাতার পিছন দিক বাম হাতের তালু দিয়ে ধরতে হবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। তারপর, চোখ বন্ধ করে, হয় নীরবে অথবা সামান্য উঁচু স্বরে, যেভাবে শাইখ্ বলেন; মন থেকে সমস্ত সূচীস্তা ও দৃষ্টিস্তা সর্বশক্তি দিয়ে দূর করে দিয়ে আল্লাহর দিকে মন রুজু করে অবিরত ভাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়তে হবে। ‘লা ইলাহা’ বলার সময় শ্বাস বাইরে ফেলতে এবং ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় শক্তি দিয়ে শ্বাস ভিতরে টানতে হবে’।^{৩৬৯}

৩৬৭। ইরশাদুল মূলক, ইংরেজী অনুবাদ, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৬৮। সূরাহ মুহাম্মদ ৪৭ঃ ৩৩।

৩৬৯। ইরশাদুল মূলক, ইংরেজী অনুবাদ, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা।

এই উদ্ধৃতিতে সুফীগণের যিক্র-এর যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তা সুন্নাহ্য় প্রমাণিত নয়। সুফীগণ তাদের ‘যিক্র-এর শাইখগণের’ নির্দেশ মোতাবেক ‘যিক্র’ এর কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

(৩) ‘যিক্র-এর মাধ্যমে ফানা’ অর্জনঃ

শামাইম-ই-ইমদাদিয়াহ্ থেকে ‘ওয়াহ্দাতুল-ওজুদ’ এর বাস্তবতা শুধুমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন, শিষ্য সকল বিপদকে অগ্রাহ্য করে কঠোর চেষ্টার মাধ্যমে নিজের মন থেকে দূরে চলে যায়। কারণ, একজন যখন নিজের সচেতনতা হারায়, সে সবই হারায়। আল্লাহ্ ছাড়া তার চিন্তা বা দৃষ্টিতে কিছুই থাকে না। সুতরাং, শিষ্যের সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌তে কেন্দ্রীভূত হয়। যখন তার মনোযোগ বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত না হয়, তখন তার মন আল্লাহ্‌য় স্থিতি লাভ করে; তারপর, যখন সে চোখ খুলে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। (এই অবস্থায়) তার ‘হুঁ (সে সে)’ যিক্র ‘আনা আনা (আমি আমি)’ তে পরিবর্তিত হয়। এই পর্যায়কে ‘ফানা ফিল্লাহ্’ বলা হয়ে থাকে। বিশেষ উম্মাহ্ বায়াজিদ বোস্তামী বলেছিলেন, ‘সুবহানী মা’আ’যাম শা’নি (সমস্ত ক্রটি থেকে আমি বহু দূরে, কত মহান আমার অবস্থান)’। অনুরূপভাবে, মানসুর হালাজ বলেছিলেন, ‘আনাল হাক্ক’ (আমিই সত্য)।^{৩৭০}

সুফীগণের বিশ্বাস এবং যিক্র-এর মাধ্যমে তারা কি অর্জন করতে চায়, এই উদ্ধৃতিতেই তা বুঝা যায়। তাঁদের যিক্র তাঁদেরকে ওয়াহ্দাতুল-ওজুদের অনুভূতি এনে দেয়, যা তাঁরা দাবী করেন।

(৪) নির্জন ও বিচ্ছিন্নাবস্থায় যিক্র :

ইরশাদুল মূলক বর্ণনা করে, ‘খালওয়াত খানা (নির্জন জায়গা), এত ছোট হতে হবে যে, একজন লোক যিক্র এর সময় শুধু পা আড়াআড়ি করে বসতে পারে এবং সালাহ্‌র সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভেতরটা অন্ধকার হতে হবে, দিনের আলো, সূর্যের আলো ভেতরে প্রবেশ করা বন্ধ রাখতে হবে’।^{৩৭১}

যারা অন্যায়ে অভ্যস্ত, এরকম কয়েদীদের চরম শাস্তি দেবার জন্য সংরক্ষিত নির্জন ও বিচ্ছিন্ন ঘর, যা অন্যান্য কয়েদীদের থেকে আলাদা এবং সূর্যের আলো ও মুক্ত-বায়ুহীন। খালওয়াত খানা এরকমই একটা ঘর। এরকম নিজে নিজে শাস্তি গ্রহণ করার রীতি আল্লাহ্ বা তাঁর রাসুল (সাঃ) দেননি। আল্লাহ্ বলেন, “আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বস্তি বিধান করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য কোন কিছু কঠিন

৩৭০। শামাইম-ই-ইমদাদিয়াহ্, ৩৬ পৃষ্ঠা।

৩৭১। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ), ৬৯ পৃষ্ঠা।

করতে চান না”।^{৩৭২} এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ‘খিলওয়াহ্’ সুফীগণের একটা নিজস্ব প্রচলিত রীতি- ইহজাগতিক কাজ-কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে একজনের নির্দিষ্ট সময়কে পুরোপুরি আল্লাহর ইবাদাহ্‌য় উৎসর্গ করা। সুফীগণের আলো-বাতাসহীন আবদ্ধ ঘরে নির্জনবাসের সাথে ইতিক্বাফের কোন মিল নেই। সুফীগণের মত, সমাজকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার চরমতম বিশ্বাস নিয়ে মাসজিদের ইতিক্বাফ করা হয় না। সুফল লাভ করার জন্য অনর্থক কথাবার্তা, চঞ্চলতা, ইত্যাদি পরিত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই ইসলাম শেখায়। যেমন, ইবনে আউন বলেছেন, ‘ইসলামের তিনটি জিনিস আমার ও আমার ভাইদের জন্য পছন্দ করি। তারমধ্যে একটি- (তাদের জন্য) ভাল কিছু করার ইচ্ছায় জনসাধারণকে তাদের মত চলতে দেওয়া উচিত’।^{৩৭৩}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘মু’মিনদের মধ্যে যারা মানুষের মাঝে থাকে এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত ক্ষতি থেকে সবার করে, তারা, মু’মিনদের মধ্যে যারা মানুষের মাঝে থাকে না এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত ক্ষতি থেকে সবারও করে না, তাদের চেয়ে উত্তম’।^{৩৭৪}

ফাজায়েলে আ’মালে মাওলানা যাকারিয়াহ্ বর্ণনা করেছেন, “হাতিম আছেন বখলী একজন কঠোর সংযমী সুফী ছিলেন, তিনি ত্রিশ বৎসর নিজেকে এক আবদ্ধ ঘরে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। তীব্র প্রয়োজন ব্যতীত তিনি কারো সাথে কথা বলতেন না। যখন তিনি রাসুল (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহ্ করেন, তিনি শুধু বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আমরা তোমার মাহবুবের ক্বাবরে এসেছি। আমাদের ইচ্ছাকে পূর্ণ না করে আমাদেরকে ফেরত দিওনা’। উর্দাকাশ থেকে এক আওয়াজ হলো, ‘নিশ্চয়ই, তোমাদের সর্বোত্তম ইচ্ছাকে কবুল করার জন্যই তোমাদেরকে আমার মাহবুবের ক্বাবর যিয়ারাহ্‌র তৌফিক দান করেছি। এখন চলে যাও, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা এখানে আছে- সবাইকে মা’ফ করে দিয়েছি’।^{৩৭৫}

কাহিনীটি শুধুমাত্র সুফীগণের ‘খিলওয়াহ্’কেই অনুমোদন দেয়নি, বরঞ্চ, যারা এটাকে প্রশয় দেয় তাদের জন্যও বিরাট মর্যাদা নির্ধারণ করেছে। ছোট্ট ঘর, খানকাহ্ অথবা ক্বাবরে সুফীগণের নির্জন বাসের রীতিকে সামনে রেখেই মাওলানা ইলিয়াস তাঁর তাবলীগ জামা’আতের জন্য নির্ধারিত তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন বা চার মাসের

৩৭২। সূরাহ্ বাক্বারাহ্, (২ঃ ১৮৫)।

৩৭৩। সহীহ্ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ, ২৮২ পৃষ্ঠা।

৩৭৪। হাদীসটি সহীহ্, ইবনে মাজাহ্ ও তিরমিযীতে বর্ণিত।

৩৭৫। ফাজায়েলে আ’মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে হাক্ক, ৯ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৬৯, ৪ নং কাহিনী (নতুন সংস্করণ ১৯৮২, দ্বীন বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

জন্য ভ্রমণ নির্ধারণ করেছিলেন। সুফীগণ চল্লিশ দিনকে চিল্লাহ বলে থাকেন, তাবলীগ জামা'আতও একই শব্দ ব্যবহার করে থাকে।^{৩৭৬} সুফীগণ দাবী করেন, চিল্লাহ পবিত্রতার উৎস হিসেবে কাজ করে। 'চল্লিশ বা চিল্লাহ', সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এক অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'একদা এক ভক্ত তার এক বৃজুর্গ (সুফী শাইখ) এর দর্শন লাভের জন্য গিয়ে তার শাইখকে দেখে সে অত্যন্ত কষ্ট পেলো। বৃজুর্গ জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কি?' সে বললো, 'এখানে এসে আমি এক অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, আপনার মুখ একটা শুকরের মুখের মত দেখাচ্ছে'। বৃজুর্গ বললো, 'যাও এক চিল্লাহ (৪০ দিন) সময় ব্যয় করে এসো'। যখন ভক্ত চিল্লাহ থেকে ফিরে এলো, তার বৃজুর্গের মুখ তার কাছে একটা কুকুরের মুখের মত দেখালো। তখন তাকে আরো এক চিল্লাহ খরচ করতে বলা হলো। ফিরে এসে দেখলো, তার বৃজুর্গের মুখ বিড়ালের মুখের মত দেখাচ্ছে। বৃজুর্গের হুকুমে আবার সে চিল্লাহয় চলে গেলো, পরিশেষে ফিরে এসে তার বৃজুর্গের মুখ মানুষের মুখের মত দেখলো। বৃজুর্গ বললো, 'এই শয়তানগুলো তোমার ভেতর ছিলো। আমি একটা আয়না মাত্র। তুমি আমার মাঝে যা দেখছো, তোমার অবস্থা ঐরকমই ছিলো'।^{৩৭৭}

(৫) যিকর-এ শ্বাস বন্ধ রাখা :

যিকরে এ আর একটি নতুন সংযোজন, যা সুফী শাইখগণের দ্বারা নির্দেশিত। এর অনেক উদাহরণ সুফীগণের বইয়ে পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিটি প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের যোগী-তাপসদের পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'শাহ আবু সাঈদ নু'মানী একবার তাজাল্লী অনুভব করার জন্য ইচ্ছুক হলেন, যা তিনি আগেও অনুভব করেছেন। তারপর, একদিন তিনি হাবছ-ই-দম-এ শাগল (দম বন্ধ) করে বসলেন। তিনি কৃতসংকল্প হলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাজাল্লী প্রকাশ না হবে, ততক্ষণ, শ্বাস গ্রহণ করবেন না; যদিও নীরস জীবন যাপনের চেয়ে তা তার মৃত্যুর কারণ হয়। তাজাল্লী প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা তিনি দম বন্ধ করে ছিলেন'।^{৩৭৮}

মাওলানা যাকারিয়াহ আর এক জায়গায় বলেছেন, 'হযরত নিজামুদ্দিন আল-উমারী একদমে ৯০ বার 'আল্লাহ' পড়ার জন্য তাঁর শাইখ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছিলেন

৩৭৬। দেখুন, 'The Soofi Practices of Moulana Muhammad Ilyas' by Anwarul-Haq [Awake, Vol. 4, No. 10, P-37]

৩৭৭। মাকতুবাতে ওয়া মালফুযাত আশরাফিয়াহ (আশরাফ আলী থানভীর বক্তব্য ও লেখা থেকে), আশরাফ আলী থানভীর জীবনী লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ, ২৯৯ পৃষ্ঠা।

৩৭৮। মশাইখ-ই-চিশ্ত ইংরেজী অনুবাদ, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

এবং তার সামর্থ্য অনুসারে এই সংখ্যা বাড়াতে বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, তিনি একদমে ৪০০ বার ‘আল্লাহ’ পড়ার সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন’।^{৩৭৯}

(৬) যিক্রের সংখ্যার অতিরঞ্জনঃ

ফাজায়েলে আ’মালে যিক্র এর সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘যারা দৈনিক এক লাখ পঁচিশ হাজার বার দরুদ পাঠায়, তারাই সৌভাগ্যবান-ধার্মিক। আমাদের পরিবারের পূর্ব-পুরুষের এক ধার্মিক ব্যক্তি থেকে এই সংখ্যাটা গুনেছিলাম’।^{৩৮০}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপর দরুদ পড়া অত্যন্ত প্রশংসার কাজ। কিন্তু ১,২৫,০০০ বার দরুদ পড়া আল্লাহর রাসুল (সাঃ) থেকে অনুমোদিত নয় (যদিও এটা প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পাদন করা সম্ভব হয়)। তা ছাড়াও, সুফীগণ নিয়মিত যিক্র এর মাধ্যমে দুনিয়াকে পরিশোধন এবং বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেতে বলেন। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘শাইখ মুহাম্মাদ বিন শাইখ আ’রিফ আধ্যাত্তিক পর্যায়ে ইস্তিঘরা’ক্ব (আত্মীকরণ) এর উচ্চ স্তরের পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন, যাকে, ‘মুশাহাদ-ই-মুতলাক্ব (সর্বক্ষণ বাতিনী মনে স্বর্গীয় স্বত্ত্বায় অবস্থান)’ বলেন’।^{৩৮১}

তারা আরো দাবী করেন যে, সুফীগণের মন মর্যদা সর্বদা যিক্র এ মগ্নগুল, তাঁদের মৃত্যুর পরও যিক্র জারী থাকে। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গান্ধেহীর মৃত্যুর পর, শাইখ রুকনুদ্দিন তাঁর গোসল দেবার পর হযরতের আশীর্বাদপুত্র বুকে হাত দিয়েছিলেন। তিনি যিক্র-ই-ক্বালবী (আত্মার যিক্র) এর কম্পন অনুভব করেন’।^{৩৮২}

সাহাবী (রাঃ) গণ যারা সন্দেহাতীত ভাবে শ্রেষ্ঠ ইবাদাহ্কারীগণের মধ্যে গণ্য, মৃত্যুর পরে তাদের আত্মা থেকে এরকম আত্মীকরণ বা যিক্র এর কোন নমুনা আমরা পাই না। তা ছাড়া যিক্র জিহ্বার কাজ, আত্মার নয়। যেমন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের জিহ্বাকে অবিরতভাবে আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত রাখ’।^{৩৮৩}

৩৭৯। মাশাইখ-ই-চিশ্ত ইংরেজী অনুবাদ, ১৯২ পৃষ্ঠা।

৩৮০। ফাজায়েলে আ’মাল, (ইং অনুঃ) ফাজায়েলে দরুদ, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১০ {১৯৮৫ সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো-দিগ্বী কর্তৃক প্রকাশিত}।

৩৮১। মাশাইখ-ই-চিশ্ত, ইংরেজী অনুবাদ, ১৭১ পৃষ্ঠা।

৩৮২। মাশাইখ-ই-চিশ্ত, ইংরেজী অনুবাদ, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৩৮৩। আত্ম-তিরমিযী, হাঃ নং-১৪৪৩।

ইসলামে কাজের সংখ্যার উপর আল্লাহর পুরস্কারের কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং, কাজ কবুল হয়, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর আদেশানুবর্তীতার উপর। নিম্নে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে ইত্তিবা (আজ্ঞানুবর্তীতা) র গুরুত্ব বুঝা যায়।

“তিন ব্যক্তির একটা দল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে এবং আল্লাহর কি কি ইবাদাহ করেন, তা জানার জন্য নাবী (সাঃ) এর বিবিদের ঘরে আসেন। ইবাদাহ সম্পর্কে যখন তাঁরা সব জানলেন, তাঁদের ধারণা হলো যে, তাঁদের ইবাদাহ অত্যন্ত কম। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহই মা’ফ করে দেয়া হয়েছে। তখন তাদের একজন বললেন, ‘সারা জীবন আমি রাতভর ইবাদাহ করবো’ অন্য একজন বললেন, ‘আমি সারা বৎসর অনবরত রোজা রাখবো এবং রোযা ভঙ্গ করবোনা।’ তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, ‘আমি জীলোকদের থেকে দূরে থাকব এবং কখনও বিবাহ করবোনা।’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাদের এইসব কথাবার্তা শুনলেন, তিনি তাঁদেরকে ডেকে বললেন, “তোমরা কি তাঁরাই, যারা এই এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে, তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সব চেয়ে বেশী ভয় করি এবং বেশী ধর্মভীরু; এর পরও, আমি রোযা রাখি, আবার রোযা ভঙ্গও করি, ইবাদাহ করি, আবার ঘুমাইও এবং জীলোকদের বিবাহও করি। অতএব, যে আমার সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে আমার দলের নয়।” ৩৮

কাজেই, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর ইত্তিবা (আজ্ঞানুবর্তী হওয়া)র সাথে ইবাদাহ না করলে, তা অনাবশ্যিক হয় এবং কোন ফল পাওয়া যায়না। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তো ইবাদাহ করার জন্যই উৎসাহ দান করেন এবং এই তিন ব্যক্তি সেই পবিত্র ইবাদাহ ও রোযাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, এইসব ইবাদাহ কোনই কাজে আসবে না এই জন্য যে, তা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর ইত্তিবা মোতাবেক নয়। যদিও তাদের ইচ্ছা ছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাহ করা এবং তাঁকে খুশী করা।

দেওবন্দিগণের মতানুসারে যিক্র এর কার্যকারিতা ও সুফল

সুফী যিক্র (রিয়াযাহ্ এবং শুগুলও বলা হয়) এর আক্বীদাহ, পদ্ধতি ও অতিরঞ্জন বিশ্লেষণ করার পর, দেওবন্দিগণ তাঁদের বইয়ে যিক্র এর ফলাফল সম্পর্কে যে দাবী করেছেন, আমরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করি।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত দৃশ্যাবলী প্রকাশিত হওয়াঃ

ইরশাদুল মূলক বইয়ে বর্ণিত হয়েছে, “মুকাশাফাত-নুরানী (অপার্থিব আলোপ্রভা) দৃশ্য তৈরী হয়। অন্তরের পবিত্রতা, যিক্র ও শুগুল এর প্রভাবে কোন কোন সময় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ঘটনাবলী দৃশ্যমান হয়”^{৩৮৫}।

যিক্র দেহকে ছিন্নভিন্ন করেঃ

মাওলানা যাকারিয়াহ্ উল্লেখ করেছেন, ‘একবার এক আলিম হযরত মিয়াঁজীকে এক ওলীর কাহিনী বলতে অনুরোধ করলো, যার (ওলীর) শরীর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিল। হযরত মিয়াঁজী এই অবস্থা সম্পর্কে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর (আলিমের) কাছে তাঁর (মিয়াঁজীর) চাচার কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, যিনি মিয়াঁ সাহেবকে দর্শন করেছিলেন, যখন তাঁর (মিয়াঁজী) সর্ব শরীর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ছিল। যখন সে (মিয়াঁজীর চাচা) হযরত মিয়াঁ সাহেবকে দেখে ফেলেছিলেন, তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ জোড়া লেগে গিয়েছিল এবং তিনি উঠে বসে বলেছিলেন, তুমি যা দেখেছো, প্রকাশ করোনা।’^{৩৮৬}

মৃতের দেহে আত্মার প্রবেশঃ

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী বলেন, ‘রুহ্ জীবিত মানুষের দেহ থেকে বের হয়ে মৃত মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। রিয়াযাহ্ (অত্যাধিক যিক্র) এর মাধ্যমে এটা অর্জন করা যায়।’^{৩৮৭}

যিক্র মন ও দেহের সুস্থতা নষ্ট করে দেয় এবং নাচন উৎপন্ন করেঃ

মাওলানা যাকারিয়াহ্ উল্লেখ করেছেন, ‘আব্দুল হাক্ক কুদ্দুস গাগোহী যিক্রে মোহাবিষ্ট হয়ে নাচতে শুরু করে দিতেন।’^{৩৮৮} সুফী যিক্র এর এগুলো কিছু অভিযোগ-যোগ্য কুফল। কিছু ফলাফল এতই চরম ভাবাপন্ন যে, তারা তা বইতে প্রকাশযোগ্য মনে করেন না। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী তাঁর ‘মালফুযাত’ বইয়ে লিখেছেন, হাজী ইমদাদুল্লাহ্ বলেছেন, ‘আমি দুই-তৃতীয়াংশ যিয়াউল কুলুব কাট-ছাঁট করেছি, কারণ, ইল্হাম (ঐশী উপদেশ) এর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, এগুলো প্রকাশ করা অনুচিত। এর মধ্যে (দুই-তৃতীয়াংশ) লেখা হয়েছে আশগাল (যিক্র অনুশীলন) এর ফলাফল।’^{৩৮৯}

৩৮৫। ইরশাদুল মূলক, (ইং অনুঃ), পৃঃ ৫০।

৩৮৬। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ) ২১৩ পৃষ্ঠা।

৩৮৭। তালিমুদ্দিন, পৃঃ ১১৮।

৩৮৮। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ) ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৩৮৯। মাশাইখ-ই-চিশ্ত, ২২৫ পৃষ্ঠা।

এসব উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় যে যিকর সুফীগণের জন্য সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যিকর তাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান, দেহাংশের খণ্ড-বিখণ্ড করণ, এমনকি, আল্লাহর সাথে মিলন (ফা'না দার ফা'না) এর ক্ষমতা দান করে। সুফীগণ দাবী করেন, যিকর তাদেরকে এমন 'হাল' বা অবস্থায় পৌছাতে সাহায্য করে, যা 'ওয়াহদাতুল-ওজুদ' এর অভিজ্ঞতা দেয় এবং তা সাধারণ অবস্থায় অনুভব করা সম্ভব নয়। সুফীগণ এই অবস্থায় অনেক কুফরী বাক্য উচ্চারণ করেন, যেমন- 'আনা আল-হাক্ক' এবং 'সুবাহানী মা'আ'যাম শানি।'

কিছু সুফী সর্বক্ষণই এ অবস্থায় থাকেন, তারা ইহজগতকে বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে ফেলেন। সাধারণ লোকের কাছে তারা উন্মাদ, কিন্তু সুফীগণের কাছে এটা অনেক উঁচু অবস্থান এবং এদেরকে 'মাজযুব' বলে থাকেন (মাজযুব সম্পর্কে সবিশেষ বর্ণনা পরে আসছে)। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সুফীগণ যা অনুভব করেন, তা তাদের শারিরিক ও মানসিক বৈকল্যের ফল। উপোস, পানিশূন্যতা, ঘন্টার পর ঘন্টা ভজন গীতি গাওয়া, অনিদ্রা, মানসিক দুঃশ্চিন্তা, নিবিড় নির্জনতা এবং বনে বনে ঘুরে তাঁরা তাঁদের সমস্ত অনুভূতিগুলোকে দুর্বল করে ফেলেন। শারিরিক অত্যাচারে এমনি শরীর দুর্বল থাকে, তারপর, আবার শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁরা তাদেরকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন। ইরশাদুল মূলক প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে এভাবে- 'যিকর এর অভ্যাস করার সময় যদি কোন মুরীদ ভাল বা খারাপ স্বপ্ন, উজ্জল আলোক-বর্তিকা অথবা বিচিত্র রং এর প্রকাশ হতে দেখে, তবে সেদিকে তার সামান্যই নজর দেয়া উচিত।'^{৩৯০}

ইসলামে কোন ধরনের ইবাদাহুয় একজন আলো, দৃশ্য, স্বপ্ন এবং বিভিন্ন রং দেখেঃ

সুফীগণের অভিজ্ঞতা, মতিভ্রম ও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুফী শাইখগণ যা ঘটনালিপি আগেই বলে দেন, মুরীদরা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভীতির সময় সেগুলোই অনুভব করেন। 'ওয়াহদাতুল-ওজুদ' ও সুফীগণের কল্পনার ফল। অতএব, তাঁদের দাবীটাই মিথ্যা। 'আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তরে- যাত (আল্লাহন্বিত হওয়া), হিফাত (আল্লাহর গুণাবলী), আফ'আল (আল্লাহর কার্যাবলী), হাক্কায়িক্ব (সত্যের প্রকাশ) অর্জিত হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝের সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে।'^{৩৯১}

মাজযুবঃ

কোন কোন সময় সুফীগণের শারিরিক ও মানসিক বিকৃতির দরুন পাগলামী স্থায়ী হয়। তাদেরকে 'মাজযুব' বলা হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র এই ধরনের লোক

৩৯০। ইরশাদুল-মূলক (ইং অনুঃ) ৬০ পৃষ্ঠা।

৩৯১। শরীয়াহ ও অধ্যাত্মবাদ, ১১৩ পৃষ্ঠা।

দেখা যায়, বিশেষতঃ সুফীগণের মাযারের কাছে। মাজযুবদের পাগলামীকে সুফীগণ প্রশংসা করেন এই বলে যে, এটা অর্জিত হয়নি, বরং, দান করা হয়েছে। ‘মাজযুবরা এরকম লোক, যাদের আত্মা যিক্র এ প্রবৃত্ত হওয়ার আগেই ‘আনওয়ার’ দ্বারা আলোকিত থাকে। প্রথমেই তারা যিক্র ও গুণ্ডল এ প্রবৃত্ত হয় না। প্রারম্ভিক অবস্থা থেকেই, আল্লাহ্ আলোকিত ও পথ প্রদর্শন করেন। আলোকিত হওয়ার পর তারা যিক্র এ প্রবৃত্ত হয়। তাদের জন্য যিক্র কোন ক্রেশকর কাজ নয়। এটা তাদের জন্য এমন পর্যায়, যেন তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস।’^{৩৯২}

ইখমা’লুশ-শিয়াম এর পরিভাষায়, ‘আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের মাঝ থেকে এক দলকে তাঁর আনুগত্যের জন্য নিযুক্ত করেন। অন্য একদলকে তিনি তাঁর ভালবাসার জন্য পছন্দ করেন। একদল লোককে তিনি ইবাদাহুর জন্য নিযুক্ত করেছেন। তারা ইবাদাহুর জাহিরি দিকের কাজ, যেমন-নফল, অজিফাহ্, সাদাকাহ্, হাজ্জ এবং মানুষের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। তারা দিবা-রাত্র এই দিকের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাদের এই ইবাদাহুর কাজগুলো করার উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা। দ্বিতীয় দলকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন তাঁর ভালবাসা এবং নৈকট্যের জন্য। তাদের জাহিরি ইবাদাহ্ প্রথম দলের ইবাদাহ্ থেকে কম, এবং তাদের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয় আত্মার মাধ্যমে। তাদের সংশ্রব সর্বক্ষণ আল্লাহুর সাথে। যিক্র সর্বক্ষণ তার আত্মায় জারি থাকে। তারা জান্নাত এবং জাহান্নামের সাথে সম্পর্কিত নন।’^{৩৯৩}

শরীয়াহ্ মাজযুবদের জন্য প্রযোজ্য নয়ঃ

দেওবন্দি অনুবাদক ‘ইখমা’লুশ-শিয়াম’ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। ‘জয্বা’র পর্যায়ে স্বর্গীয় প্রেমে বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব, শরীয়াহুর বিধি-নিষেধ পালনের দায়িত্ব মাজযুবের উপর নেই, যা থেকে সে অব্যাহতি প্রাপ্ত।’^{৩৯৪} অন্য কথায়, তার অবস্থা একজন পাগলের মত, যার উপর শরীয়াহ্ প্রযোজ্য নয়।

সুফীবাদের জন্যও মাজযুব অপ্রয়োজনীয় :

শিক্ষার ক্ষেত্রে, যে কোন বিষয়ের উপর পারদর্শিতা অর্জন করে, সে ঐ বিষয়ের একটা সম্পদ। সে ঐ বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য অনুমোদিত, এবং ঐ

৩৯২। ইখমা’লুশ-শিয়াম (ইং অনুঃ) ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৯৩। ইখমা’লুশ-শিয়াম (ইং অনুঃ) ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৯৪। ইখমা’লুশ-শিয়াম (ইং অনুঃ) ১০৫ পৃষ্ঠা।

বিষয়ের শিক্ষানবীশদের সাথে সম্পর্কিত হয়। সুফীবাদ তার উল্টো। সুফীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে শাস্তি ও কঠোরতা ভোগ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অপ্রকৃত হুয়ে না যায়। কিন্তু, যখন তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে, তখন সুফীবাদের জন্য তারা অযোগ্য হয়ে যায়।

‘যদিও মাজযুব তার লক্ষ্য (মাতলুব) অর্জন করে, সে শাইখ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, সে পথের দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ সম্পর্কে অসচেতন। সে পথনির্দেশ দিতে অপারগ ও আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থানের জন্য অপ্রয়োজনীয়।’^{৩৯৫}

সুফী শাইখগণের গ্রহণযোগ্যতার শর্তের মধ্যে ইরশাদুল মূলক উল্লেখ করে, ‘সে (শাইখ) মোহাবিষ্ট (মোঘলুবুল হাল) পর্যায়ে হারিয়ে গিয়ে শরীয়াহর দ্বন্দ্বপূর্ণ কোন বক্তব্য প্রদান করবেনা। ‘ঘাল্বাহ-ই-হালৎ’ এর কারণে যদি নিজেকে দোষ মুক্ত (মায়ুর) ঘোষণা করে, সেও শাইখ হওয়ার উপযুক্ত নয়।’^{৩৯৬}

মাজযুবদের অলৌকিক ক্ষমতা আছেঃ

যেহেতু, মাজযুবরা এমন ব্যক্তিত্ব, যারা সুফীবাদের শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে, কাজেই অদৃশ্য জানার মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করা এবং সব রকম ক্ষমতা তাদের উপর সুফীগণ আরোপ করে থাকেন। দেওবন্দিগণের বই-পুস্তক, এমনকি, ফাজায়েলে আ’মালেও মাজযুব ও তাদের অতিপ্রাকৃত অসংলগ্ন আচরণ নিয়ে অসংখ্য কাহিনী আছে। দেওবন্দিগণ সুফীদের মধ্যে তাদেরকে মধ্যপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করতে চান; তাঁদের দাবী, মাজযুবদের থেকে শরীয়াহর কোন দৃষ্টান্ত নেয়া হবেনা। কিন্তু, আসল ব্যাপার, এই কাহিনীগুলো সাধারণ লোকদেরকে উৎসাহিত (তারগীব) করার উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং লোকের আকৃষ্টার উপর প্রভাব ফেলছে।

মাজযুব এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের কিছু নমুনাঃ

১। তাজকিরাতুর রাশীদ থেকে ‘আরওয়াহ-ই-ছালাছাহ’তে বর্ণনা করা হয়েছে,- একজন পাঞ্জাবী মাজযুব (সংসারত্যাগী/সন্ন্যাসী) লাহোর প্রদেশে বাস করতো। হাজী আব্দুর রাহীম সাহেব একই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি জাহাজে করে ‘হারামাইন’ শারীফাইন (মক্কা ও মদীনা) যিয়ারাহর উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হলেন।

৩৯৫। ইরশাদুল-মূলক- (ইং অনুঃ) ৫৩ পৃষ্ঠা।

৩৯৬। ইরশাদুল-মূলক- (ইং অনুঃ) ৫৮ পৃষ্ঠা।

ভ্রমণকালে হযরত (আব্দুর রাহীম) এর হাত থেকে একটা গ্লাস সমুদ্রে পড়ে যায়। সামান্য কিছুক্ষনের মধ্যেই সমুদ্র থেকে একটা হাত গ্লাসটি সহ বেরিয়ে এলো, হযরত গ্লাসটি ধরা মাত্রই হাতটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। লাহোরে আব্দুর রাহীম সাহেবের চাকরকে মজ্যুব বললো, ‘তোমার হাজী সাহেবের হাত থেকে একটা গ্লাস পড়ে গিয়েছিল। আমিই সেই গ্লাস তাঁকে ফিরিয়ে দেই।’ যখন হাজী আব্দুর রাহীম হাজ্জ থেকে ফিরে এলেন, তাঁকে মাজ্যুবের কথা বলা হলো। হাজী আব্দুর রাহীম বলেছিলেন, ঘটনাটি সত্য, কিন্তু তিনি হাতটি চিনতে পারেন নি।^{৩৯৭}

২। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘আমার এক বিশ্বাসভাজন বন্ধু আমার নিকট লাখনৌর একজন বিখ্যাত কাতেবের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তার অভ্যাস ছিলো,- প্রতিদিন সকালে লেখা আরম্ভ করার শুরুতেই একটা সাদা খাতায় একবার দরুদ শরীফ লিখে তারপর লেখার কাজ শুরু করা। উক্ত লোকটি যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে বলতে থাকে, হায়! সেখানে আমার কি উপায় হবে? ইত্যবসের এক মাজ্যুব সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, ‘বাবা তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার সেই সাদা খাতাটি, যেখানে দরুদ শরীফ লেখা হতো, তা সেই দরবারে পেশ করা হচ্ছে’।^{৩৯৮}

ইবাদাহ সম্পর্কে সুফীগণের আরো কিছু ধর্মবিরোধী (খারেজি) বিশ্বাস

দোওয়া / বিনীত প্রার্থনা থেকে বিরত থাকাঃ

ইখ্বামুলশ-শিয়াম থেকে- ‘প্রতিটি ব্যাপারেই রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর ‘শান’ (কাজ বা আ‘মল) ছিল দোওয়া করা। অতি উঁচু স্তরে আছেন বিধায় কিছু ‘আহুলে-হাল’ (আধ্যাত্মিকতায় মোহাবিষ্ট ওলী) মনে করেন, দোওয়া থেকে বিরত থাকা ঠিক, এবং আল্লাহর প্রতি আদাব (সম্মান); কারণ, দোওয়া করাতে মনে হয়, একজনের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। অথবা, তাঁর কাছে না চাইলে তিনি দেবেননা, এমন। এরকম লোক (অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক মোহাবিষ্ট) তাদের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে তুলে ধরেননা। তারা নীরবতা ও রিজা (সম্ভৃতি) পালন করেন। যেহেতু, তারা বিবেচনা করেন, কোন কিছু চাওয়া আল্লাহর আদাব (সম্মান) এর সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।^{৩৯৯}

৩৯৭। আশরাফ আলী খানভী লিখিত ‘আরওয়াহু-ই-ছালাছাহু,’ ৪৪৪ পৃষ্ঠা, কাহিনী নং- ৪৪৩।

৩৯৮। ফাজায়েলে আ‘মাল, আবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে দরুদ খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ৯৯ পৃষ্ঠা, কাহিনী নং ৮।

৩৯৯। ইখ্বামুলশ-শিয়াম (ইং অনুঃ), ১৩৬ পৃষ্ঠা।

এই উদ্ধৃতি (বক্তব্য) ব্যাখ্যা করে যে-....

- আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্যাহ জানা স্বত্ত্বেও কিছু এদিক-সেদিক করার সুযোগ আছে।
- দাবীর বিপক্ষে বিচার-বুদ্ধিহীন মাজযুব অথবা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতায় মোহাবিষ্ট আউলিয়াদেরকে এই বইয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে এবং সংরক্ষিত করা হয়েছে।
- বিচার-বুদ্ধিহীন মাজযুবরা আল্লাহকে ডাকায়, আল্লাহর সম্মান (আদাব) এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি রাসুল (সাঃ) এর চেয়ে বেশী সচেতন, যিনি (রাসুল সাঃ) আল্লাহর নিকট দোওয়া করায় অভ্যস্ত ছিলেন; যেহেতু, তাঁর প্রভু আদেশ করেছেনঃ “তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার উপাসনা থেকে বিমুখ, তারা শাস্তিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”^{৪০০}

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘যে আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনা করে না, তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি রাগান্বিত হন।’^{৪০১} কারণ, বিনীতি প্রার্থনা ছেড়ে দেয়া আল্লাহর ইবাদাহর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বাদ দেয়া এবং এটা বুঝানো যে, আল্লাহর সাহায্য বা দয়ার প্রয়োজন নেই। বান্দাহ বিনীত প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর কাছে কিছু চায়, এটা আল্লাহ পছন্দ করেন; এবং রাত্রির এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে প্রতি রাত্রেই তিনি নিম্নতম আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, ‘আমিই রাজাধিরাজ। আমিই রাজাধিরাজ। আহ কি কেউ প্রার্থনাকারী? আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো। আমার কাছে কিছু চাওয়ার কেউ আহ কি? আমি তাকে দেব। ক্ষমাপ্রার্থী কেউ আহ কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। এটা সুবেহু সাদেক পর্যন্ত চলতে থাকে।’^{৪০২}

উপরোক্ত উদ্ধৃতি বর্ণনা করে, রিজা (সন্তুষ্টি) অথবা পরিতৃপ্ত হওয়া এবং ধৈর্যের ইসলামে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপত্তিত হয় না এবং যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।” উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তার হৃদয়কে নিশ্চয়তার দিকে পথ-নির্দেশ দেবেন। সুতরাং, সে জানবে, যা তার কাছে পৌঁছেছে, তা সে কখনও হারাবে না এবং যা সে হারিয়েছে, তা তার কাছে পৌঁছবে না।’^{৪০৩}

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীর সন্তুষ্টি হৃদয়ে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করে। ‘আল্লাহর প্রত্যাদেশে সান্ত্বনা’র ব্যাপারে সুফীগণের একটা নিজস্ব বুঝ আছে। তাদের মিথ্যা বুঝ, তাদেরকে দাওয়াহ, জিহাদ, শাফাআহ, জীবন ধারণের অশ্বেষন, এমন

৪০০। সূরাহ আল-মুনিন (৪০ঃ৬০)।

৪০১। সহীহ আল-জামী আস-সাগীর (নং ২৪১৪)।

৪০২। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য।

৪০৩। তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরাহ আত্-তাগাবুন ৬৪ঃ১১ এবং আত্-তাবারী (২৩ঃ৪২১)।

কি, দোওয়া থেকেও দূরে রাখে। এই নিষ্ফল রিজা (সন্তুষ্টি) সুফীগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। তাঁরা দাবী করেন, এই রিজা তাদের শাইখগণকে আল্লাহর কাছে একটা উচ্চ অবস্থান দান করে, যা নিম্ন উদাহরণে দেয়া হলো-- একদা গাউছুল-আযম (শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী) সাতজন উঁচু দরের ওয়ালী-আল্লাহদের সাথে বসেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির বলে দেখলেন যে, সমুদ্রে একটা জাহাজ প্রায় ডুবুড়ুবু অবস্থায়। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ক্ষমতায় জাহাজটির ডুবে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। সাতজন আউলিয়াহু যারা আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় এবং তাঁর আদেশ মানার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, গাউছুল-আযমের এই কাজে তাঁরা রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং জামা'য়াত থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। গাউছুল-আযম একদিন সাতটা নরকংকাল লক্ষ্য করলেন। (প্রশ্ন করলে) তাঁকে বলা হলো, এক পশু আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনা করেছিল, “হে আল্লাহ! তোমার বন্ধুদের মাংস আমাকে খেতে দাও।” সাতজনকেই পশুর সামনে হাযির করা হলো এবং পশুটি তাঁদের মাংস খেতে শুরু করে দিল। যখন পশু তাদের মাংস কামড় দিচ্ছিল তাঁরা একটুও নড়েনি। সমস্ত মাংস আল্লাহর রাস্তায় দেয়া হলে শুধু হাড়গুলিই অবশিষ্ট রইলো।^{৪০৪}

জান্নাহর প্রতি দৃষ্টিপাত :

১। মাওলানা যাকারিয়াহু মাশাইখ-ই-চিশ্তে বর্ণনা করেন, ‘কোন কোন সময় ইবাদাহু করা হয় জান্নাহু পাওয়ার আশায়। এটা ব্যবসায়ীর ইবাদাহু। কারণ, এ ইবাদাহুর উদ্দেশ্য হলো, ইবাদাহুর বদলে পুরস্কার পাওয়া। কোন কোন সময় ইবাদাহু করা হয় শান্তির ভয়ে। এ ইবাদাহু হলো, তাদের নিয়োগদাতার ভয়ে তাঁর কর্মচারীর সেবা প্রদান করা। আর এক রকম ইবাদাহু এই প্রকার, যা ইচ্ছা বা ভয়ে করা হয় না, শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য করা হয়। এটাই মুক্ত মানুষের ইবাদাহু’।^{৪০৫}

২। হযরত খাজা মুম্বশাদ দিনউয়ারীর ইতিকালের সময় জনৈক বৃজুর্গ তাঁর জন্য বেহেশত পাওয়ার দোওয়া করছিলেন। হযরত মুম্বশাদ হেসে উঠে বললেন, ‘তিরিশ বছর যাবত জান্নাহু আপন সাজ-সজ্জা নিয়ে আমার নিকট হাজির হচ্ছে, আমি একবারও তার দিকে পূর্ণভাবে চক্ষু উঠিয়ে দেখিনি। আমি তো মালিকের সাথে মিলন প্রতীক্ষায় রয়েছি’।^{৪০৬}

৪০৪। শামা’ইম-ই-ইমদাদিয়াহু, ৪৩ পৃষ্ঠা।

৪০৫। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ), ৫৬ পৃষ্ঠা।

৪০৬। মাশাইখ-ই-চিশ্ত, ইং অনুঃ পৃষ্ঠা ১২৮; ফাজায়েলে আমাল, তাবলীনী কুবুতখানা, চকবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে সাদাকাহ ২য় খণ্ড, ২৬৭-২৬৮ পৃষ্ঠা।

৩। ‘একদা তিনি (মাওঃ আশরাফ আলী খানভী) বলেছিলেন, ‘যখন আমরা মৃত্যু বরণ করবো এবং জান্নাতে যাবো, হুরীগণ আমাদের কাছে আসবে, আমরা তাদেরকে হয় আমাদেরকে কুর’আন তিলাওয়াত করে শুনাতে বলবো অথবা তাদের নিজেদের কাজ করতে বলবো (অর্থাৎ, আমাদেরকে একা থাকতে দাও)।’

একদা তিনি বলেছিলেন, ‘আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম এবং মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিলাম। আমি স্বপ্নে হযরত ফাতিমা (রাঃ) (আব্বাহুর রাসুল সাঃ এর কন্যা) কে দেখলাম, এবং তিনি দু’বাহু দিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আমি ভালো হয়ে গেলাম।’^{৪০৭}

৪। ‘আব্বাহুর জন্য ভালোবাসা শুধু তাঁর (আব্বাহুর)ই জন্য হবে, জান্নাহুর আশায় ও নয় বা জাহান্নামের ভয়ে ও নয়।’^{৪০৮}

৫। ইবাদাহুয় ফাজিলাত, ন্যায়পরায়ণতা ও আন্তরিকতা, সবই করুণাময় প্রভুর দান ও অনুকম্পা। প্রকৃতপক্ষে, সেই অনুদানের বদলায় কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা নিঃসন্দেহে, অত্যন্ত বিস্ময়কর, অবিচক্ষণ ও অযৌক্তিক। ফকির (ভিক্ষুক), যে লোক থেকে দান গ্রহণ করে, সে পৃষ্ঠপোষক (আব্বাহুর) কাছে উপকারের প্রতিদান কি করে চাইতে পারে? অযৌক্তিকতা স্বপ্রমাণিত।^{৪০৯}

প্রতিবাদ

জান্নাহু অথবা বেহেশ্ত আব্বাহুর আরও একটা মহান আশীর্বাদ, যা থেকে শয়তান সুফীগণকে বঞ্চিত করার আশা পোষন করে। আব্বাহু, কুর’আনে বলেন, “আব্বাহু বিশ্বাসী নর-নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং চিরস্থায়ী বাগানে (স্বর্গে) মনোরোম প্রাসাদসমূহ রয়েছে। কিন্তু, আব্বাহুর সম্ভ্রুতিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ঐটিই চরম সাফল্য।”^{৪১০}

আব্বাহুর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘আব্বাহুর নিকট যদি কিছু চাও, তাহলে ফিরদাউস চাও, এজন্য যে, এটি বেহেশ্তের শেষ এবং সর্বোচ্চ অংশ; এবং এর উপরেই করুণাময়ের আরশ।’^{৪১১} রাসুল (সাঃ) আব্বাহুর কাছে বেহেশ্ত চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং এটাকে তিনি অযৌক্তিক, বিবেকহীন বা ত্রুটিপূর্ণ কাজ মনে করেননি। বেহেশ্ত পাওয়ার আশায় ইবাদাহু করা হয়না, সুফীগণের এই দাবী ও বক্তব্য স্ববিরোধী

৪০৭। মালফুযাত হাকিম আল-উম্মাহ, ৮ম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

৪০৮। ইরশাদুক মুল্ক (ইং অনুঃ) ৫১ পৃষ্ঠা।

৪০৯। ইখমা’দুশ-শিয়াম (ইং অনুঃ) ৮২ পৃষ্ঠা।

৪১০। সুবাহু আত-ভাওবাহু, (৯ঃ৭২)।

৪১১। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-৫১৯।

এবং অযৌক্তিক...। খাজা আব্দুল ওয়াহিদ নিম্নোক্ত কাহিনী বর্ণনা করেন— ‘এক রাতে আমি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম এবং আমি ‘আউরাদ’ ও ‘ওজা’ইফ’ (যিকর) থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। স্বপ্নে, সুন্দরী এক বালিকাকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। কখনও আমি এমন সৌন্দর্য দেখিনি। সে রেশমী বস্ত্র পরিহিতা ছিল। তার জুতা তাসবীহু পড়ছিল এবং জুতার ফিতা

তাক্বদীস (উচ্চস্বরে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) করছিল। সে আমাকে বললোঃ হে ইবনে যাইদ! আমার অনুসরণ করার জন্য কঠোর সাধনা কর। আমি তোমারই খোঁজ করছি।^{৪১২}

এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, শয়তান সুফীগণকে ভুল পথে পরিচালিত এবং ধর্মের সত্যিকার বুঝ থেকে বঞ্চিত করেছে। এটা নবোদ্ভাবন, প্রচলিত ধর্মের বিরোধীতা ও ইচ্ছা দ্বারা পরিপুষ্ট বৃক্ষের দুষ্টফল।

উপসংহার

ইসলামে ইবাদাহ সম্পর্কে বুঝ অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু, সুফীগণ অজ্ঞতা, অতিরঞ্জন এবং নবোদ্ভাবন দ্বারা নিজেদের জন্য এটাকে জটিল ও কষ্টদায়ক করে নিয়েছেন। অনেক নবোদ্ভাবিত ইবাদাহ দেওবন্দিগণের বইয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাদের অনুসারীদের পালন ক্ষমতার বাইরে। সুফী-শাইখগণ যা দাবী করেছেন, তা নিজেরা কার্যে পরিণত করেছেন কি না, সেটাই একটা বিতর্কিত বিষয়।

সুফীগণ নিজেরাই নিজেদেরকে ক্রেশ ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত কঠোরতায় নিয়োজিত করেছেন; অথচ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকারক কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ইসলামে অনেক বিষয়কে নিষিদ্ধকরনের পিছনে বিচক্ষণতা আছে, যেমন- মাদকদ্রব্য, শুকরের মাংস, ইত্যাদি। পরম করুণাময় আল্লাহ বলেন, “এবং তুমি নিজেকে নিজের হাতে ধ্বংস করো না।”^{৪১৩}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন, শরীরের প্রত্যেক অংশের দাবী আছে, এবং বিশ্বাসীদের তার শরীরের দাবীকে সম্মান দেয়া কর্তব্য। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘একদা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমাকে বললেন, ‘তোমার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে, তুমি সারারাত ইবাদাহ কর, আর দিনে রোযা রাখ।’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, আমি তাই করি।’ তিনি বললেন, ‘তুমি যদি এরকম কর, তোমার দুষ্টিশক্তি কমে যাবে। কোন সন্দেহ নেই, তোমার উপর তোমার

৪১২। মশইখ-ই-চিশত, ১০৩ পৃষ্ঠা।

৪১৩। সূরাহ বাকারাহ, ২ঃ১৯৫।

শরীরের অধিকার আছে; এবং তোমার উপর তোমার পরিবারেরও অধিকার আছে; সুতরাং, রোযা রাখ (কিছুদিন) এবং রোযা ছাড় (কিছুদিন), ইবাদাহ্ কর কিছু সময় এবং তারপর ঘুমাও।”^{৪১৪}

যদি ফারুজ ইবাদাহ্‌তেও ক্ষতি বা কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ্ সহজ পথ দিয়েছেন; যেমন, পানিতে শরীরের ক্ষতি করলে তাই মুম করা, ভ্রমণের সময় ফারুজ রোযা ভঙ্গ করা, সালাহ্ ক্বসর করা, ইত্যাদি।

অতীত জাতিগুলির মাঝে সুফীদের সন্ন্যাসবাদ একটা মারাত্মক ধরণের অনুকরণ, আল্লাহ্ থেকে পথনির্দেশ থাকা স্বত্বেও, আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য নিজেদের আবিস্কৃত পথ অবলম্বন করেছিল এবং নিজেদের স্বনির্ধারিত কঠোরতা বজায় রাখতে পারেনি। আল্লাহ্ বলেন, “অতঃপর, আমরা তাদের অনুগামী করেছিলাম আমাদের রাসুলগণকে ও মরিয়ম তনয় ঈসাকে, এবং তাঁকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তাঁর অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ! এতো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছিল; আমরা তাদের এর বিধান দিইনি, অথচ এটিও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি।”^{৪১৫}

আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘তুমি নিজের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো না, তা হলে আল্লাহ্ও তোমার প্রতি কঠোর হবেন। কিছু লোক নিজেদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করেছিল; অতএব, আল্লাহ্ও তাদের প্রতি কঠোর হয়েছিলেন। তাদের উত্তরসূরীদের দেখা গেছে কঠুরীতে এবং সন্ন্যাসাশ্রমে।’ তখন তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিলেন “সন্ন্যাসবাদ! তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য উদ্ভাবন করেছিল, আমরা তাদের এর বিধান দিইনি।”^{৪১৬}

সুফীগণ মায়াবী দৃশ্য অনুভব করার উদ্দেশ্যে ইবাদাহ্‌কে লক্ষ্য বানিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা শুধু যে সূন্নাহ্র অনেক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করছেন, তাই নয়, তাঁরা নিজেদের ইহলোক ও পরলোকেরও ক্ষতি করছেন।

সূন্নাহ্ মোতাবেক যে যিক্র, তা প্রশান্তি ও আনন্দ আনে, বিষন্নতা এবং দুঃশ্চিন্তা দূর করে এবং মন ও শরীরকে শক্তিশালী করে। “জেনে রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।”^{৪১৭} কিন্তু সুফীগণের যিক্র তাদের মন ও শরীর উভয়েরই ক্ষতি করে,

৪১৪। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

৪১৫। সূরাহ্ আল-হাদীদ, (৫৭ঃ২৭)।

৪১৬। সুনানে আবু দাউদ (ইং অনুঃ) ৩য় খণ্ড, ১৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৮৬।

৪১৭। সূরাহ্ আর-রাদ-১৩ঃ২৮।

অতিরিক্ত দৃষ্টিস্তার কারণ হয়, এবং তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধিহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। ইসলাম, ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মিতাচার অবলম্বন করা শেখায়। একদা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “আমি যদি কিছু করার জন্য তোমাদেরকে আদেশ করি, তার যতটা সাধ্যে কুলায়, ততটাই করো, আর যা নিষেধ করি, তা বর্জন কর (পুরোটাই)”^{৪১৮}। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, “বনি আসাদ গোত্রের এক মহিলা আমার কাছে বসেছিল, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমার ঘরে এসে বললেন, ‘এ কে?’ আমি বললাম, ‘সে অমুক। সে ঘুমায় না এবং সারারাত ইবাদাহুয় মাশগুল থাকে।’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অপহৃদের স্বরে বললেন, “কর, (ভাল) কাজ যতটুকু তোমার সাধ্যে কুলায়; কারণ, ভাল কাজ করতে করতে তুমি ক্লাস্ত হতে পারো; কিন্তু, আল্লাহ পুরস্কার দানে ক্লাস্তিবোধ করেননা।”^{৪১৯} আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, “একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মাস্জিদে ঢুকে দেখলেন, একটা রশি দুই খামের মাঝে ঝুলছে। তিনি বললেন, ‘এই রশিটা কেন?’ লোকটা বললো, ‘এই রশিটা যায়নাবের জন্য, যখন তিনি ক্লাস্ত হয়ে যান, এটাকে ধরেন (ইবাদাহুর জন্য দাঁড়িয়ে থাকার নিমিত্তে)।’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘এটা ব্যবহার করবেনা। রশিটা খুলে ফেলো। যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকো, ততক্ষণই ইবাদাহু করো; যখন ক্লাস্তি আসে, বসে পড়।’^{৪২০}

সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতটি ছাড়া এই অধ্যায় শেষ করার আর ভাল কি কোনো উপায় আছে?— “আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। ভাল বা মন্দ, যে যা উপার্জন করবে, তাই (প্রতিদান) পাবে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিন্মৃত হই, অথবা ভুল করি, তবে, তুমি আমাদেরকে অপরাধী করোনা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করোনা। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করোনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর।”^{৪২১}

৪১৮। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৯১।

৪১৯। সহীহ আল-বুখারী, (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫১ খ।

৪২০। সহীহ আল-বুখারী, (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫১ ক।

৪২১। সূরাহ আল-বাক্বারাহ (২:২৮৬)।

নবম অধ্যায়

গা'য়িব (অদৃশ্য) এর জ্ঞান

গা'য়িব এর অর্থ এবং উৎস :

মানুষ থেকে লুকায়িত সব কিছু, ভবিষ্যত ও অতীতের ঘটনাবলী, যা দেখা যায় না, তাই গা'য়িব (অদৃশ্য) এর অন্তর্ভুক্ত। গা'য়িবের জ্ঞান শুধু আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য।^{৪২২} ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে লিখেন, “যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে”^{৪২৩}, তারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহুয়, ফিরিশতায়, কিতাবসমূহে (আসমানী), নাবী-রাসুলদের উপর, শেষ দিবসে (হাশর), তাঁর (আল্লাহর) জাল্লাত, জাহান্নাম এবং তাঁর (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাতে।’

অদৃশ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত- পরলোক, বারুখা (মৃত্যুর পর থেকে হাশর পর্যন্ত জীবন), জাল্লাত, জাহান্নাম, জরায়ুতে যা আছে এবং আত্মার গোপন তথ্য; যা কুর'আনে অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, “কিয়ামাহু কখন হবে, তা কেবল আল্লাহুই জানেন, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে কি আছে। কেউ জানেনা, আগামীকলা সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানেনা, কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।”^{৪২৪}

আল্লাহ আরও বলেন, “এবং সাবধান! তারা তাঁর নিকট থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য তাদের অন্তরে বিদ্রোহ গোপন রাখে। সাবধান! তারা যখন তাদের অভিসন্ধি গোপন করে, তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন; অন্তরে যা আছে, তা তিনি সবিশেষ অবহিত।”^{৪২৫}

আমাদের অদৃশ্যের জ্ঞানের একমাত্র উৎস :

আল্লাহর রাসুলের সময়ে মক্কায় নাস্তিক পেগান লোকেরা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানের দাবী করতো। যেমন, তারা বলতো, পরলোকে তারা অনেক সম্পদ ও পদমর্যাদা অর্জন করবে। অথবা, তারা দাবী করতো, আল্লাহর কন্যা আছে। উচ্চ প্রসংশিত আল্লাহ

৪২২। দেখুন 'The book of Tawheed' by Shaikh Saleh al-Fawzan.

৪২৩। সূরাহু আল-বাকার (২:১৩)।

৪২৪। সূরাহু লুকমান (৩১: ৩৪)।

৪২৫। সূরাহু ছদ (১১ : ৫)।

তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “বা, তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে, তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক”।^{৪২৬} এর কারণ, আরব নাস্তিকদের অদৃশ্যের জ্ঞান পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

তারা যে পৃথিবীতে বাস করে, ঐ একই পৃথিবীতে বাস করা অতীত জাতিগুলির ঘটনা ও তাদের নিকট অজানা; একমাত্র আল্লাহর জ্ঞান থেকেই তারা তা জেনেছে, এবং পর-জগৎ সম্পর্কেও। কুর’আনে আল্লাহ্ নূহ (সাঃ) এর সময়ের লোকের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেন, “এ সমস্ত অদৃশ্যালোকের সংবাদ, আমি তোমাকে {মুহাম্মাদ (সাঃ)} ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি, যা, এর পূর্বে তুমি জানতেনা এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানতো না।”^{৪২৭}

একমাত্র ফিরিশতা, এবং মানুষের মাঝ থেকে পয়গাম্ভারদের ছাড়া অন্য কারো কাছেই আল্লাহ্ গা’য়িব (অদৃশ্য বস্তু) প্রকাশ করেননা। আল্লাহ্ বলেন, “তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না; তাঁর মনোনীত রাসুল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে, আল্লাহ্ রাসুলের অগ্রে-পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।”^{৪২৮} এই খবর আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ করেছেন; কারণ, একজনকে অদৃশ্যের খবর জানানো রিসালাতের লক্ষণ। আল্লাহ্ অদৃশ্যের অনেক বিষয়বস্তু তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিকট প্রকাশ করেছেন, যা তিনি (সাঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন। এরূপে, তিনি {রাসুল (সাঃ)}ই শুধুমাত্র আমাদের অদৃশ্যের সংবাদের উৎস। আল্লাহ্ তাঁর রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে বলেন, “সে ওহী প্রকাশে কার্পণ্য করেনা।”^{৪২৯} (অর্থাৎ, তিনি প্রত্যাদেশ সমর্পণ করতে কার্পণ্য করেননা।)

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবনের ২৩ বৎসর ধরে আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ ও পথনির্দেশ ক্রমান্বয়ে এসেছে। তাঁর ইতিকালের পর থেকে আমাদের অদৃশ্যের জ্ঞান ও মহান আল্লাহ্ প্রত্যক্ষ পথনির্দেশ উৎসের অন্ত হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) থেকে অদৃশ্যের যা পেয়েছি, তাই আমাদেরকে যথেষ্ট মনে করতে হবে। যদিও আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে লুক্কায়িত তথ্য জানিয়েছেন, তথাপি, তাঁরও অদৃশ্যের নিরনুকুশ জ্ঞান ছিলনা। তিনি শুধু অতটুকুই জানতেন, যা আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ কুর’আনে বলেন,

৪২৬। সূরাহ আত-ত্বুর (৫২ঃ৩৮)।

৪২৭। সূরাহ হুদ (১১ঃ৪৯)।

৪২৮। সূরাহ আল-হাজ্জ (৭২ঃ২৬-২৭)।

৪২৯। সূরাহ আত-তাক্বীর (৮১ঃ২৪)। ইবনে কাসীরের তাফসীর দেখুন আরো জানতে।

কারো অদৃশ্যের নিরঙ্কুশ জ্ঞান নেইঃ

“বল {হে মুহাম্মাদ (সাঃ)}, আমি তোমাদের এ বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি অবগত নই, এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা; আমার প্রতি যা প্রত্যাশা হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।”^{৪৩০}

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) বলেন, ‘যদি কেউ বলে, আগামীকাল কি ঘটবে, রাসুল (সাঃ) তা জানেন, তবে সে মিথ্যাক।’ তিনি তখন তিলাওয়াত করেন, “কেউ জানেনা, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে।”^{৪৩১}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপস্থিতিতে কিছু ছোট বালিকা দফ বাজিয়ে গান করছিলো, তারা বলছিলো, ‘আমাদের মাঝে একজন {মুহাম্মাদ (সাঃ)} আছেন, যিনি জানেন, আগামীকাল কি হবে।’ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, ‘এগুলো বলো না, আগে যা বলছিলো, তাই বলতে থাকো।’^{৪৩২} আল্লাহ বলেন, “যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা (মানুষ) আয়ত্ত্ব করতে পারে না।”^{৪৩৩}

দেওবন্দিগণ ও অদৃশ্যের জ্ঞান :

‘কিতাবুল ঈমান’ (পৃঃ৭৫)এ বর্ণিত হয়েছে - ‘ইলমুল গা’য়িব’ (অদৃশ্যের জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ তা’য়ালারই বৈশিষ্ট্য। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, ইত্যাদি আদি-অনন্তকাল ধরে শুধুমাত্র আল্লাহ তা’য়ালারই জানা। অনেক অদৃশ্য বস্তু ও ঘটনা, যথা- ফিরিশতা, জালাত, জাহান্নাম, কিয়ামাহ, ফিতরাহ, সিরাত, হাউজে কাওসার, ইত্যাদির খবর আল্লাহ তা’য়ালার কর্তৃক নাবী (আঃ) দের নিকট প্রদান করা হয়েছে। অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জন সৃষ্ট জীবের কোন বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব, নাবী (আঃ) ও আউলিয়াহুগণের অদৃশ্যের জ্ঞান নেই। যেহেতু, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তা’য়ালারই একমাত্র প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য; কাজেই, কোন নাবী বা ওলীর অদৃশ্যের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা কুফরী।

দেওবন্দিগণের বইয়ে এটি এবং অন্যান্য সাধারণ উদ্ধৃতি ‘ইলমুল গা’য়িব’ বা অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে (মিথ্যা) ধারণা দেয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহরই

৪৩০। সূরাহ আল-আন’আম (৬ঃ৫০)।

৪৩১। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ), ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭৮।

৪৩২। সহীহ আল-বুখারী (ইং অনুঃ), ৫ম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৬।

৪৩৩। সূরাহ আল-বাকারাহ (২ঃ২৫৫)।

অধীনস্থ এবং নাবী (আঃ) গণ ব্যতীত মানুষ অদৃশ্যের জ্ঞান সরাসরি পায়না। কিন্তু, বাস্তবতা পুরোপুরি উল্টো। যদিও তারা স্বীকার করে যে, অদৃশ্য সম্পর্কে শুধু আল্লাহুই জানেন, কিন্তু, দেওবন্দিগণ তাদের শাইখ, সুফী এবং মুন্নব্বীদেরকে গায়িবের জ্ঞানে প্রবেশাধিকার দেয়। এটা নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়-

১। ‘আশরাফুস্-সাওয়ানেহ’^{৪৩৪} থেকে-হযরত (আশরাফ আলী থানভী)-এর জন্ম কাহিনী অত্যন্ত বিস্ময়কর, যা তাঁর পরিবারে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। পরিবারের মুন্নব্বী এবং উপস্থিতদের থেকে শুনে হযরত নিজেই তা লিখেছেন, “মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর পিতা পুরুষত্বহীনতায় ভুগছিলেন বিধায় তাঁর নানাজী, হাফিজ গুলাম মুর্তুজা, মাজযুব পানিপথী নামে এক পীর (সাধু) এর নিকট অভিযোগ করলেন, “আমার কন্যার ছেলেরা বেঁচে থাকে না।” পীর সাহেব জড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘তারা উমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এর ঝগড়ার কারণে মারা যায়। এটাকে আলী (রাঃ) এর জিম্মায় দাও, সে বেঁচে থাকবে।’ মাওঃ আশরাফ আলী থানভীর মা ছাড়া আর কেউ কথার অর্থ বুঝলো না। তিনি (থানভীর মা) বললেন, ‘পীর সাহেব বুঝিয়েছেন, পিতা ফারুকী বংশোদ্ভূত (উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ এর উত্তর পুরুষ) এবং মা আলাভী বংশোদ্ভূত (আলী রাঃ এর উত্তর পুরুষ); এ পর্যন্ত নাম (ছেলের) পিতার নামের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যেমন- ফাজল-ই-হাক্ক। এর পর থেকে ছেলের নাম মায়ের পরিবারের সাথে যুক্ত করে দিতে হবে এবং নাম ‘আলী’ দিয়ে শেষ হবে।’ পীর সাহেব হেসে বললেন, ‘এটা তাই, যা আমি বুঝাতে চেয়েছি’। তারপর, তিনি বললেন, ‘ইনশা’আল্লাহ! দুই ছেলে হবে এবং তাঁরা বেঁচে থাকবে। একজনের নাম রাখ আশরাফ আলী খান এবং আর একজনের নাম রাখ আক্বার আলী খান। তিনি আরও বললেন, দুই জনই ‘সাহিব-ই-নাসীব’ (ভাগ্যবান) হবে; একজন হবে আমার, সে হবে মৌলভী (ধর্মপ্রাণ) এবং হাফিজ, আর একজন হবে বৈষয়িক।’ এই বইয়ের সংকলক বলেন, ‘ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল’।

নোটঃ এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায়, মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর পরিবার অত্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন। যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, জন্ম থেকে আরম্ভ করে বাচ্চা কিভাবে বড় হবে, তার আগাম জ্ঞান পীর সাহেবের আছে। এ থেকে আরো জানা যায় যে, আশরাফ আলী থানভীর পরিবারের যে পীরের প্রতি এত উঁচু স্তরের শ্রদ্ধা, তিনি একজন ঘৃণ্য রাফিজী শিয়া; যার বিশ্বাস, ইতিকালের

৪৩৪। আশরাফুস্-সাওয়ানেহ (উর্দু), মাকডুবাহ তালীফ-ই আশরাফিয়াহ- থানা ভবন, ইউ.পি. ৪র্থ খণ্ড, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা।

শতশত বৎসর পরে ও উমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) পরস্পর এ রকম ঘৃণা পোষণ করেন যে, উমার (রাঃ) এর পারিবারিক নাম রাখলে আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। আর আলী (রাঃ) এর জিম্মায় দিলে ছেলে নিরাপদ থাকবে।

২। মাওলানা মুহাম্মাদ মাসীহ উল্লাহ খান, মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর একজন খলিফা। তিনি তাঁর (থানভীর) অনেক কাজ মাওলানা ইলিয়াস (তাবলীগী জামা'য়াতের প্রতিষ্ঠাতা) এর নিকট থেকে (শিক্ষা) গ্রহণ করেছেন। তিনি (মাওলানা মাসীহ উল্লাহ খান) যে অবস্থায় আত্মা চিরদিনের জন্য আল্লাহর সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়, 'শরীয়াহ ও তাসাউফ' বইয়ের ১১৩ পৃষ্ঠায় সে সম্পর্কে বলেছেন, 'অতি উঁচু এই আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, যে জিনিসগুলো আয়ত্ত্ব হয়, তাতে যাত (আল্লাহন্বিত হওয়া), সিফাত (আল্লাহর গুণাবলী), আফ'আল (আল্লাহর কার্যাবলী), হাক্কায়িক (প্রকৃত সত্তা) এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।'^{৪৩৫}

৩। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'খাজা মাউদুদ চিশ্তী, কাশ্ফে কুলুব (আত্মার অবস্থা প্রকাশ) এবং কাশ্ফে কুবুর (কবরের ভিতরের অবস্থা প্রকাশ) এর ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।'^{৪৩৬}

৪। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'খাজা আবু ইসহাক, প্রায়ই সুলতান ফারসানাফাহর সাথে সাক্ষাত করতেন। একদিন তিনি সুলতানের বোনকে বললেন, 'তোমার গর্ভ থেকে একজন ভতিজা জন্ম গ্রহণ করবে।'^{৪৩৭}

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো-দেওবন্দিগণের, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য লোকদেরও অদৃশ্যের জ্ঞান আছে' এর অস্বীকৃতি অর্থহীন প্রমাণ করে। তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গা'য়িব সম্পর্কে জানেনা। কিন্তু, তাদের দাবী থেকে তারা আল্লাহময় হওয়া, আল্লাহর কার্যাবলী ও গুণাবলী, আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাহর মধ্যে সম্পর্ক, বার্ষাখে আত্মার গোপনীয়তা, জরায়ুতে ধারণকৃত বস্তুসহ গায়িবের কোন কিছুই বাদ দেয়না। দেওবন্দিগণ দাবী করেন, তাদের শাইখ্‌গণ হয় স্বপ্ন, ইল্‌হাম (আত্মায় স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ) অথবা কাশ্ফ (জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন), ইত্যাদির মাধ্যমে অদৃশ্য জগতে প্রবেশাধিকার পায়। এছাড়াও, তারা দাবী করেন যে, তাদের কিছু শাইখ্‌ সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম। পরবর্তী আলোচনায় তাঁদের ঘোষিত অদৃশ্যের জ্ঞানের উৎসসমূহের বিশ্লেষণ করবো, ইনশাআল্লাহ।

৪৩৫। শরীয়াহ ও তাসাউফ (১১৩ পৃষ্ঠা)।

৪৩৬। মাশাইখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ) ১৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৭। মাশাইখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ), ১৩১ পৃষ্ঠা।

স্বপ্নের মাধ্যমে অর্জিত তথ্য ও সংবাদ ৪

দেওবন্দিগণের লিখিত প্রায় সকল বইতেই, তা- সাধারণ পাঠকদের জন্য ফাজায়েলে আ'মাল, অথবা দেওবন্দি শাইখগণের আত্মজীবনী, অথবা সুফীবাদ ও অতিদ্রষ্টীয়বাদ ব্যাখ্যার বই; যা-ই হোক না কেন, সবগুলোতেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অন্যের বর্ণিত স্বপ্ন আছে।

স্বপ্নগুলি হয় দেওবন্দি বিদ্যাপীঠ এবং এর আলিমদের সুসংবাদ বিবৃত করেছে, অথবা তাদের বিশ্বাস এবং কার্যাবলীর সমর্থনে প্রমাণ প্রদান করেছে। কোন সময় হয়তো, দেওবন্দিগণ দাবী করবেন, সমস্ত বইগুলিই স্বপ্নে-স্বপ্নে প্রকাশিত হবে। সুতরাং, স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া সংবাদ বা জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘বিশ্বাসী মু'মিনের (ভাল) স্বপ্ন নাবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।’^{৪৩৮}

তিনি (সাঃ) বলেছেন, ‘আল-মুবাশশিরাত (সুসংবাদ)’ ব্যতীত নাবুওয়াতের কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই’। তাঁরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল-মুবাশশিরাত কি?’ তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, ‘সত্য স্বপ্ন (যা খুশীর সংবাদ বহন করে)’।^{৪৩৯} এই হাদীস থেকে এটা পরিষ্কার যে, সন্দেহমুক্ত ও নির্ভুল সংবাদসহ নাবুওয়াতের ধারাসমূহ প্রত্যাদেশ হওয়া শেষ হয়ে গেছে। সত্য স্বপ্ন থেকে এটুকু উপকারই আসে, যা মুবাশশিরাত বা সুসংবাদ।

স্বপ্ন, ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের উৎস নয়; কারণ, ধর্ম পরিপূর্ণ, এর সাথে কিছু সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তনের সুযোগ নেই। “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম, ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম।”^{৪৪০}

স্বপ্ন বেশীর পক্ষে, মজল ও উৎসাহ দান করতে পারে। সেই জন্যই, কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, সে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘নিঃসন্দেহে, স্বপ্নের ফলাফল নির্ভর করে ব্যাখ্যার উপর....। সুতরাং, তোমাদের কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, সে

৪৩৮। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৬।

৪৩৯। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৯।

৪৪০। সূরাহ মায়দাহ (৫ঃ৩)।

যেন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য লোক বা আলিম ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ না করে।^{৪৪১}

যদিও স্বপ্ন সুসংবাদ প্রদান করে, তারপরও -

(১) প্রত্যেক স্বপ্নই সত্যি নয় :

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “স্বপ্ন তিন প্রকার; প্রথম- ভালো স্বপ্ন, যা আল্লাহ থেকে সুসংবাদ বহনকারী; দ্বিতীয়- শয়তানের পক্ষ থেকে, যা বেদনার উদ্রেক করে; এবং তৃতীয় প্রকার, একজনের নিজের মনের কল্পনা।”^{৪৪২}

(২) যে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে :

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘ভালো স্বপ্ন, যা সত্যে পরিণত হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।’^{৪৪৩} এই হাদীস থেকে দেখা যায়, যদি স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়, তখনই মাত্র নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি সুসংবাদ এবং তখনই মনে করা যেতে পারে যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত। এছাড়া, আর কোন পছাই নেই, যদ্বারা বুঝা যায় স্বপ্নটা সত্য।

(৩) স্বপ্নের ব্যাখ্যা পুরোপুরি ঠিক নয় :

স্বপ্নের ব্যাখ্যা, বিশেষভাবে সেইগুলোর, যা প্রতীকী সংবাদ বহন করে, পুরোপুরি সত্য নাও হতে পারে। সহীহ বুখারীতে (নবম খণ্ড, হাদীস নং ১৭০) বর্ণিত হয়েছে, আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) একজনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যাখ্যাটা শুনে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, ‘তুমি কিছু ঠিক ও কিছু ভুল বলেছো।’^{৪৪৪} সুতরাং, আবু বাকর (রাঃ) এর মত জ্ঞানীলোক এবং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর এত ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি!

এই হাদীস আরও প্রমাণ করে, ওহীর মাধ্যমে নাবী-রাসুলদের নিকট যে রকম নিশ্চিত ও নির্ভুল সংবাদ দেওয়া হয়; সেখানে স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া সংবাদের সূফল সীমাবদ্ধ, সব সময় সত্য নাও হতে পারে; অর্থাৎ, অনিশ্চয়তায় পরিবেষ্টিত। নাবী-রাসুলদের দেখা স্বপ্ন ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ, কোন কোন সময় স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী প্রদান করা হয়। নিঃসন্দেহে, এই স্বপ্নগুলো নির্ভুল জ্ঞানের উৎস, যেমন- আয়িশা

৪৪১। আল-হাকিম, মিলসিলাহ আল-হাদীস আস-সহীহাহ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৬-১৮৮ হাদীস নং-১২০।

৪৪২। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৬২১।

৪৪৩। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫।

৪৪৪। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১৭০।

(রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘ঘুমের সময় ভাল ও পুণ্যে ভরপুর স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর প্রতি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ শুরু হয়। দিবালোকের মতো সত্যে পরিণত হয়নি, এরূপ স্বপ্ন তিনি (সাঃ) কখনও দেখেননি।’^{৪৪৫}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত স্বপ্নগুলোও পথনির্দেশের উৎস হতে পারে, কারণ- “এবং সে নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলে না, তাঁর প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, তা ব্যতীত।”^{৪৪৬} এর একটা ভাল উদাহরণ হলো ‘আযান’, যা সাহাবী স্বপ্নে দেখেছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) স্বপ্নের সত্যতার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, তাই, সালাহুতে ডাকার জন্য আযানের প্রচলন হয়।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখা

দেওবন্দিগণের বইয়ে অনেক স্বপ্নের বর্ণনা আছে, যার মধ্যে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে দেখাও অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে (সাঃ) স্বপ্নে দেখাও সম্ভব, কিন্তু, সব দাবীই সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘যে আমাকে দেখে (স্বপ্নে), সে সত্যই দেখে; কারণ, শয়তান আমার অবয়ব ধারণ করে উপস্থিত হতে পারে না।’^{৪৪৭}

এরকম স্বপ্নগুলো সত্য স্বপ্ন, কিন্তু, একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্তে প্রমাণিত হতে হবে। যেমন, ইবনে সিরীন (রঃ) {স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধ} বলেছেন, ‘শুধুমাত্র, যদি সে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে তাঁর সত্যিকার অবয়বে দেখে।’^{৪৪৮}

সাহাবা (রাঃ) গণের এটি একটি প্রচলিত রীতি ছিল; যাকে স্বপ্নে দেখেছে, তার চেহারার বর্ণনা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর চেহারার সাথে সম্পূর্ণ মিল আছে কি না, তা যাচাই করা। ইমাম তিরমিযী (রঃ) তাঁর বই ‘কিতাব-আশ্-শামাইল’ এ বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং ৪১২), একব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বললো যে, ‘আমি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে দেখেছি’। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘যে আমাকে দেখে (স্বপ্নে), সে সত্যই দেখে; কারণ, শয়তান আমার অবয়ব ধারণ করে উপস্থিত হতে পারে না।’^{৪৪৯} তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘যে ব্যক্তিকে তুমি স্বপ্নে দেখেছো, তার কি বর্ণনা দিতে পারো?’ লোকটি স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিলো, এরপর ইবনে আব্বাস

৪৪৫। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, ৯১ পৃঃ, হাদীস নং-১১১।

৪৪৬। সূরাহ আন-নজম (৫৩ঃ৩-৪)।

৪৪৭। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৬।

৪৪৮। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১২।

৪৪৯। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৬।

(রাঃ) বললেন, ‘তুমি সত্যিই আল্লাহর রাসুল (সাঃ)কে দেখেছো’।

স্বপ্নে দেখা লোকটির বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণনা জিজ্ঞেস করা থেকে প্রমাণ হয়, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখার প্রতিটি ঘটনাই সত্য বলে ধরে নেয়া যাবে না।

‘যে আমাকে দেখে (স্বপ্নে), সে সত্যিই দেখে; কারণ, শয়তান আমার অবয়ব ধারণ করে উপস্থিত হতে পারেনা।’^{৪৫০} অর্থাৎ, শয়তান আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর হুবহু অবয়ব ধারণ করে আসতে পারেনা। শয়তান স্বপ্নে এবং বাস্তবে অন্য কারো আকৃতি ধারণ করে আসতে পারে, লোকদের ধোঁকা দিতে। বদর যুদ্ধের সময়, ইব্রাহিম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রেরণা যোগাতে অবিশ্বাসী কুরাইশদের সামনে সুরাক্বাহ্ বিন মালিকের আকৃতি ধারণ করে এসেছিল। সাহাবা (রাঃ) গণ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারার সাথে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। তাই, উক্ত হাদীসটি তাঁদের জন্য পুনঃনিশ্চয়তা দানকারী যে, যদি তাঁরা {সাহাবী (রাঃ) গণ} তাঁকে (রাসুল সাঃ) স্বপ্নে দেখে, তা হলে তাঁরা সত্যিই দেখে। শয়তান নাবী-রাসুল, সাধু-আউলিয়া, অথবা যে কোন লোক হওয়ার দাবী করতে পারে। তাই, যে স্বপ্নগুলিতে রাসুল (সাঃ) কে সত্যিকার আকৃতিতে দেখা যাবে, সেগুলিই শুধু রাসুল (সাঃ) কে দেখার স্বীকৃতি পেতে পারে। এমনকি, স্বপ্নগুলোতে একজন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে দেখে, কিন্তু, কোন শরীয়াহর বিধান দিতে নয়।

স্বপ্নের জগতে দেওবন্দিগণ

যেহেতু, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ গৃহীত হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের বইগুলি তাদের গোষ্ঠী, বিদ্যাপীঠ এবং আলিমদের সুসংবাদ (মুবাশ্শিরাত) এ ভরে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত দেওবন্দিগণ এই সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। নিম্নে কিছু স্বপ্নের বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে দেওবন্দিগণ দাবী করেছেন, তাদের নিজেদের সুসংবাদ, সুফীগণের পদ্ধতি, সাধু-সন্তদের পূজা, অতিরঞ্জন এবং অন্ধভাবে অনুসরণ, ইত্যাদিতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুমোদন রয়েছে। তাই, এটা বিশ্বাস করাবার জন্য লোকদের বিপথগামী করেছেন।

১। রাশীদ আহমেদ গাঙ্গোহী ‘আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়াহ্’তে দেওবন্দি মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, এক বৃজুর্গ ব্যক্তির রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে দেখার (স্বপ্নে) সুযোগ হয়েছিল। সে দেখেছে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) উদুতে কথা বলছেন। বৃজুর্গ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি আরবদেশীয় লোক হয়ে এই ভাষা কি করে জানলেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘যখন থেকে আমি দেওবন্দ মাদ্রাসার আলিমদের

সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি, তখন থেকে আমি এই ভাষা জানি।' রাশীদ আহমেদ গাঙ্গোহী মন্তব্য করেন, 'এথেকেই আমরা এই মাদ্রাসার গুরুত্ব বুঝতে পারি'।^{৪৫১}

২। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'একদা তিনি (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) স্বপ্নে দেখেন, তাঁর সত্তা এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে, তিনি আতঙ্কে পা উঠাতে পারছেননা। হঠাৎ, তার পূর্বপুরুষ মোল্লা বুলাক্কী উপস্থিত হয়ে তাঁর হাত ধরে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সামনে হাজির করলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর (হাজী সাহেব) হাত ধরে শাইখ্ মাশাইখ্ হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদের অধীনে দিলেন।'^{৪৫২}

৩। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'হযরত (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) এর শ্যালিকা স্বপ্নে দেখলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলছেন, 'উঠো (চলে যাও), ইমদাদুল্লাহর আলিম অতিথিবৃন্দের জন্য আমি খাবার তৈরি করবো।'^{৪৫৩}

৪। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'একদা একলোক স্বপ্নে দেখলো, হযরত হাজী সাহেব (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মুবারাক আলখিল্লাহ পরিধান করে আছেন।'^{৪৫৪}

৫। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহ করে তিনি (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) পবিত্র জায়গার ফায়েজ লাভ করেছিলেন। তিনি মদীনায় অবস্থান কালে জান্নাতের টুকরায় (পবিত্র ক্বাবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান) মুরাকাবাহয় ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যিয়ারাহ (সান্নিধ্য?) লাভ করেছিলেন, এবং তিনি (রাসুল সাঃ) তাঁর (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) মাথায় আমাম (পাগড়ী) পরিয়ে দিয়েছিলেন।'^{৪৫৫}

৬। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, 'সুরাট জেলার কোন এক গ্রামে সুলাইমান মিয়া নামে এক মাসজিদের ইমাম ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, পবিত্রতম চেহারার দুই বৃজুর্গ সিংহাসনে বসে আছেন। সুলাইমান মিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মহান ব্যক্তিগণ কারা?' তাঁরা উত্তর দিলেন, এই মহান ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং অন্যজন মাওলানা রাশীদ আহমাদ। মাওলানা আহমাদ বৃজুর্গের শাইখ্ এবং ধাবেল মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল।'^{৪৫৬}

৪৫১। আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া, ৩০ পৃষ্ঠা।

৪৫২। ইরশাদুল-মূলক (ইং অনুঃ) পৃঃ ২৯-৩০, মাশাইখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ) পৃঃ ২০৯ এবং ইমদাদুল-মুশতাক্ব ইলা আশরাফুল-আখলাক্ব (উর্দু) পৃঃ ৮-৯।

৪৫৩। মাশাইখ্-ই-চিশ্ত, পৃঃ ২২১, ইখমা'লুশ-শিয়া'ম (ইং অনুঃ), পৃঃ ৪৫, ইরশাদুল-মূলক (ইং অনুঃ), পৃঃ ৩২ এবং ইমদাদুল-মুশতাক্ব ইলা আশরাফুল-আখলাক্ব (উর্দু) পৃঃ ৮-৯।

৪৫৪। মাশাইখ্-ই-চিশ্ত, পৃঃ ২২৩।

৪৫৫। মাশাইখ্-ই-চিশ্ত, পৃঃ ২২১।

৪৫৬। মাশাইখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ), পৃঃ ২৪৮-২৪৯।

স্বপ্নের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য শর্তের শিথিলতা

দেওবন্দিগণের আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাঁরা সব রকম স্বপ্নই কোন সত্যতা প্রতিপাদন ছাড়াই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে সম্পর্কিত করেন। মাওলানা যাকারিয়াহর মতে, একজন যদি মনে করে, সে নাবী (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছে, তার স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে মিল হোক বা না হোক, অথবা স্বপ্নটি শরীয়াহ্ মোতাবেক হোক বা না হোক, তবুও, সে সত্যই নাবী (সাঃ) কে দেখেছে।

মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাজায়েলে আ'মালে বর্ণনা করেছেন-

‘স্বপ্নে নাবী হিসেবে ঘোষণা করার শক্তি শয়তানের নেই। যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, শয়তানকে পবিত্র রাসুল (সাঃ) বলে ভুল করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি কেউ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে সুন্দর অবয়বে না দেখে, তবে, তা স্বপ্নদ্রষ্টার অপারগতা। যদি কেউ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে নীতি গর্হিত কাজ করতে দেখে, তবে স্বপ্নটিকে ইসলামী আইনে ব্যাখ্যা করতে হবে, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা সাধু-সন্তও হয়।’^{৪৫৭}

যে শর্তগুলি ফাজায়েলে আ'মালে বর্ণনা করা হয়েছে, কুর'আন ও সুন্নাহ্ তার কোন ভিত্তি নেই এবং সাহাবা (রাঃ) গণের বুঝেরও বিপরীত। যদিও দেওবন্দিগণ ইবনে সিরীন ও তাঁর স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান সম্পর্কে অনেক কথা বলেন, কিন্তু তাঁর কথা-‘শুধুমাত্র সে যদি নাবী (সাঃ) কে তাঁর (প্রকৃত) অবয়বে দেখে’ কে প্রত্যাখ্যান করে।^{৪৫৮}

দেওবন্দিগণ নিজেরাই তাদের বইগুলোতে বর্ণনা করেছেন যে, শয়তান জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন নিয়ে শাইখ আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ)র সামনে উপস্থিত হয়ে দাবী করেছিলো যে, ‘সে (শয়তান) তাঁর (শাইখ জিলানী) প্রভু’ তৎপর, ঘোষণা করেছিলো যে, ‘যা তাঁর (শাইখ জিলানী) জন্য হালাল, তা অন্যদের জন্য হারাম’।^{৪৫৯} শয়তান যখন জাগ্রত লোকদের সাথে এরকম ধোঁকাবাজী করতে পারে, তখন স্বপ্নেও সে প্রভু বা নাবী হওয়ার দাবী করতেই পারে।

দেওবন্দিগণ কোন সময় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে সম্পূর্ণ সাদা দাঁড়ি বিশিষ্ট ও চশমা

৪৫৭। ফাজায়েলে আ'মাল, (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে দরুদ, ২য় পরিচ্ছেদ, ৬৭ পৃষ্ঠা (১৯৮৫ সংস্করণ, দ্বীন বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৪৫৮। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪, হাদীস নং- ১২২।

৪৫৯। কিতাব আল-ওয়াসীলাহ্, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া সংকলিত, পৃ ২৪৬।

পরিহিত অবস্থায়^{৪৬০} দেখে, আবার অন্য সময় দেখে ইংলিশ টুপি পরিহিত অবস্থায়।^{৪৬১} ফাজায়েলে আ'মাল একলোকের স্বপ্নের বর্ণনা করেছে যে, সে স্বপ্নে দেখেছিল আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন (আদেশের সুরে), 'মদ্য পান কর'।^{৪৬২} জীবিতাবস্থায় যে কাজটি তিনি (সাঃ) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম) করেছিলেন, স্বপ্নে সেই কাজকে শয়তানের খোঁকাবাজী বলে প্রত্যাখ্যান না করে, ফাজায়েলে আ'মাল এই স্বপ্নটিকে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপর আরোপ করেছেন, আর বলেছেন, 'এটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে'। এমনকি, সাধারণ স্বপ্ন, যেগুলো অপছন্দীয়^{৪৬৩} এবং ভীতিকর,^{৪৬৪} তা শয়তানের উপর আরোপ করা হয়। পাপপূর্ণ এবং শরীয়াহ বিরোধী স্বপ্নগুলো আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপর আরোপ করা ভীষণ অন্যায় ও জঘন্য গুনাহ। এরকম স্বপ্ন, লোকের জন্য সন্দেহ ও ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার কারণ হবে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার শর্তগুলোতে দেওবন্দিগণের নব উদ্ভাবন, অপ্রমাণিত স্বপ্ন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপর চাপিয়ে দেয়ার পরও আরো অগ্রসর হয়েছেন; যেমন- (১) আশরাফ আলী খানভী 'যে আমাকে দেখে (স্বপ্নে), প্রকৃতপক্ষে, সে সত্যই দেখে'^{৪৬৫} এই হাসীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে দেখেছে (স্বপ্নে), সে নিঃসন্দেহে আল্লাহকে দেখেছে।^{৪৬৬}

(২) রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী বলেন, 'শয়তান একজনের শাইখের চেহারায়^{৪৬৭} দেখা দিতে পারে না, যেমন, রাসুল (সাঃ) এর আসল চেহারায়^{৪৬৮} দেখা দিতে পারে না।

এইসব থেকে দেখা যায়, দেওবন্দিগণের স্বপ্ন সম্পর্কে বুঝ সাংঘাতিক ত্রুটিপূর্ণ; কাজেই, তাদের দাবীগুলো অগ্রহণযোগ্য।

স্বপ্নকে দলিল হিসাবে ব্যবহার

দেওবন্দিগণ তাঁদের ভুল বিশ্বাস এবং নবোদ্ভাবিত কার্যাবলীর প্রতি তাঁদের অনুসরণকারীদের মনকে অনুরক্ত করার জন্য সমর্থনকারী প্রমাণ হিসেবে স্বপ্নকে

৪৬০। বেহজাতুল-কুলুব (উর্দু অনুঃ), পৃষ্ঠা ১৬।

৪৬১। ফাইজুল-বারী বইয়ের প্রথম খণ্ড, ২০৩-২০৪ পৃষ্ঠায় মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি একটি স্বপ্ন যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৬২। ফাজায়েলে আ'মাল, (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে দরদ, ২য় পরিচ্ছদ, ৬৮ পৃষ্ঠা (১৯৮৫ সংস্করণ, দ্বীনি বুক ডিপো-দিব্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৪৬৩। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৪।

৪৬৪। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৪।

৪৬৫। সহীহ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৫।

৪৬৬। শামা'ইম-ই-ইমদাদীয়াহ পৃষ্ঠা ৪৯।

৪৬৭। মাওলানা যাকারিয়াহ, মাশাইখ-ই-চিশতেও বর্ণনা করেছেন (ইং অনুঃ), পৃঃ ২৫৬।

৪৬৮। ইরশাদুল-মূলক (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী কৃত ইমদাদুল-সুলাক এর উর্দু অনুবাদ), পৃঃ ২৭, কাহিনী নং- ৩। ইরশাদুল-মূলক (মাজলিসুল-উলেমা কৃত ইংরেজী অনুবাদ), পৃঃ ৪৯।

ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। আক্ষরিক অর্থে, ফাজায়েলে আ'মালের প্রতি দ্বিতীয় পাতায় স্বপ্ন আছে। কিছু দেওবন্দিগণের বিশ্বাস, ফাজায়েলে আ'মাল স্বপ্নকে ব্যবহার করে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য--

১। বার্বাখে থেকেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইহজগত সম্পর্কে অবগত।^{৪৬৯}

২। বার্বাখে থেকেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জীবিতদেরকে সাহায্য করেন।^{৪৭০}

৩। বনে-বনে ঘুরে বেড়ানো, সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন, স্বেচ্ছা-শ্রম ভোগ করা, ইত্যাদি নবোদ্ভাবন (বিদ'আহ)।^{৪৭১}

৪৬৯। জনাব সুলাইমান বিন সাহিম বলেছেন, তিনি পবিত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! যারা আপনার স্বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে আপনার উপর সালাম পেশ করে থাকে, আপনি কি তা বুঝতে পারেন?" পবিত্র নাবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ, আমি তাদের উপস্থিতি অনুভব করি এবং সালামের উত্তর দিই।' {ফাজায়েলে আ'মাল, (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে দরদ, ১ম পরিচ্ছেদ, ১৯ পৃষ্ঠা, (১৯৮৫ সংস্করণ, দ্বীনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)}।

৪৭০। একদা এক বৃদ্ধ ব্যক্তি স্থারী আবু বাক্বুর ইবনে মুজাহিদ (কুর'আনের শিক্ষক) এর নিকট এসে বললেন, 'গত রাতে আমার স্ত্রী একজন পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। পরিবারের লোকেরা আমাকে ঘি ও মধু নেয়ার জন্য বলেছে। একথা শুনে স্থারী আবু বাক্বুর দুঃখিত্যায় পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন এবং স্বপ্নে দেখলেন নাবী (সাঃ) তাকে বলছেন, 'বিচলিত হয়ো না, মস্ত্রী আলী ইবনে ইসার নিকট গিয়ে আমার সালাম জানাও এবং এই সংকেতটি বল, সে এক হাজারবার দরদ না পড়ে ঘুমায়ে না।...তাকে সংকেতটি বলার পর সদ্যজাত পুত্রের পিতাকে একশত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে বলবে'...যে ভাবে আদিষ্ট হয়েছিলে স্থারী আবু বাক্বুর সেভাবেই বললো এবং মস্ত্রীর নিকট থেকে একশত স্বর্ণ মুদ্রাই পেলো' (তাবলীগী কুতুব খানা, চক বাজার, ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত ফাজায়েলে আ'মাল, বাংলা অনুবাদ, ফাজায়েলে দরদ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ১১৭ পৃষ্ঠা, ৩৯ নং কাহিনী)।

৪৭১। শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ সুফী বলেন, 'আমি তেরো মাস পর্যন্ত ময়দানে-জঙ্গলে পেরেশান অবস্থায় ঘুরতে থাকি। এতে আমার শরীরের চামড়া পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। অবশেষে, নাবী (সাঃ) ও শাইখাইনের খিদমাহুয় সালাম পেশ করতে মদীনা যাই। রাত্রিতে ঘুমিয়ে গেলে নাবী (সাঃ) স্বপ্নে আমাকে বলেন, 'আহমাদ, তুমি এসেছো?' আমি বললাম, 'নাবী (সাঃ) আমি এসেছি। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, আমি নাবী (সাঃ) এর মেহমান।' নাবী (সাঃ) বললেন, 'দু'হাত খোল।' আমি দু'হাত খুললে, তিনি দিরহামে ভর্তি করে দিলেন। জেগে দেখি, আমার হাত দিরহামে ভর্তি। আমি তা থেকে কিছু কিনে খেয়ে আবার জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হই। {ফাজায়েলে আ'মাল, ফাজায়েলে হাজ্জ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ, কাহিনী-২৫, পৃঃ ১৭৯ (ইং অনুঃ, নতুন সংস্করণ, দ্বীনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)}।

- ৪। ‘মাজুব’, যারা প্রকাশ্যে শরীয়াহর প্রতি অবাধ্য, আসলে তারা উচ্চ স্তরের লোক।^{৪৭২}
- ৫। এই বিশ্বাস যে, আউলিয়াগণ মৃত্যুর পরেও ধর্মীয় কার্য-কলাপ করেন, ইহজগৎ সম্পর্কে সচেতন এবং জীবিতদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন।^{৪৭৩}

৪৭২। হযরত মালিক ইবনে নীনার (রঃ) বলেন, ‘আমি হাচ্ছে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথিমধ্যে এক যুবককে দেখতে পাই, সে পায়দল যাচ্ছে। তার কোন সওয়ারী বা খাদ্যস্রব্য কিছু নেই। আমি ছালাম দিলাম, সে উত্তর দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক! তুমি কোথা থেকে আসছো? সে বললো, ‘তার নিকট থেকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, খাদ্র-সামগ্রী কোথায়? সে উত্তর দিল, ‘তার জিন্মায়’। আমি বললাম, সরঞ্জামাদি ব্যতীত চলো, কি আছে বল? সে বললো, আমি সফরের শুরুতে পাঁচটি হরফকে পাথ্রে সন্নিবিষ্ট করেছি, কাক, হা, ইয়া, আইন ও সোয়াদ। আমি বললাম, এর অর্থ বুঝে আসলোনা। যুবক বললো, কাক অর্থ-কাফী দখল, হা অর্থ-হাদী, ইয়া অর্থ-ঠিকানা দাতা, আইন অর্থ-আলিম-সর্বজ্ঞানী, আর সোয়াদ অর্থ সাদিক। তিনি যথেষ্ট হিন্দায়াত দান করী, ঠিকানা দাতা, সর্বজ্ঞানী এবং গুয়াদা খিলাফ করেননা। সে যাত থাকতে আবার ভয় কিসের। হযরত মালিক (রঃ) বলেন, ‘তার কথা শুনে আমি তাকে আপন কুর্তী দিতে চাই। সে অস্বীকার করে বললো, ‘বড় মিমা! দুনিয়ার কুর্তীর চেয়ে উল্লর থাকা ভালো। হালাল বস্ত্র সমূহের জন্য হিসেব দিতে হবে, আর হারাম মালের জন্য ভোগ করতে হবে আযাব’। রাতের অন্ধকারে সেই যুবক আসমানের দিকে মুখ করে বললো, ‘হে যাতে পাক! বান্দাহ ইবাদাহ করলে যিনি সমুদ্র হন, আর পাপ করলে যার কোন ক্ষতি নেই, আমাকে ঐ জিনিস দান করুন, যাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই’। তারপর, লোকজন ইহরাম বেঁধে ‘লাক্বারিয়ক’ বলতে লাগলো, কিন্তু, সে ‘লাক্বারিয়ক’ বললোনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কেন লাক্বারিয়ক বলছোনা? সে বললো, ‘এই ভয়ে যে, আমি ‘লাক্বারিয়ক’ বললে, সেদিক থেকে ‘লা-লাক্বারিয়ক’ উত্তর আসি কিনা। তারপর, সারা পথ আর তাকে দেখলামনা। অবশেষে, মিনায় তাকে দেখলাম, সে শের পড়ছে, তার অর্থ এই যে-

“এ মাজুব আমার রক্ত বহাতে পছন্দ করেন। আমার রক্ত তাঁর জন্য হারামের বাইরেও হালাল এবং হারামের ভিতরেও হালাল। আল্লাহর কসম! আমার রক্ত যদি জানতো, কার সাথে তার সম্পর্ক, তবে সে পায়ের বদলে মাথার উপর দাঁড়াতো। হে তিরস্কারকারীগণ! তোমরা যদি দেখতে, আমি যা দেখছি, তবে, কখনও তিরস্কার করতে না। মানুষ শরীর দিয়ে ব্যয়তুদ্রাহর ভাওগ্রাফ করে। তারা যদি আল্লাহর যাতের ভাওগ্রাফ করতে, তবে হারাম শরীরের কোন প্রয়োজন ছিল না। ঈদের দিনে লোকজন ডেড়া-বকরী কুরবানী করছে, আর মাতক আমার জান কুরবান করে ফেলেছেন। কাজেই, আমি আমার রক্ত ও জান কুরবান করছি। মানুষ হাচ্ছ করছে, আর আমার হাচ্ছ হলো, যে জিনিসে আমার মনে শান্তি”। যুবকটি তারপর, এই দোওয়া করলো-

“মানুষ তোমার নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানী করছে, আর আমার কাছে কুরবানী করার মত কিছুই নেই। কাজেই, তোমার দরবারে আমি আমার জানটুকু পেশ করছি, তুমি তা কবুল কর”। তারপর, চিৎকার করে উঠলো এবং মাটিতে পরে মূর্দা হয়ে গেলো। এসময় পা’য়িব থেকে আওয়াজ আসলো, ‘ইনি আল্লাহর দোস্ত, আল্লাহর জন্য কুরবান হয়েছেন’। হযরত মালিক (রঃ) বলেন, “আমি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করি। সারারাত আমি চিন্তাঘুক্ত ছিলাম। একটু তন্দ্রা আসলে আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ‘জনাব! আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে?’ সে বললো, ‘তাঁরা কাকিরের তরবারীতে শহীদ হয়েছেন, আর আমি মাওলার ধেমের তলোয়ারে শহীদ হয়েছি।’ [ফাজায়েলে আ’মাল, তাবলীগী কুতুব খানা, চকবাগার, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশিত, ফাজায়েলে হাচ্ছ খণ্ড, পরিশিষ্ট, ১৯৩ পৃষ্ঠা, কাহিনী নং-৪]

৪৭৩। একদা একদল আরব, এক অভ্যস্ত দানশীল ব্যক্তির স্বাব্র যিয়ারাহ করতে গেল এবং সেখানে এক রাত্রি অবস্থান করল। তাদের একজন স্বপ্নে স্বাব্রবাসীকে দেখল এবং স্বাব্রবাসী তাকে বখ্তী (উন্নতমানের এক শ্রেণীর উট) উটের বদলে তার উটটি দিতে বলল। লোকটি সম্মত হলে, স্বাব্রবাসী লোকটি উটে দাঁড়ালো এবং উটটাকে যবেহ করল। যিয়ারাহকারী লোকটি যখন জেগে উঠলো, দেখলো সত্যিসত্যি তার উটটি যাবেহ করা হয়েছে এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে তখন, উটটির চামড়া ছাড়িয়ে মাংস বন্টন করে দিল। যখন, দলটি ফিরে যাচ্ছিল, তখন কোন এক সময় একটি লোক বখ্তী উট হাঁকিয়ে এসে জানতে চাইল, ‘তাদের মাঝে ভ্রমক নামের কোন লোক আছে কি না? যে লোকটি স্বপ্নে দেখেছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, আমি সেই লোক। বখ্তী উটের আরোহী লোকটি বলল, স্বাব্রবাসী লোকটি আমার পিতা এবং সে আমাকে স্বপ্নযোগে তার উটটি যাবেহ করা হয়েছে, তাকে এই বখ্তী উটটি পৌঁছে দিতে বলেছে।’ সে উটটি দিয়ে চলে গেল। [ফাজায়েলে আ’মাল, ফাজায়েলে সাদাকাহ খণ্ড (ইং অনুঃ), ৭ম পরিচ্ছেদ, কাহিনী-১৬, পৃঃ ১৯৩ (নতুন সংস্করণ ১৯৮২, বীন বুক ডিপো- দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।]

ইলহাম (আত্মায় স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ)

পরম দয়ালু আল্লাহ, কিছু ঈমানদার লোকের অন্তরে পথনির্দেশ (হিদায়াহ) জাহ্রত করেন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন- 'তোমাদের পূর্বে যাঁরা বাস করতো, সেই বানি-ইস্রাঈলদের মধ্য থেকে কোন কোন মানুষের অন্তরে পথনির্দেশ আসতো, যদিও তাঁরা নাবী ছিলেন না; এবং যদি আমার উম্মাহর মধ্যে এমন লোক হতো, তবে সে হতো উমার (রাঃ)'^{৪৭৫}। এই হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, 'এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আল্লাহর যারা প্রিয় বান্দাহ, তাঁরা অনুভূতি বা প্রত্যাদেশ পেতে পারেন'। আবু বাক্বর (রাঃ) এর পরে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ভিতর উমার ইবন খাত্তাব (রাঃ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পর এই জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন আবু বাক্বর (রাঃ) এবং তারপর, উমার (রাঃ)।^{৪৭৬}

সহীহ বর্ণনামতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) এই জাতির মুহাদ্দাস (স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অনুপ্রাণিত ব্যক্তি)। কোন মুহাদ্দাস বা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অনুপ্রাণিত ব্যক্তি যদি এই জাতির ভিতর থেকেও থাকে, উমার (রাঃ) তার চেয়ে অনেক উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন। রাসুল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছিলেন, কোন সময় তার বাইরের কিছু উমার (রাঃ) এর মনে উদয় হলেও তিনি রাসুল (সাঃ) এর কথাই অবশ্য কর্তব্য হিসেবে মেনে নিতেন। কোন কোন সময় তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে চলে আসতেন; উমার (রাঃ) এর মর্যাদার স্তরের উচ্চতা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের এটাই প্রমাণ। কোন কোন ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে ওয়াহী হওয়ার আগেই উমার (রাঃ) সে ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতেন^{৪৭৭}- এবং সেটার সমর্থনেই কুর'আনের আয়াত নায়িল হতো। আবার অন্য কোন সময় হয়তো রাসুল (সাঃ) যে সুসংবাদ পেতেন, তা উমার (রাঃ) এর মতের

৪৭৪। আব্দামা কাত্তালানী (রঃ) বলেন, 'আমি একবার এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হই যে, ডাক্তারগণ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে যায়। অবশেষে, আমি মক্কা শরীফ অবস্থান কালে নাবী (সাঃ) এর ওয়াসীলায় দোওয়া করলাম। রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তির হাতে একটা কাগজের টুকরা, তাতে লিখা রয়েছে, 'এটা আহমাদ বিন কাত্তালানীর জন্য ঔষধ। নাবী (সাঃ) এর তরফ থেকে তাঁর নির্দেশে এটা দান করা হয়েছে'। আমি ঘুম থেকে জেগে দেখি, আমার মাঝে রোগের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। {ফাজায়েলে আ'মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে হুজ্জ, ৯ম পরিচ্ছেদ, ১৭০ পৃষ্ঠা, ১১ নং কাহিনী (১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, বীন বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)}।

৪৭৫। সহীহ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৮।

৪৭৬। সহীহ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২০।

৪৭৭। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণিত- উমার (রাঃ) বলেছেন, 'আমার প্রত্যুত্তর তিনটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর ওয়াহী আমার (মতামতের) সাথে মিলিয়ে গিয়েছেন: মাকামে ইব্রাহীম, পর্দা-প্রথা এবং বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৯০৩।)

সাথে অমিল হতো; উমার (রাঃ) যখন এটা বুঝতেন, তিনি সাবেক অবস্থায় ফিরে আসতেন। যেমন, হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময়; তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন যে, মুসলমানদের যুদ্ধের পক্ষাবলম্বন করা উচিত। পরে, তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং সন্ধির পক্ষে মত দেন। এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীস, বুখারী এবং অন্যান্য সংগ্রহের গ্রন্থে ও পাওয়া যাবে।

নাবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর, কিছু লোকের আবু বাক্বর (রাঃ)র কাছে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি, আরেকটি দৃষ্টান্ত। আবু বাক্বর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, যাতে, উমার (রাঃ) আপত্তি করলেন। পরে, আবু বাক্বর (রাঃ)র সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তাঁর ধারণা থেকে সরে আসলেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন, “আল্লাহর কসম! আমি দেখলাম, তাদের বিরুদ্ধে {আবু বাক্বর (রাঃ) এর} যুদ্ধ ঘোষণা, আল্লাহর তাওহীদী প্রেরণা ছাড়া আর কিছু নয়। আর জানি যে, তাই ছিল সত্য।”

আরও একটা উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যে, আবু বাক্বর (রাঃ) এর মর্যাদা উমার (রাঃ) এর মর্যাদার উপরে, যদিও উমার (রাঃ) মুহাদ্দাস এবং তাঁর মনে সত্য প্রকাশিত হতো। এর কারণ- আবু বাক্বর (রাঃ) ছিলেন সিদ্দিক (চির সত্যবাদী এবং চিরবিশ্বাসী), এবং সিদ্দিক উপাধী তিনি পেয়েছিলেন আল্লাহর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে। যা ছিল ভুল-ভ্রান্তি তে পড়ার ভয় থেকে সুরক্ষিত। অপর পক্ষে, যিনি মুহাদ্দাস, তিনি নিজের মন এবং স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি থেকে বিষয়গুলো গ্রহণ করে থাকেন এবং এটা ভুলের উর্ধে নয়। কাজেই, তিনি ভুল সিদ্ধান্ত যাতে গ্রহণ না করেন, এজন্য সব সময় রাসুল (সাঃ) এর আদেশ-উপদেশের সাথে মিলিয়ে দেখতে হতো।

“এজন্যই উমার (রাঃ) সাহাবীদের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতেন, বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের উপদেশ চাইতেন। এর পরেও, কোন কোন ব্যাপারে সাহাবী (রাঃ) গণ তাঁর {উমার (রাঃ)} সাথে মতানৈক্য করতেন; এবং তার স্বপক্ষে কুর’আন ও সুন্নাহ থেকে যুক্তি তুলে ধরতেন। তখন উমার (রাঃ) মতানৈক্যের ব্যাপারে আলোচনা করতেন, যুক্তিসঙ্গত হলে তাঁদেরটা গ্রহণ করতেন। কখনও বলতেননা, ‘আমি মুহাদ্দাস, আমি স্বর্গীয় বা প্রত্যাদেশে অনুপ্রেরণা পাই; অতএব, আমার মতামতই গ্রহণ করতে হবে এবং এর সাথে মতানৈক্য করা চলবে না।’ সুতরাং, যে দাবী করে যে, আল্লাহর ঘনিষ্ঠ অথবা তাঁর সাথীরা তাঁর পক্ষ থেকে দাবী করেন যে, সে আলোকিত অথবা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত; তারপরেও, পূর্বযুগীয় আলিম (সালাফ) গণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে,- তার মতামত গ্রহণও করা যেতে পারে, আবার বাতিলও করা যেতে পারে (প্রশ্নাভীত নয়), একমাত্র রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর বর্ণনা ব্যতীত।”^{৪৭৮}

৪৭৮। ‘পরম দয়ালুর প্রিয় ও শয়তানের প্রিয় এর মান নির্ধারণী নীতি’- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৬১-৬৪।

যারা নাবী নন, তাদের স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহর উপরোক্ত আলোচনা সবকিছু খোলাসা করে দিয়েছে। উমার (রাঃ), যিনি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা প্রাপ্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর উদাহরণ থেকে আমরা পাই –

(ক) স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা, আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, স্বাবলম্বী উৎস নয়। অতএব, এটা সুন্নাহর সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা পরীক্ষা করতে হবে। যদি সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে, তাকে পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

(খ) আমরা উমার ইবন খাত্তাব (রাঃ) এর উদাহরণ থেকে দেখেছি, স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা প্রাপ্তদের সব মতামতই সঠিক নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন, “পূর্ববর্তী জাতিগুলি মনে করতো, তাদের জন্য মুহাম্মাদসীন থাকা জরুরী, যা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ এদেরকে এ প্রয়োজন থেকে মুক্ত রেখেছেন। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরে কোন নাবী বা মুহাম্মাদস থাকা জরুরী নয়। কারণ, আল্লাহ সমস্ত উত্তম গুণাবলী, জ্ঞান এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ {নাবী মুহাঃ (সাঃ) এর} একক পয়গাম্বারীর ভিতরে সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যা তিনি (আল্লাহ) পূর্ববর্তী নাবী-রাসুলদের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন।”^{৪৭৯}

দেওবন্দিগণ ও ইল্হাম

দেওবন্দিগণ দাবী করেন যে, স্বপ্ন বা ইল্হামের মাধ্যমে পুরো একটা কিতাবই একজনের মনে উদ্ভাসিত করা যায়। এটাও দাবী করা হয় যে, সুফীবাদের উপর ভিত্তিকৃত মাস্নাবী কাব্যগ্রন্থটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জালাল উদ্দিন রুমীর মনে জাগরিত করা হয়েছিল। দেওবন্দি আলিম মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ আখতার^{৪৮০} এর লেখা মাস্নাবীর উপর ভাষ্যগ্রন্থ, ‘মারিফ আল-মাস্নাবী’র ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, মাস্নাবী ঐশী প্রেরণার ফল, যা পরোক্ষভাবে মুহাম্মাদ রুমীর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আরো বলা হয় যে, জালাল উদ্দিন রুমীর মৃত্যুর পর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে মাস্নাবী অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যাহোক... “মাওলানা রুমী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারপরে একজন আলোকিত রুহ সম্পন্ন লোক আসবেন, যে নাকি মাস্নাবী সম্পূর্ণ করবেন, যা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

৪৭৯। ‘পরম দয়ালুর প্রিয় ও শয়তানের প্রিয় এর মান নির্ধারণী নীতি’- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৬১-৬৪।

৪৮০। মাওলানা আশরাফ আলী ধানভী ও মাওলানা যাকারিয়াহ (ফাজায়েলে আ’মাল লেখক)র অনেক খলিফাদের থেকে এই ভাষ্যের অনুমোদন পাওয়া যায়। দেখুন মারিফ-ই-মাস্নাবী, পৃষ্ঠা ১০-১৭।

“The commentary on this (story) remains unfinished, but the innermost has been closed and nothing more is coming forth (now). The remainder of this story is going to be said, speechlessly, unto the heart of someone who would possess soul-sight.” {অর্থাৎ, এর (উপাখ্যানের) বৃত্তান্ত অসমাপ্ত রয়ে যায়, কিন্তু, অন্তঃস্বত্বা রুদ্ধ হয়ে যায়; আর কিছুই প্রকাশিত হয় না। এই কাহিনীর অবশিষ্টাংশ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন অন্তরে নির্বাকে কথিত হবে।} সে অনুসারে, সেই অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছেন, মাওলানা মুফতী ইলাহী বাক্শ কান্দাহলভী...এবং ইনিই তিনি, যাকে মাওলানা রুমী আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন এবং তাঁর (রুমী) থেকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা পেয়ে মুফতী সাহেব মাস্‌নাবী সম্পূর্ণ করেছেন।^{৪৮১}...মুফতী ইলাহী বাক্শ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, অপর পক্ষে, মাওলানা রুমী জীবিত ছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে (ইসলামী পঞ্জিকা অনুসারে)।^{৪৮২}

আরো বলা হয়েছে, জালাল উদ্দিন রুমী রূহানীভাবে মাওলানা ইলাহী বাক্শ কান্দাহলভীকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কাজেই, ইলাহী বাক্শ কান্দাহলভীর বক্তব্যই মাওলানা রুমীর বক্তব্য। যেমন, কুর’আন আল্লাহর বাণী, যদিও তা আমরা পেয়েছি তাঁর রাসুল (সাঃ) এর মুখ থেকে।

মাওলানা যাকারিয়াহর মতে, মুফতী বাক্শ কান্দাহলভী আলাম-ই-রুই’আ (দর্শন ও স্বপ্নের জগৎ) এর মাধ্যমে গ্রন্থাকার মাওলানা রুমীর নিকট থেকে মাস্‌নাবীর জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তিনিই মুফতী সাহেবকে মাস্‌নাবীর ৭ম অধ্যায় সংযোজন করার জন্য নিয়োজিত করেছেন।^{৪৮৩}

দেওবন্দিগণের প্রসিদ্ধ শাইখ্, হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মাক্কী মাস্‌নাবী অত্যন্ত বেশী পছন্দ করতেন এবং প্রায়ই তিলাওয়াত করতেন, যা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো স্বব্যখ্যামূলক। তদুপরি, ব্যাক্ত করে যে -

- সূফীবাদের উপর সমস্ত কবিতাগুলোর সংগ্রহ সম্পূর্ণটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে।
- একজন মৃত সূফী শাইখের রূহ ৫০০ বৎসর পরে আর একজন জীবিত সূফীকে আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।
- এক সূফী থেকে অন্য এক সূফীর প্রতি আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাকে রাসুলদের প্রতি আল্লাহর ওয়াহীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- মৃত সূফী থেকে জীবিত সূফীর নিকট জ্ঞান স্বপ্নের মাধ্যমে স্থানান্তর করা যায় (মাওলানা যাকারিয়াহ্ প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী)।

৪৮১। দেখুন মা’রিক-ই-মাস্‌নাবী, পৃষ্ঠা ২৭।

৪৮২। মা’রিক-ই-মাস্‌নাবী, পৃষ্ঠা ২৮।

৪৮৩। মাশইখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ) পৃষ্ঠা ২১৯।

- একজন মৃত সূফী আর একজন জীবিত সূফীকে তার কিতাব সমাপ্ত করার জন্য নিয়োজিত করতে পারেন।

“সুতরাং, তাদের জন্য দূর্ভোগ, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্যে বলে, ‘এটি আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে’। তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা উপার্জন করেছে, তার জন্যও তাদের শাস্তি (রয়েছে)”।^{৪৮৪}

উপসংহার :

অতএব, স্বচ্ছ প্রমাণ সহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে—

- ১। আল্লাহ্ ছাড়া, অন্য কারো প্রতি অদৃশ্যের জ্ঞান আরোপ করা, কুর’আন ও সুন্নাহ সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছে।
- ২। নাবী রাসুলগণই একমাত্র অদৃশ্য জ্ঞানের পরিচ্ছন্ন উৎস, যা তাঁরা আল্লাহর নিকট থেকে (সীমিত পরিসরে) অনুপ্রেরণা, ওয়াহী বা স্বপ্নের মাধ্যমে পেয়েছেন।
- ৩। যদিও নাবী (সাঃ) এর পর অনুপ্রেরণা বা স্বপ্নের আকারে পথনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে; তাই বলে, এগুলো জ্ঞানের স্বতন্ত্র উৎস নয়, বা দ্বীনে সংযোজনযোগ্য নয়। এগুলো খুব বেশী হলে সুসংবাদ, মঙ্গল বা আশার প্রতীক হতে পারে।

কাশফ (ধ্যানের মাধ্যমে অদৃশ্য বস্তু বা দূরবর্তী কিছু দেখা)

মানুষ ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্নে দূরবর্তী জায়গা বা বস্তু দেখে থাকে। কিন্তু, কাশফ-এর মাধ্যমে মানুষ জাগ্রতাবস্থায় দূরবর্তী, অনুপস্থিত বা অদৃশ্য বস্তু দেখতে পারে বলে দাবী করা হয়। দেওবন্দিগণ লুক্কায়িত খবরের উৎস হিসেবে কাশফকে তাদের বূজুর্গ এবং শাইখগণের একটা গুণ বলে বিবেচনা করেন।

কাশফ এ জান্নাহ ও জাহান্নাম :

জান্নাহ ও জাহান্নাম এবং এখানের বাসিন্দাদের অবস্থা, অবস্থান, ইত্যাদির সবই গায়িবের অন্তর্ভুক্ত। এব্যাপারে রাসুল (সাঃ) এর মাধ্যমে আমরা যেটুকু জ্ঞান পেয়েছি, তা অত্যন্ত সীমিত। জাগ্রতাবস্থায় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে জান্নাহ ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। তিনি (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে দেখছি, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এমনকি, আমি জান্নাতে আগ্নের দেখে একগুচ্ছ আগ্নের তুলতে ইচ্ছা করলাম, যখন তোমরা আমাকে একটু এগিয়ে যেতে দেখেছো। এবং আমি জাহান্নাম দেখেছি, যার এক অংশ আর একাংশকে পিষে ফেলছে, যখন তোমরা আমাকে পিছিয়ে যেতে

৪৮৪। সূরাহ আল-বাক্বারাহ (২ঃ৭৯)।

দেখেছো; এবং এর ভেতর আমি ইবনে লুহাইকে দেখেছি^{৪৮৫}, সে তার উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে বিব্রতকর অবস্থায় ঘোরাফিরা করছে’।^{৪৮৬} এরকম দৃশ্য বিশেষভাবে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর জন্যই অনুমোদিত। অন্যদের জন্য জান্নাত, গা’য়িব বা অদৃশ্যের বস্তু, যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, “কেউই জানে না, তার কৃতকর্মের জন্য নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার রক্ষিত রয়েছে।”^{৪৮৭}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, মুসা (আঃ) বলেছেন, “হে আমার পালনকর্তা! জান্নাতে কার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা রয়েছে?” আল্লাহ বলেছেন, “যাদেরকে আমি পছন্দ করেছি, তাদের জন্য আমি স্বহস্তে পুরস্কার প্রস্তুত করেছি এবং সংরক্ষিত রেখেছি; আর কোন চোখ তা দেখেনি, কোন কান তা শুনেনি, এবং কোন মানুষের হৃদয় তা অনুভব করেনি।”^{৪৮৮}

এরপরেও, মাওলানা যাকারিয়াহ্ মাশাইখ্-ই-চিশ্তে দাবী করেছেন, খাজা ইল্ল মুম্বশাদ দীন্নারীর মৃত্যুর মুহূর্তে এক বৃজুর্গ তাঁকে জান্নাতে দাখিলের জন্য দোওয়া করেন। হযরত মুম্বশাদ হেসে বলেন, ‘ত্রিশ বৎসর যাবত জান্নাহ্ তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আমার সামনে হাযির হয়েছে, কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যও তা ভালোভাবে তাকিয়ে দেখিনি।’^{৪৮৯}

তাদের শাইখগণও জাগ্রতাবস্থায় জান্নাহ্ দেখেন, এই ঘোষণা করে দেওবন্দিগণ প্রকারান্তরে দাবী করেছেন, – তাদের শাইখ্ ও মাজযুবদের জন্যও এটি প্রযোজ্য, যা শুধুমাত্র বিশেষভাবে, নাবী-রাসুলগণের জন্য অনুমোদিত। তারপরও, এটি শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন, কে কে জান্নাহ্ বা জাহান্নামের বাসীন্দা। “বল, ‘আমি তো প্রথম রাসুল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’”^{৪৯০}

৪৮৫। আমার ইবনে লুহাই প্রথম ব্যক্তি, যে নাবী ঈসমাইল (আঃ) এর ধর্মকে পরিবর্তন করে ইবাদাহ্র জায়গায় মূর্তি স্থাপন করেছিল। মূর্তির নামে উষ্ট্রীর কান কেটে মানত হিসেবে ছেড়ে দেয়ার জাহিল কাজটিও সে-ই শুরু করেছিল।

৪৮৬। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং -১৯৬৮।

৪৮৫। আমার ইবনে লুহাই প্রথম ব্যক্তি, যে নাবী ঈসমাইল (আঃ) এর ধর্মকে পরিবর্তন করে ইবাদাহ্র জায়গায় মূর্তি স্থাপন করেছিল। মূর্তির নামে উষ্ট্রীর কান কেটে মানত হিসেবে ছেড়ে দেয়ার জাহিল কাজটিও সে-ই শুরু করেছিল।

৪৮৬। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ) ২য় খণ্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং -১৯৬৮।

৪৮৭। সুরাহ্ আস্-সাজ্জাদাহ্ (৩২ঃ১৭)।

৪৮৮। সহীহ মুসলিম (ইং অনুঃ), হাদীস নং-৩৬৩।

৪৮৯। মাশাইখ্-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ), ১২৮ পৃষ্ঠা।

৪৯০। সুরাহ্ আল-আহক্বাফ (৪৬ঃ৯)।

খারিজা ইবনে যায়িদ বিন ছাবিত বর্ণনা করেছেন, ‘উম-আল-আ’লা, এক আনসারী মহিলা, যে রাসুল (সাঃ) এর নিকট আনুগত্যের বায়াত করেছিল, সে আমাকে বলেছে-‘মুহাজিরগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে আমাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছিল, এবং আমরা পেয়েছিলাম উসমান ইবনে মায়ুনকে। তাঁকে আমাদের ঘরে থাকতে দিয়েছিলাম। অতঃপর, তিনি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যু বরণ করলেন। মৃত্যুর পরে তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হলো। রাসুল (সাঃ) এলেন, আমি বললাম, (মৃতদেহকে উদ্দেশ্য করে), ‘হে আবু আস্-সা’ইব! আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন। আমি ঘোষণা করছি, ‘আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করবেন।’ আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘তুমি কি করে জানলে, আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করবেন?’ আমি উত্তর দিলাম ‘হে আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ), আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক! তাঁকে ছাড়া আর কাকে আল্লাহ্ সম্মান দিবেন?’ আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘আল্লাহ্ র কসম! তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আল্লাহ্ র কসম! তাঁর জন্য সব শুভ কামনা করি (আল্লাহ্ র নিকট হতে), আল্লাহ্ র কসম! যদিও আমি আল্লাহ্ র রাসুল (সাঃ), আমি জানি না, আল্লাহ্ আমার সাথে কি রকম ব্যবহার করবেন।’ উম্ আল-আ’লা বললো, “আল্লাহ্ র কসম! এরপর, আর আমি কারো সততা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবো না।”^{৪৯১}

উসমান বিন মায়ুন একজন সাহাবী ছিলেন, মুহাজির (আল্লাহ্ র রাস্তায় দেশ ত্যাগকারী) ছিলেন, অনেক সং কার্যাবলীর অধিকারী ছিলেন^{৪৯২} এবং তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেছিলেন।^{৪৯৩} এই সমস্ত সদগুণ সহ ইন্তিকাল করার পরও আল্লাহ্ র রাসুল (সাঃ) আনসারী মহিলাকে ভৎসনা করে বলেছিলেন, ‘তুমি কি করে জানলে, আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করবেন?’

নাবী রাসুলগণের মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রগাঢ়তম জ্ঞান ও উপলব্ধি ছিল; ফলশ্রুতিতে, ত্বাক্ওয়াহ্ কাজ করতো। পরিণতিতে, যে সব বিষয় আল্লাহ্ র ইখতিয়ারে, তা থেকে মস্তব্য করতে নিবৃত্ত থাকতেন।

৪৯১। সহীহ্ আল-বুখারী (ইং অনুঃ) ৯ম খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩১।

৪৯২। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি জানি না আল্লাহ্ তাঁর (উসমান বিন মায়ুন) ব্যাপারে কি করবেন।’ উম্ আল-আ’লা বলেন, ‘আমি এজন্য বিশেষভাবে দুঃখিত, এবং তারপর আমি ঘুমিয়ে গেলাম এবং স্বপ্নে দেখলাম, উসমান বিন মায়ুনের জন্য বরণা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তা আল্লাহ্ র রাসুল (সাঃ) কে বললাম, এবং তিনি বললেন, ‘প্রবাহিত বরণা তাঁর সং কার্যাবলীর প্রতীক।’ {সহীহ্ আল-বুখারী (ইং অনুঃ), ৯ম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩২।}

৪৯৩। আল্লাহ্ র রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘পাঁচ প্রকারের লোককে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়, তারা হলো প্রগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, পেটের গীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে অথবা দালানের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, এবং আল্লাহ্ র রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।’ {সহীহ্ আল-বুখারী (ইং অনুঃ), ৪র্থ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮২।}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর নিজের সম্পর্কে এই বলে ধারণা করা হতে বিরত থাকতেন যে, যদিও, আমি আল্লাহর রাসুল, আমি জানিনা, আল্লাহ আমার সম্পর্কে কি করবেন'। নাবী (সাঃ) এর এই উক্তি, কারো জান্নাহ-জাহান্নামের প্রত্যয়নের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট^{৪৯৪}। কিন্তু, দেওবন্দিগণ বিশ্বাস/ধারণা করেন যে, কাশ্ফের সাহায্যে কিছু লোক অন্যের জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা দেখতে পান। মাওলানা যাকারিয়াহ ফাজায়েলে আ'মালে বর্ণনা করেছেন, শাইখ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রঃ) বলেন, “আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার ক্বালিমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়বে, সে দোষখের আগুন থেকে নাজাত পাবে। এটা শুনে আমি নিজের জন্য সত্তর হাজার বার, আমার স্ত্রীর জন্য সত্তর হাজার বার এবং এরূপে এ কালিমা কয়েক নিছাব আদায় করে পরকালের ধন সংগ্রহ করি। আমাদের পাশেরই এক যুবক কাশ্ফওয়াল বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। সে নাকি জান্নাত ও জাহান্নাম কাশ্ফের মাধ্যমে দেখতে পায়। কিন্তু, আমি তাতে সন্দেহযুক্ত ছিলাম। এক সময় ঐ যুবকের সাথে আহ্বার করতে বসি, হঠাৎ চিৎকার করে সে বললো, ‘আমার মা দোষখে জ্বলছেন, তার অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি’। যুবকের অবস্থা দেখে কুরতুবী (রঃ) বলেন, ‘আমি মনে মনে সত্তর হাজার বার পড়া একটা নিছাব ঐ যুবকের মায়ের জন্য বখশিশ করে দিলাম; কিন্তু, এক আল্লাহ ব্যতীত আমার এ আমলের কথা আর কারো জানা ছিলো না’।^{৪৯৪}

হঠাৎ যুবক বলে উঠলো, ‘চাচা আমার মা জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাত পেয়ে গেছেন’। কুরতুবী (রঃ) বলেন, ‘কিচ্ছা দ্বারা আমার দু’টি বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়েছে। প্রথমতঃ সত্তর হাজার বার কালিমা পড়ার বরকত, দ্বিতীয়তঃ ঐ যুবকের কাশ্ফের সত্যতা ও প্রমাণিত হলো’।^{৪৯৫}

এ কাহিনীতে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান জ্ঞান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান একজন কাশ্ফওয়াল যুবকের জন্য দাবী করা হয়েছে। সে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মাঝের ব্যাপারেও সচেতন, এবং সেই কারণে শাইখ কুরতুবীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানালো; যদিও শাইখ কুরতুবী “গোপনে কাজটি করেছিলেন, যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে না পারে।”

ফাজায়েলে আ'মালে আরো অনেক কাহিনী আছে, যেগুলো আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর

৪৯৪। “আল্লাহ তাঁর রাসুলের সমস্ত গোলাহ মাক করে দিয়েছেন” {সূরা ফাতহ (৪৮:৪২)} এবং তাঁকে জান্নাতে তাঁর অবস্থান দেখিয়েছিলেন {সহীহ আল-বুখারী ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-৭২১}। কুর'আন এবং হাদীস, ঐ সাহাবী এবং অনুসারীদের জন্য সাধারণ সুসংবাদ ঘোষণা করেছে, যারা বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৪৯৫। দেখুন, ফাজায়েলে আ'মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে যিকর, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩য় খণ্ড), ৫৯ পৃষ্ঠা (১৯৮৫ সনের সংস্করণ, বীনি বুক ডিপো-দিব্রী কর্তৃক প্রকাশিত)। মালফুযাত আল-বেরেলুজী এর ৪৮ পৃষ্ঠায় একই রকম একটি কাহিনী পাওয়া যাবে {দেখুন ‘বেরেলুজীগণ’, ২৯৭ পৃষ্ঠা}।

মাঝের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সুফীগণ জ্ঞানার্জন করতে পারে, বলে যে ভ্রান্ত ধারণা, তার অনুমোদন করে। যেমন, ফাজায়েলে দরুদে মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন- ‘আমার এক বিশ্বাসভাজন বন্ধু আমার নিকট লাখনৌর^{৪৯৬} একজন বিখ্যাত কাতিবের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তাঁর অভ্যাস ছিলো, প্রতিদিন সকালে লেখা আরম্ভ করা, শুরুতেই একটা সাদা খাতায় একবার দরুদ শরীফ লিখে, তারপর লেখার কাজ শুরু করা। উক্ত লোকটি যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে বলতে থাকে, হায়! সেখানে আমার কি উপায় হবে? ইত্যবসরে এক মাজযুব সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, বাবা তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার সেই সাদা খাতাটি, যেখানে দরুদ শরীফ লেখা হতো, তা সেই দরবারে পেশ করা হচ্ছে।^{৪৯৭}

চিশতিয়া খানদানের বিখ্যাত বুজুর্গ আব্দুল ওয়াহিদ (রঃ) বলেছেন, আমি ক্রমাগত তিন রাত্রি এই দোওয়া করছিলাম, হে আল্লাহ্ ! জান্নাতে যে আমার সাথী হবে, দুনিয়াতে তুমি আমাকে তার সাক্ষ্যাত করিয়ে দাও। তিন দিন পর আমাকে বলা হলো, তোমার সাথী হবে হাবশী বাদী “মায়মুনা সউদা”। আমি তার ঠিকানা জানতে চাইলে, তাও বলা হলো যে, সে কুফা নগরীর অমুক বংশের। আমি কুফায় গিয়ে তার খবর নিয়ে জানতে পারলাম, সে অমুক জঙ্গলে বকরী চড়ায়। আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, মায়মুনা পশমী গুদুড়ি পরে নামায পড়ছে এবং নিকটেই বাঘ ও বকরী একত্রে চড়ছে। সে তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে বললো, আব্দুল ওয়াহিদ! আজ নয়, কাল কিয়ামাহর জন্য ওয়াদা রয়েছে। আমি বললাম, আমার নাম তুমি কি করে জানলে? সে বললো, আলমে আরওয়াহ্য যার সাথে যার পরিচয় হয়েছে, এখানেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।^{৪৯৮}

এই ধরনের অনেক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে ‘ফাজায়েলে আ’মালে’, যে বইটি জাম’আতে তাবলীগ কর্মীদের প্রশিক্ষণ বই হিসেবে গণ্য, এবং তাঁরা এটিকে অত্যন্ত সম্মান করেন। সত্তর হাজার বার কালিমা পড়া জামা’আতে তাবলীগের লোকদের একটি বহুল অনুশীলনীয় অভ্যাস, যদিও দেওবন্দিগণ দাবী করেন যে, তারা কাশ্ফের ঘটনাগুলোকে শরীয়াহর ভিত্তি হিসেবে মানেন না।

‘ফাজায়েলে আ’মাল’ বিদ’আহুতী সংকার্ণাবলীর ছদ্মাবরণে সাধারণ লোকের মাঝে সুফীবাদের বিপজ্জনক গোঁড়ামিগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটায়। সুতরাং, এর ভেতরে আমরা পরিচ্ছন্ন বর্ণনা নাও পেতে পারি, যেমন...“আধ্যাত্মিক উন্নতির এই উঁচু স্তরে, যাত (আল্লাহ্য একীভূত হওয়া), সিফাত (আল্লাহর গুণাবলী), আফ’আল

৪৯৬। ইন্ডিয়ায় একটি শহর।

৪৯৭। ফাজায়েলে আ’মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে দরুদ, ৫ম পরিচ্ছেদ, ১১২-১১৩ পৃষ্ঠা (১৯৮৫ সনের সংস্করণ, দ্বিনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)। আরো দেখুন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর যা’দুস্ সাঈদ (ইংরেজী অনুবাদ, ১৫ পৃষ্ঠা)।

৪৯৮। ফাজায়েলে আ’মাল, ফাজায়েলে সাদাকাহ (ইং অনুঃ), ৭ম পরিচ্ছেদ, কাহিনী নং-৬২, ২১৭ পৃষ্ঠা (১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, দ্বিনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত) এবং মাশায়িখ-ই-চিশত (ইং অনুঃ), ১০৬ পৃষ্ঠা।

(আল্লাহর কার্যাবলী), হাক্কায়িক (চিরস্থায়ী সত্যতা), আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে সম্পর্ক, ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।^{৪৯৯} কিন্তু, আমরা দেখি, গল্পের মাধ্যমে সুফীবাদের গোঁড়া মতবাদের বিশ্বাসগুলিকে তালিমে ইলমের অন্তরালে, বিন্ময়কর সংগোপনে সাধারণ লোকদের শিখিয়ে অন্তরে-অন্তরে পোক্তভাবে গেঁথে দেয়া হচ্ছে (যা, মারাত্মকভাবে ঈমান-আক্বীদাহ বিধ্বংসী)।

অন্তরে লুকানো বিষয়ের জ্ঞান

আল্লাহ বলেন, “নিঃসন্দেহে! তারা তাঁর নিকট হতে গোপন রাখার জন্য তাদের অন্তরে বিদ্যে গোপন রাখে। নিঃসন্দেহে, তারা যখন তাদের অভিসন্ধি গোপন করে, তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। অন্তরে যা আছে, তা তিনি সবিশেষ অবহিত।”^{৫০০} শুধুমাত্র, আল্লাহই অন্তরের গোপন খবর জানেন। এ জ্ঞান কাউকেই দেয়া হয়নি, এমনকি, নাবী-রাসুলগণকেও নয়। নিম্নের হাদীস থেকে তা প্রতীয়মান হয়—

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) শুনলেন যে, কিছু লোক তাঁর হুজরার দরজায় ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, ‘আমি মানুষ মাত্র, তোমরা আমার নিকট মুকাদ্দামাহ নিয়ে এসেছো। আর, এটা হতে পারে যে, তোমাদের দু’পক্ষের মধ্যে একজন আর একজনের তুলনায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বাকপটুতায় বেশী শক্তিশালী। অতঃপর, আমি তার কথার ভিত্তিতে তার অনুকূলে ফায়সালা দিয়ে ফেলি। এতে যদি আমি তার ভাইদের কিছু হাক্ক কেটে নিয়ে প্রতিপক্ষকে দিয়ে দিই, তবে, ওটা জাহান্নামের আগুনের টুকরা কেটে দিই। এটা নেয়া, না নেয়া, তার ইচ্ছাধীন (পুনরুত্থান দিবসের আগে)।’^{৫০১}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যদি অন্তরের খবরই জানতেন, তবে মিথ্যা ও বাকপটুতা দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রায় নিজের পক্ষে নেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না।

মদীনার মুনাফিকরা, মক্কার কুরাইশরা এবং ইহুদীরা সর্বক্ষণ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ঝড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। কোন কোন সময় তারা মুসলমানদের ক্ষতিও করে ফেলতো, আবার কোন কোন সময় আল্লাহ ওয়াহীর মাধ্যমে তাদের আসল সঙ্কল্প তাঁর রাসুল (সাঃ) কে জানিয়ে দিতেন।

অতএব, আল্লাহ, যিনি সকল প্রশংসার যোগ্য, তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অন্তরের

৪৯৯। শরীয়াহ ও তাসাউফ, ১১৩ পৃষ্ঠা।

৫০০। সূরাহ হূদ (১১ঃ৫)।

৫০১। সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৬৩৮, মুসলিম।

খবর জানেনা। কিন্তু, দেওবন্দিগণের অনেক বইতে অনেক ঘটনার মাধ্যমে তাঁরা দাবী করেছেন যে, তাঁদের শাইখগণের অন্তরের খবর জানার জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তাঁদের বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো—

১। ‘হে সালিক! কোন কোন সময় আল্লাহ, জালাত ও পৃথিবীর লুক্কায়িত গুপ্ত বিষয় কাশ্ফ ও ইল্হামের মাধ্যমে তোমার নিকট প্রকাশ করেন; অর্থাৎ, দূরের জায়গার ভবিষ্যত ঘটনাবলী, অথবা সংবাদ, ইত্যাদি। তিনি তাঁর দাসদের অন্তরের গুপ্ত - বিষয় সম্পর্কে তোমাকে সচেতনতা প্রদান করেননা। এরকম সংবাদ পাবার (লোকের অন্তরের) তোমার ইচ্ছা করা ও উচিত নয়। কারণ, এ সচেতনতা তোমার নিজের সুবিধার্থেই তোমার জন্য বন্ধ করা হয়েছে। মানুষের মনের গুপ্ত-বিষয় জানার জ্ঞান শুধুমাত্র তাদেরকেই প্রদান করা হয়, যাদের মাঝে আল্লাহর দয়াদর্প গুণাবলী সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।’^{৫০২}

২। তায়ফিরাত আর-রাশীদ থেকেঃ ‘একদিন মৌলভী আমীর শাহ্ খান, রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর নিকট একটা কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, ‘একদিন আমি মাস্জিদ-আল হারামে এক বৃজুর্গ (শাইখ) এর সাথে বসেছিলাম। এক দরবেশ যুবক ঐ বৃজুর্গের দর্শনার্থে এসে তাঁর পাশে বসলো। বৃজুর্গ দরবেশ যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, ভাই! তোমার অন্তরে খুব ভালো একটা জিনিষ আছে। যদিও বেচারী তার অন্তরের অবস্থা লুকানোর চেষ্টা করেছিল, বৃজুর্গ এই কথা বলে সব প্রকাশ করে দিল যে, তোমার মনে এক যুবতীর প্রতিচ্ছবি রয়েছে... তার নাক এমন, চোখ এমন, তার চুল এরকম... মোটকথা তার চেহারার সমস্ত বর্ণনা দিলেন। যুবক ক্ষণিকের জন্য বিব্রত বোধ করলো; তারপর বললো, সন্দেহাতীতভাবে আপনি সত্যই বলেছেন। আমার কৈশোরে আমি ঐ মহিলার প্রেমে পড়েছিলাম। সর্বক্ষণ, মনে তার কথাই ভাবতাম, তাই তার প্রতিবিম্বটি আমার মনে এঁটে গেছে। যখনই আমি অবসাদগ্রস্ত হই, আমার দু’চোখ বন্ধ করি, তাকে দেখতে পাই। এতে আমি শান্তি অনুভব করি এবং আত্মা প্রশান্ত হয়। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মৌলভী আমীর শাহ্ চুপ হয়ে গেলেন, যেন রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী কিছু মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু, হযরত ইমাম রাব্বানী (রাশীদ আহমেদ গাঙ্গোহী) কিছু বললেননা।

যখন আমীর শাহ্ এ ঘটনাটা আরো কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন, শেষে রাশীদ আহমেদ গাঙ্গোহী কথা বলে উঠলেন। তিনি বলেন, ‘এটা কোন বড় কথা নয়, কারণ, তাঁর (বৃজুর্গ) চোখ বন্ধ করে তাঁর (দরবেশ যুবক) অন্তরের দিকে মনকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে, এই যা। হযরত হাজী সাহেব (আধ্যাত্মিক শাইখ হাজী

ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) এর সাথে বহুদিন ধরে আমার যোগাযোগ এমন ছিল যে, তাঁর সাথে আলোচনা না করে কোন বিষয়েই আমি ফায়সালায় আসতাম না; যদিও তিনি মক্কায় থাকতেন, আর আমি থাকতাম ভারতে। এরপর, বহুদিন ধরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাথেও আমার ঐ রকম যোগাযোগই ছিল। এই কথা বলে রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী চুপ হয়ে গেলেন।^{৫০৩}

৩। তায়কিরাত আর-রাশীদে আশিক ইলাহী মারাঠী বর্ণনা করেন, ‘মৌলভী ওয়ালী মুহাম্মাদ একদিন ভোরবেলা হযরত (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) এর সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটা মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে তিনি হাঁটছিলেন, ঐ দোকানে তখন সদ্য মিষ্টিগুলো তৈরী হচ্ছিলো। তিনি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে চিন্তা করছিলেন, এখন যদি আমার কাছে কিছু টাকা-পয়সা থাকতো, আমি কিছু মিষ্টি কিনতে পারতাম। তারপর, তিনি সোজা খানকাহর দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে হযরত (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) তার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাকে দেখেই হযরত বললেন, ‘মৌলভী ওয়ালী মুহাম্মাদ আজ আমার মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে, কাজেই তুমি এই চার আনা নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তোমার পছন্দ মত মিষ্টি নিয়ে এসো’। সুতরাং, ওয়ালী মুহাম্মাদ ঐ দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে এনে হযরতের সামনে রাখলেন। হযরত বললেন, ‘আমার মনের আশা যে, এই মিষ্টিগুলো তুমি খাবে’। এই ঘটনার পর থেকে ওয়ালী মুহাম্মাদ বলতেন, ‘আমি হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে ভয় করি, কারণ একজনের মনের ইচ্ছা তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, এবং হযরত তা জেনে ফেলেন’।^{৫০৪}

৪। ‘একদা কেরান্না মাস্জিদে এক ধার্মিক কসাই হযরত সাহিব (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) এর পাশে বসেছিলেন। সেখানে বসা অবস্থায় তার মনে চিন্তা হলোঃ ‘হযরত সাহেবের মর্যাদা উঁচু, না হযরত হাজী সাহেবের?’ হযরত তখনই মন্তব্য করলেন, ‘আহ্লুল্লাহ^{৫০৫} দের মর্যাদার তুলনা করা তাদের জন্য অসম্মান জনক, কে বড় আর কে ছোট?’^{৫০৬}

৫। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘হযরত শাইখ আবদুল হাদী সাহিব-ই-কাশুফ ছিলেন এবং সাধারণতঃ তিনি মানুষের মনের চিন্তা জানতে (কাশুফের মাধ্যমে) পারতেন; এবং তিনি তখনই উত্তর দিয়ে দিতেন’।^{৫০৭}

৫০৩। তায়কিরাত আর রাশীদ, ২য় খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৫০৪। তায়কিরাত আর-রাশীদ, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা।

৫০৫। আল্লাহ ওয়ালী লোক অথবা আউলিয়াহ।

৫০৬। মশাইখ-ই-চিশত (ইংরেজী অনুবাদ), ২২৬ পৃষ্ঠা।

৫০৭। মশাইখ-ই-চিশত (ইংরেজী অনুবাদ), ২০৬ পৃষ্ঠা।

৬। এক সময় হযরত (খলীল আহমদ) শাহরানপুরী, মাওলানা জাফরকে নিয়ে মৌলভী আবদুল্লাহ্‌ জান (একজন উকিল) এর সাথে দেখা করতে যান। পথে জাফর আহমাদ আশ্চর্য বোধ করলেন এই ভেবে যে, না ডাকতেই এই রকম একজন ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে হযরত কেন যাচ্ছেন? যখনই এই চিন্তা হলো, হযরত শাহরানপুরী তার দিকে ফিরে বললেন, 'যদিও দেখে মনে হয় মৌলভী আবদুল্লাহ্‌ জান দুনিয়াদারীর মানুষ, কিন্তু, তার মন-মানসিকতা অত্যন্ত ভালো।'^{৫০৮}

উপসংহার :

উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা দেখি যে, অন্তরের কাশ্ফ এর ব্যাপারে দেওবন্দিগণের ধারণা, কারো সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির ব্যাপার নয়, বা কারো ভাল অথবা মন্দ বিচার করে নয়— বরং, এটা নিখুঁত ও নিশ্চিত অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে জানা।

মৃত্যুর সময় এবং স্থান সম্পর্কে জ্ঞান

আব্দুল্লাহ্‌ কুর'আনে বলেন, “কখন কিয়ামাহু হবে, তা কেবল আল্লাহুই জানেন, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না, আগামী কল্য সে কি অর্জন করবে, এবং কেউ জানে না, কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।”^{৫০৯}

কিন্তু, ফাজায়েলে আ'মাল বর্ণনা করে এরূপ

আবুল হুসাইন মালিকি বলেন যে, তিনি বেশ কয়েক বছর শাইখ্‌ খায়ের নূরবাক্ষ এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মৃত্যুর আটদিন আগে শাইখ্‌ তাকে বলেন, ‘আমি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা মাগরিবের নামাযের সময় ইস্তিকাল করবো, এবং শুক্রবার জুম'আর সালাহুর পর আমাকে দাফন করা হবে।’ যদিও তিনি আমাকে ভুলে না যাবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু, আমি ভুলে যাই। শুক্রবার সকালে একব্যক্তি আমাকে শাইখের মৃত্যুর সংবাদ দেয়। আমি তাড়াতাড়ি তার কাছে যাই... লোকজনকে শাইখের মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করি। এক ব্যক্তি... আমার নিকট বর্ণনা করেন, শাইখ্‌ মাগরিবের সালাহুর আগে কিছুক্ষণের জন্য বেহঁশ হয়ে

৫০৮। মাশাইখ্‌-ই-চিশত (ইংরেজী অনুবাদ), ২৮৮ পৃষ্ঠা।

৫০৯। সূরাহ্‌ লুন্মান (৩১ঃ৩৪)।

যান। তারপর, তিনি কোনভাবে হুঁশে আসেন এবং ঘরের এক কোণে কোন ব্যক্তিকে কিছু বলেন (যে ব্যক্তি অন্যদের নিকট অদৃশ্য ছিলেন), ‘কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিন, আপনি আপনার কাজ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছেন, আর আমি আমার কাজের জন্য নির্দেশিত হয়েছি। আপনাকে যা করতে (আমার রুহু কবজ) বলা হয়েছে, তা আপনাকে ছেড়ে যেতে পারবে না, কিন্তু আমাকে যা করতে (মাগরিবের সালাহ আদায়) আদেশ করা হয়েছে, তা কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবে।’ তারপর, তিনি পানি চাইলেন, অজু করে মাগরিবের সালাহ আদায় করলেন। এরপর, তিনি নিজেই বিছানায় গুয়ে চক্ষু বন্ধ করে ইস্তিকাল করলেন।^{৫১০}

সাধু-সন্ত, যাদের (দাবী) সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগাযোগ

মাওলানা যাকারিয়াহ ফাজায়েলে হাজ্জে বর্ণনা করেছেন, ‘একদা আবদালদের’^{৫১১} একজন, খিজির (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি সাধু-সন্তদের মাঝে এমন কাউকে দেখেছেন কি না, যে তাঁর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী? উত্তরে তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ আমি দেখেছি। একদা আমি মদীনার মাসজিদে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে শাইখ আবদুর রাজ্জাক তাঁর ছাত্রদেরকে হাদীস দারুস করছিলেন। একপাশে এক যুবক হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসেছিলেন। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ‘তুমি কি দেখছেন না সকলে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস শুনছে, তুমি তাদের সাথে যোগ দিচ্ছ না কেন?’ মাথা না উঠিয়ে অথবা আমার দিকে লক্ষ্য না করেই যুবক উত্তর দিল, ‘সেখানে দেখছেন, তারা আবদুর রাজ্জাক (জীবিকা দাতার দাস) এর মুখ থেকে হাদীস শুনছে, আর এখানে দেখছেন একজনকে, যে সরাসরি আর-রাজ্জাক (আল্লাহ) এর নিকট থেকে হাদীস শুনছে।’ খিজির (আঃ) তাকে বললেন, ‘তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তবে, আমি কে, তা তুমি বলতে সক্ষম হবে।’ এবার সে মাথা তুলে বললো, ‘আমার অনুমান যদি অসত্য না হয়, তা হলে বলবো, আপনি খিজির (আঃ)’ খিজির (আঃ) বললেন, ‘এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর ওলীদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে, যারা এমন উচ্চ প্রসংশিত মর্যাদার অধিকারী যে, তাঁদেরকে আমি চিনতেই পারি না।’^{৫১২}

৫১০। ফাজায়েলে আ’মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে সাদাকাহ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৬০৯, (দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হিঃ, ১৯৯৩ খ্রিঃ। ওয়াশিংটন ইসলামিক ইনিস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত)।

৫১১। ইখ্বামুল শিয়ামের দেওবন্দি অনুবাদক ‘আব্দাল’ এর বর্ণনা দিয়েছেন এরকম, -‘আব্দাল’ আউলিয়াদের একটা অংশ, যাদের পরিচিতি গোপন থাকে। তাঁরা দৈব শক্তির অধিকারী এবং তাঁরা স্বর্গীয় আদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেন (ইখ্বামুল শিয়াম (ইং অনুঃ) পৃঃ ৫৯।)

৫১২। ফাজায়েলে আ’মাল, ফাজায়েলে হাজ্জ, (ইং অনুঃ) ৯ম পরিচ্ছেদ, কাহিনী নং ৯, পৃঃ ১৭১ (১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, মীনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

এই কাহিনীতে আমরা সুফীগণের পূর্ণ বিভ্রান্তি দেখতে পাই, যেখানে তাঁরা বিশ্বাস করে যে, তাঁদের মাঝে বিশেষ ব্যক্তির সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সুফীগণের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো তাঁরা মাতাল অবস্থায় অথবা ‘কথার কথা’ হিসেবে বলে না; বরঞ্চ, এটা তাঁদের বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং তাঁদের অনেক গ্রন্থে এগুলো বর্ণনা

করা হয়। যেমন, ‘সুফীগণের মতবাদ’ বইতে- ‘সাহুল বলেন, ‘ত্রিশ বছর ধরে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি, আর মানুষ মনে করে, আমি তাদের সাথে কথা বলছি।’^{৫১৩} এরকম বিশ্বাস, পরিস্কার কুফরী। কারণ, এতে মনে হচ্ছে, পথ প্রদর্শন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। যেমন, যুবক (উপরোক্ত কাহিনীর) বলেছেন ‘সেখানে দেখছেন, কিছুলোক আবদুর রাজ্জাকের (রিয়ক দাতার দাস) মুখ থেকে হাদীস শুনছে, আর এখানে একজনকে দেখছেন, আর-রাজ্জাকের (আল্লাহর) নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শুনছে।’

আল্লাহ কুর’আনে বলেন, ‘মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন, ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল বা বার্তাবাহক (জিব্রীল আঃ) ব্যতিরেকে, আল্লাহ যা চান, তা ব্যক্ত করেন তাঁর অনুমতিক্রমে; নিঃসন্দেহে, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।’^{৫১৪} নাবী মুসা (আঃ) এর সাথে (তুর পাহাড়ে) এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে (মি’রাজে) যেমন সরাসরি কথা বলেছিলেন, তেমন আর কোন মানুষের সাথেই বলেননি। যারা মনে করে, আল্লাহ তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন- এই বোকামী ও অজ্ঞতার সাক্ষী হলো আল-কুর’আন। আল্লাহ আরো বলেন, ‘এবং যারা কিছু জানেনা, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেননা কেন? এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলতো। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয়ই, আমি প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।’^{৫১৫}

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান

দেওবন্দিগণ দাবী করেন, তাঁদের অনেক শাইখ ও প্রখ্যাত আলিমগণের আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল, ও আছে। ‘মা’রিফ-ই-মাসনাবী’তে মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বুঝা যায় যে, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পাওয়া সুফীগণের জন্য সাধারণ ব্যাপার; যা তাঁরা আশা করেন এবং তা দ্বারা লোকের মঙ্গল সাধন করেন।

৫১৩। The Doctrines of the Soofis, Page-145.

৫১৪। সূরাহ আশ-শুরা (৪২ : ৫১)।

৫১৫। সূরাহ আল-বাকারাহ (২ : ১১৮)।

১। হাকিম আল-উম্মাহু থানাভী (রঃ), এই যুগসন্ধিক্ষেপে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখেছেন যে, আল্লাহর বন্ধুর যে কোন কারণে, ও যে কোন সময়ে, যখনই প্রয়োজন, তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ থাকা উচিত। অর্থাৎ, যখন সে সুস্থ ও মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে থাকে, উত্তেজনার বশে না থাকে, এবং স্বর্গীয় জ্ঞান প্রবাহ সংযমের মাধ্যমে স্বাভাবিক থাকে। এই মানসিক অবস্থায় একজনের উচিত, সেখানে অবস্থিত লোকের মঙ্গল সাধন করা। হযরত থানাভী (রঃ) মাস্নাবীর নিম্নোলিখিত ছন্দে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন— ‘যখন (তোমার প্রেমিক প্রভু) তোমাকে কথা বলতে বলে, তখন কথা বল, কথা বল আগ্রহভরে’।^{৫১৬}

২। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘শাইখ নিজাম উদ্দিন আল-উম্মী থানেশী কোন স্কুল-মাদ্রাসায় লেখাপড়া না করেই ইলম-ই-জাহিরী (শরীয়াহর বাহ্যিক জ্ঞান) অর্জন করেছিলেন। দিন ও রাতভর তিনি ‘নাফল-ই-ছবাত’ যিকর এবং যিকর-বিল-জাহুর (শ্রবণযোগ্য যিকর) এ মগ্ন থাকতেন। তিনি যিকরে এত গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন যে, পূর্ণমাস কুঠরী থেকে বের হতেন না।’^{৫১৭} জামা’আতে তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস এবং তার উত্তরসূরী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সম্পর্কেও একই রকম দাবী করা হয়ে থাকে।

৩। মাওলানা মঞ্জুর নুমানী ও আতিকুর রেহমান সাম্ভানী লিখিত ‘তায়কিরাত হযরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (পৃষ্ঠা-৩১)’ এ বর্ণনা করা হয়েছে, ‘মাওলানা ইলিয়াসকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল। অর্থাৎ, কোন আলিম বা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নয়। তাঁর অনেক বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছিল, পরে এর কিছু অংশ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফের বক্তৃতা থেকে পরিস্কার মনে হয়েছিল, তাঁকেও একই উৎস থেকে একই জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল।

৪। হযরত (মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ) এর পাঁচটি বক্তৃতায় আমি উপস্থিত ছিলাম, তার মধ্যে একটি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন, জ্ঞান তার অন্তর থেকে প্রচন্ড বেগে বেরুচ্ছে। পরিস্কার বুঝা যাচ্ছিল, তিনি কথা বলছেন না, তাঁকে দিয়ে বলানো হচ্ছে। আল্লাহর নিকট থেকে জ্ঞান হযরত (মুহাম্মাদ ইউসুফ) এর অন্তরে প্রচন্ড বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছে। এটা আমার দৃঢ় ধারণা যে, স্থায়ী যিকর^{৫১৮} এর মত সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় জ্ঞান প্রবাহিত হতো, হযরত ঘুমে অথবা জাগ্রত থাকুন।^{৫১৯}

৫১৬। মা’রিফ আল-মস্নাবী, ২৭ পৃষ্ঠা।

৫১৭। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ) পৃষ্ঠা-১৯১।

৫১৮। সূফীগণের ধারণামতে, সূফীগণের আত্মা সর্বক্ষণ যিকরে মগ্নওল থাকে।

৫১৯। তাজকিরাত হযরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ, পৃষ্ঠা-৩১, মাওলানা মঞ্জুর নুমানী ও আতিকুর রেহমান সাম্ভানী লিখিত।

তাউয়াজ্জুহ

আমরা আগেই দেখেছি, জ্ঞান কিভাবে ইল্হাম ও স্বপ্নের মাধ্যমে একজন থেকে অন্য জনে স্থানান্তরিত হয় (যেমন, কিভাবে ‘মা’রিফ আল-মাস্নাবী’)। অসাধারণ উপায়ে জ্ঞান স্থানান্তরের কথা মনে রেখেই আমরা সুফীগণের আর এক প্রকার ধারণার সম্মুখীন হয়েছি, যার নাম ‘তাউয়াজ্জুহ’। সুফীগণ দাবী করেন, ‘তাউয়াজ্জুহ’ শাইখদের একটা অলৌকিক শক্তি, যদ্বারা তারা একজনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর নিজের আংশিক বা পুরো জ্ঞান ঐ লোকের মনে প্রতিস্থাপন করতে পারেন। মাওলানা যাকারিয়াহর মাশাইখ-ই-চিশ্ত এর কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো—

১। আবু সাঈদ গাঙ্গোহী, যিনি হিন্দুস্থানের খলিফা ও প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত (নিজামুদ্দিন আল-উমরী) যে লোকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, সে তৎক্ষণাৎ ‘শাহিদ-ই-ওহুদ’ হয়ে যেতেন (শাহিদ-ই-ওহুদ এক রকম উচ্চ মর্যাদাশীল ওলী, যে সর্বক্ষণ স্বর্গীয় উপস্থিতি ও অনুভূতির মহা আড়ম্বরশালী অবস্থায় বসবাস করেন-মাশাইখ-ই-চিশ্তের অনুবাদক)।^{৫২০}

২। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘হযরত শাইখ আবদুল হাক্ক কুদ্দুস গাঙ্গোহী তাউয়াজ্জুহর শক্তিশালী দৃষ্টি মাওলানা জালাল উদ্দিনের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। ফলে, তাঁর (মাওলানা জালাল উদ্দিনের) সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার মুছে গিয়েছিলো’।^{৫২১}

৩। মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘তাঁর (খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী) একটা দৃষ্টি নিক্ষেপই একজনকে ‘সাহেব-ই-মা’রিফাত’ এ পরিবর্তিত করার জন্য যথেষ্ট’।^{৫২২}

৪। খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী হযরত উসমান হারুনীর নিকট থেকে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং তার তাউয়াজ্জুহ এর ফজিলতে খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী একদিনেই সুলুকের পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন।^{৫২৩}

৫। একদা খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী শত্রুভাবাপন্ন এক শিয়া-প্রধানের ফলের বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিয়া-প্রধান আবু বাকর, উমার এবং উসমান নাম ধারণকারী ব্যক্তিদেরকে হত্যা করতো। খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী এক পুকুর পারে বসলেন। শিয়া ব্যক্তি উগ্রমূর্তি ধারণ করে মঈন উদ্দিন চিশ্তীকে হত্যা করার জন্য উপস্থিত হলো। কিন্তু, হযরত যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, সে পড়ে গেলো। যখন সে চেতনা ফিরে পেলো, দেখা গেলো সে একজন অন্য মানুষ হয়ে গেছে এবং সে হযরতের একজন অনুগত শাগরেদ হয়ে গেছে।^{৫২৪}

৫২০। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৯২।

৫২১। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৮৮।

৫২২। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-৪৫।

৫২৩। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৪৫।

৫২৪। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৪৭।

৬। একদা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীকে তালিবীন (সুফী) দের প্রতি তাউয়াজ্জুহ্ নিষ্কেপ করতে বলা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কেন যোগী-ঋষির মতো কাজ করবো?’^{৫২৫}

এখানে রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাউয়াজ্জুহ্ হিন্দু যোগী-ঋষিদের কর্মপদ্ধতি। দেওবন্দিগণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার অভ্যাসটি পৌত্তলিক হিন্দুদের থেকে ধারণ করেছেন। এরকম তাউয়াজ্জুহ্‌র কাজ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সারা জীবনে কখনও দেখা যায়নি। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে শুধু ধীন শিক্ষা প্রদানের কাজটিই করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে, আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) এর মত সাহাবীও জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বক্ষণ রাসুল (সাঃ) এর পাশেই থাকতেন। আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “লোকেরা বলতো, ‘আবু হুরায়রাহ্ অনেক অনেক হাদীস বর্ণনা করেন।’ সত্যি বলতে কি, আমি আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) এর পাশেই থাকতাম এবং যা দিয়েই উদর পূর্তি হতো, খুশী থাকতাম”^{৫২৬} এই বর্ণনায় আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাদীসের জ্ঞানের কারণ, তিনি ভালো জীবন যাপনের রাস্তা খোঁজার বদলে বেশীরভাগ সময়ই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পাশে থাকতেন এবং তাঁর {রাসুল (সাঃ) এর} সমস্ত কথাই মুখস্ত রাখতেন।

তাছাড়াও, আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘চর্চার মাধ্যমেই জ্ঞানার্জন হয়’^{৫২৭} এভাবেই, কুর’আন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানসমূহ এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে পৌঁছেছে; অর্থাৎ, হিফজ এবং লেখার মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌ তাকেই আলোকিত করেন, যে আমার কথা শুনে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়।’^{৫২৮} তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন, ‘হে লোক সকল, শোন! যে উপস্থিত আছে, সে যেন আমার কথা, যে উপস্থিত নেই, তার কাছে পৌঁছে দেয়।’^{৫২৯}

পরিহাসযোগ্য হলেও সত্যি যে, দেওবন্দিগণের ইল্ম, তাঁদের শাইখ্, তাঁদের জীবনী, তাদের মুবাশ্শিরাত, ইত্যাদি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে এভাবেই পৌঁছেছে; তাউয়াজ্জুহ্‌র মাধ্যমে নয়। অন্যথায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা বা বই-পুস্তকাদি লিখার কোন প্রয়োজনই হতোনা।

৫২৫। মাশাইখ্-ই-চিশত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২৫০।
৫২৬। সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৭, হাদীস নং-৫৭।
৫২৭। সিলসিলাতুল-আহাদীস আস-সহীহাহ্ (১/৬০৫/৩৪২)।
৫২৮। সুন্নাহ্ ইবনে মাজাহ্ (ইংরেজী অনুবাদ), ১ম খন্ড, হাদীস নং-২৩০।
৫২৯। সুন্নাহ্ ইবনে মাজাহ্ (ইংরেজী অনুবাদ), ১ম খন্ড, হাদীস নং-২৩৪।

তাসাভ্ভূর-ই-শাইখ

এটা জ্ঞান ও সূফীবাদের সাথে জড়িত আর একটি ধারণা। যখন একজন সূফী তাঁর শাইখের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনই শাইখ মানসিকভাবে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে যায়। তাউয়াজ্জুহ ও তাসাভ্ভূর-ই-শাইখ একই রকম ধারণা। তাউয়াজ্জুহতে শাইখ মুরীদদের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে তার জ্ঞান মুরীদদের মাঝে স্থানান্তর করে। তাসাভ্ভূর-ই-শাইখে, মুরীদ অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে তার শাইখের নিকট থেকে জ্ঞান গ্রহণ করে। তাসাভ্ভূর-ই-শাইখ ও বৌদ্ধ সাধু এবং হিন্দু অতিন্দ্রিয়বাদীদের নিকট থেকে ধারণা করা।

১। ‘আরোয়াহ্-ই-ছালাছাহ্’ত বর্ণনা করা হয়েছে, খান সাহেব বলেছেন যে, “একদা হযরত (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) বললেন, ‘আমি কি বলবো?’ তাঁকে বলতে বলা হলো। তিনি আবাবো বললেন, ‘আমি কি বলবো?’ তিনি তৃতীয়বার বললেন, ‘আমি কি বলবো?’ তাঁকে বলতে বলা হলো। সুতরাং, তিনি বললেন, ‘পুরো তিন বৎসর হযরত ইমদাদ (ইমাদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) এর মুখচ্ছবি আমার অন্তরে ছিল, এবং প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে কোন কাজই করতাম না।’ তারপর, তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘আমি কি বলবো?’ তাঁকে বলতে বলা হলো। তিনি বললেন, ‘কিছু বৎসরের জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আমার ভিতরে ছিলেন, এবং তাঁকে প্রথমে জিজ্ঞেস না করে আমি কোন কাজই করতাম না।’ একথা বলার পরও তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘আমি কি বলবো?’ তাঁকে বলতে বলা হলো। কিন্তু, তিনি চুপ করে রইলেন। লোকেরা যখন তাঁকে বলার জন্য গীড়াপীড়ি করছিলো, তিনি তাদেরকে বলতে অস্বীকার করলেন।^{৫০০}

এটা ধারণাই করা যায়, এরপর কি আসছে।

২। মালফুয়াত হাকিম আল-উম্মাহ থেকে; একদা তিনি (আশরাফ আলী খানভী) বলেন, ‘এমন ধার্মিক লোক আছেন, যারা সারাক্ষণ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে দেখেন। যখন জালাল উদ্দিন সূফুতী একটা বর্ণনা শুনতেন, তিনি বলতে পারতেন, সেটা হাদীস কি না। কোন ব্যক্তি সূফুতীকে প্রশ্ন করলো, কি করে আপনি এটা

৫৩০। আরওয়াহ্-ই-ছালাছাহ্ পৃঃ ২৬৫ (দারুল ইশাত, করাচী কর্তৃক প্রকাশিত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী কর্তৃক সংকলিত (নং-১৯৭৬), কাহিনী নং-৩০৬ এবং তাজকিরাত্ আর্-রাশীদ (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর জীবনী, আশিক্ব ইলাহী মারাঠী লিখিত) ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৭।

করেন? তখন তিনি (সূযুতী) উত্তর দিলেন, ‘বর্ণনা শোনার পর, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মুখের প্রতি লক্ষ্য করি। যদি দেখি, তিনি উৎফুল্ল, তখন মনে করি, এটা হাদীস, আর যদি তাঁকে গম্ভীর দেখি, তবে মনে করি, এটা হাদীস নয়।’^{৫০১}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সাথে যাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ, সাহাবা (রাঃ) দেও এমন ক্ষমতা ছিলনা যে, নাবী (সাঃ) এর ইত্তিকালের পর তাঁর সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখতে পারতেন। জীবিতাবস্থায় যে জ্ঞান তাঁর {রাসুল (সাঃ)} নিকট থেকে পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে তাঁদেরকে খুশী থাকতে হয়েছে। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ), রাসুল (সাঃ) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তারপরও, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) প্রায়ই শুনতেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি, আবু বাক্র ও উমার গিয়েছিলাম (কোথাও), আমি, আবু বাক্র ও উমার প্রবেশ করেছিলাম (কোথাও), আমি, আবু বাক্র ও উমার বাহিরে গিয়াছিলাম।’^{৫০২} যাহোক, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ইত্তিকালের পর উমার (রাঃ) এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। এজন্য উমার (রাঃ) প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন, ‘আমি রিবা (সুদ) এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে কিছু বিষয় রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করতে পারিনি।’ একদা তিনি খুৎবায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি, তিনটি বিষয়ে নির্দিষ্ট ফায়সালা না দিয়ে তিনি {রাসুল (সাঃ)} আমাদেরকে ছেড়ে যাননি। যেমন, দাদা কতটুকু অংশ পাবে, আল-কালান্না (মৃতব্যক্তি, যার উত্তরাধিকারদের মাঝে পিতা বা পুত্র বেঁচে নেই) এর উত্তরাধিকারী, বিভিন্ন রকমের রিবা (সুদ)।’^{৫০৩}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, ‘কে আপনার অত্যন্ত প্রিয়জন?’ এতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আয়িশা’ (রাঃ)।^{৫০৪} কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ইত্তিকালের পর, আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট রাসুল (সাঃ) থেকে কোন আদেশ বা উপদেশ আসতো না। ক্বায়িস ইবনে আবু হাজম বর্ণনা করেছেন, ‘আয়িশা (রাঃ) যখন হাওয়াবে পৌঁছলেন, তিনি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে বললেন, “আমি মনে করি, আমার ফেরা উচিত। নিশ্চয়ই, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মাঝে সে কে, যাকে দেখে আল-হাওয়াবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে?’” অতঃপর, যুবাইর (রাঃ) বলেছিলেন, ‘তুমি ফিরে যাবে! হয়তো এটাই নিহিত আছে যে, তোমার মাধ্যমে আল্লাহ লোকদের মাঝে সন্ধি করে দেবেন’।’^{৫০৫} এটা জামাল যুদ্ধের ঘটনা, এবং আয়িশা (রাঃ) কেন ফিরে আসেন নি, এজন্য প্রায়ই অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ করতেন। রাসুল (সাঃ) এর ইত্তিকালের পর সাহাবীরা কিভাবে হাদীস থেকে পথ-

৫০১। মালফুযাত হাকিম আল-উম্মাহ (উর্দু) ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৯-১১০, মালফুয (বক্তব্য) নং-১৭১।

৫০২। সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫, হাদীস নং-৩৪।

৫০৩। সহীহ্ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ), ৭ম খন্ড, হাদীস নং-৪৯৩

৫০৪। সহীহ্ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ), ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯, হাদীস নং-১৪।

৫০৫। মুস্নাদে আহমাদ।

নির্দেশ গ্রহণ করতেন, এটি তার একটা নমুনা। তাঁরা জানতেন, বারখাথ জীবনে রাসুল (সাঃ) এর সাথে যোগাযোগ করাও সম্ভব নয় এবং কোন উপদেশ আশা করাও অবাস্তব।

উপসংহার :

‘অসৎকে সং থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো, আল্লাহ্ সে অবস্থায় বিশ্বাসীগণকে ছেড়ে দিতে পারেননা। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহর কাজ নয়, তবে, আল্লাহ তাঁর রাসুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।’^{৫৩৬}

একমাত্র আল্লাহই অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন। তিনি তাঁর এই জ্ঞানের কিছুটা তাঁর রাসুলদেরকে জানান, যারা সুসংবাদদাতা এবং আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী। সাহাবাগণ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) থেকে অদৃশ্যের যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে খবর পেতেন, তা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতেন। যাদুকের ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের মত অবিশ্বাসীদের কাজ ছিল, অসদুপায়ে অদৃশ্যের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করা এবং তদ্বারা নিরর্থক ভবিষ্যদ্বাণী, গোপনীয় ঘটনার অনুসন্ধান এবং অন্তরের গোপনীয়তার খোঁজ, ইত্যাদির চেষ্টা করা। তারা যা অর্জন করতো, তা শুধুমাত্র অনুমান, সন্দেহ ও মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই ছিল না; বরং, তা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানের ধারে কাছেও ছিল না। যেমন, ইবনে সাঈয়াদের কাহিনী:- যখন রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘আমি তোমার নিকট থেকে কিছু গোপন করছি।’ ইবনে সাঈয়াদ উত্তর দিল, ‘তা আদ-দুখ (ধোঁয়া)।’ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই বলে তাকে তিরস্কার করলেন, ‘দূর হয়ে যাও, তোমার যে মর্যাদা আছে, তার চেয়ে বেশী পাবার যোগ্যতা তোমার নেই।’^{৫৩৭} আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যা গোপন করেছিলেন তা কুর’আনের আয়াত {সূরাহ্ আদ-দুখান (৪৪ : ১০)}, ইবনে সাঈয়াদ শুধুমাত্র বলতে পেরেছিলো ‘ধোঁয়া’। এতে দেখা যায়, একজন শয়তানের ছত্রছায়ায় অন্তরের ভেদ জানার চেষ্টা করলে, সে সত্য থেকে অনেক দূরে থাকে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান গোপন করতেননা, বা শুধু তাঁর পছন্দের লোকদের কাছেই বলতেননা।^{৫৩৮} তাঁর ইস্তিকালের সাথে সাথে ধীন সম্পর্কে পথ- নির্দেশ এবং ‘সত্য

৫৩৬। সূরাহ্ আলে-ইমরান (৩ঃ ১৭৯)।

৫৩৭। সহীহ্ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ), ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৪৩৭।

৫৩৮। আবু তোফায়িল আ’মীর ইবনে ওয়াসীলাহ (রাঃ) বলেছেন, ‘আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম, এমন সময় এক লোক এসে আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, ‘নাবী (সাঃ) আপনাকে কি গোপন সংবাদ দিয়েছেন?’ তিনি অভ্যস্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, ‘নাবী (সাঃ) লোকদের থেকে গোপন করে আমাকে কিছুই বলেননা, কিন্তু, তিনি আমাকে চারটি জিনিস বলেছেন।’ অতঃপর, লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, সে গুলো কি?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘নাবী (সাঃ) বলেছেন, ‘যারা পিতার উপর রাগ করেন, আল্লাহও তাদের উপর রাগান্বিত হন; যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে ববেধ করে, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন; যে বিদ’আহ্‌তীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন; এবং যে জমিনের সীমারেখা গুলট-পালট করে, আল্লাহ তার উপরও রাগান্বিত হন।’ [সহীহ্ মুসলিম (ইং অনুঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯৩, হাদীস নং-৪৮৭৬]।

নাবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) বলেন, ‘... যে আপনাকে বলে যে, তিনি (সাঃ) গোপন করেন (আল্লাহর কিছু প্রত্যাদেশ), সে একজন মিথ্যুক।’ তখন তিনি তিলাওয়াত করেন, ‘হে রাসুল (সাঃ)! প্রচার করুন, আপনার স্বাক্ষের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা লিখিত করা হয়েছে।’ {সূরাহ্ মায়িদাহ/ ০৫ঃ৬৭, সহীহ্ আল বুখারী (ইং অনুঃ), ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৭৮।}

সংবাদ' যা আল্লাহ্ থেকে আসতো, তা বন্ধ হয়ে যায়। সত্য স্বপ্ন এবং ইল্হাম-সুসংবাদ, সাহায্য ও আশার উৎস হিসেবে চালু আছে। কিন্তু, এগুলো রাসুলদের প্রাপ্ত ওহীর মত নির্ভুল ও স্বতন্ত্র উৎস নয়। আল্লাহর দ্বীন একেবারে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত, এবং আল্লাহ্ ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ অথবা আয়াত, স্বপ্ন বা ইল্হামের মাধ্যমে প্রকাশ করেন না।

ইল্হাম ও স্বপ্নকে ঘিরে যে রহস্য আছে, দেওবন্দিগণ তার নিকৃষ্টতম অপব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তাদের বিদ্যাপীঠের অনুমোদন দিয়েছেন,- সে দাবী, ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং বিদ'আহ্ চর্চা, ইত্যাদিতে সাহায্যকারী হিসেবে স্বপ্ন ও ইল্হামের ব্যবহার করছেন। সাধারণভাবে যে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়, -আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান, তাউয়াজ্জুহ, তাসাভুহ-ই-শাইখ্ এবং কাশ্ফ ইত্যাদির মাধ্যমে দেওবন্দিগণ সে সব জ্ঞান পাওয়ার দাবী করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে শরীয়াহ্ বিরোধী কাজগুলোকেও বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

যদিও দেওবন্দিগণ তাদের শাইখ্গণের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করার জন্য সাহাবীদের কারামাত বা অন্য কিছু সাহায্য পায়নি; তারপরও, তাঁরা উমার (রাঃ) এর উদাহরণ উত্থাপন করেছেন। উমার (রাঃ) একদা সাহাবী সারীয়া (রাঃ) কে ডেকে বহু মাইল দূরবর্তী শত্রু সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এ ঘটনাকে দেওবন্দিগণ কাশ্ফ এর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করান এবং তাদের বৃজুর্গা কাশ্ফ এর মাধ্যমে জান্নাত, জাহান্নাম, ক্বাবর, অন্তরের সংবাদ এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহদের মাঝের ব্যাপারগুলো দেখতে পান বলে দাবী করেন।

পরিশেষে, জঘন্য ভ্রান্ত ধারণা যে,-তাঁদের কিছু উন্মাদ ও শাইখ্ সন্যাসীরা আল্লাহর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন,-এই দাবীকে গ্রহণ করে দেওবন্দিগণ আল্লাহর দেয়া সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছেন। শাইখ্ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ তাঁর 'আল-ফুরক্বান বায়না আউলিয়াহ্ আর-রাহমান ওয়া আউলিয়াহ্ আশ্-শয়তান' কিতাবের ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আল্লাহ্, আদেশ-নিষেধের হুকুম, অঙ্গীকার ও ভীতিপ্রদর্শন, হালাল-হারামের সীমা নির্ধারণ, ইত্যাদি, প্রদানের ক্ষেত্রে নাবী-রাসুলগণকে তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে 'যোগাযোগ-মাধ্যম' হিসেবে ব্যবহার করেছেন,- এই বিশ্বাসও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। হালাল হলো তাই, যা

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) করতে বলেছেন, হারাম হলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) যা নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব, যে বিশ্বাস করে যে, কোন ওলী (আউলিয়াহ্)র নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগাযোগের পথ আছে, সে কাফির এবং শয়তানের বন্ধু।

মাখলুক সৃষ্টি ও তাদের রিয়ক প্রদান, তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেয়া, তাদের অন্তরে হিদায়াহু প্রদান, শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা, তাদের যত প্রকার মঙ্গল প্রদান বা অনিষ্টতা দূর করা, ইত্যাদি, শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হওয়া সম্ভব। এসব ব্যাপারে তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন। নাবী-রাসুলগণকে মাধ্যম কখনই নিযুক্ত করেন নাই।”

দশম অধ্যায়ঃ

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন

অবতরণিকাঃ

‘অতিরঞ্জন’ অর্থ, স্বীনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা অতিক্রম বা লঙ্ঘন করা। বিশ্বাসে বা আ‘মালে অতিরঞ্জন, ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। আল্লাহ্ বলেন, “পক্ষান্তরে, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর অবাধ্য হবে এবং তাঁদের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।”^{৫৩৯}

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘ধ্বংস তাদের, যারা চরমপন্থা অবলম্বনকারী (স্বীনে)।’ তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন”।^{৫৪০}

সৎকর্মশীল লোকদের সম্মান ও মর্যাদার অতিরঞ্জনই অতীত জাতিগুলির পথভ্রষ্টতার মূল কারণ ছিলো। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ‘বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান হও। তোমাদের পূর্বসূরীগণ ধ্বংস হয়েছিল তাদের বাড়াবাড়ির জন্য’।^{৫৪১}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন (বাড়াবাড়ি) নিষিদ্ধ

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ির মধ্যে রয়েছে— তাঁর মর্যাদা আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তার চেয়ে আরো বাড়িয়ে বলা। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর উপর আরোপ করা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, তাঁর নিকট প্রার্থনা করা, তাঁর নামে শপথ করা, ইত্যাদি। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সতর্ক করেছেন, ‘খৃষ্টানরা মারিয়াম পুত্রকে যেভাবে প্রশংসা করেছিল, আমাকে সেভাবে প্রশংসা করোনা, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর দাস। কাজেই বলো, আল্লাহর দাস এবং তাঁর রাসুল (সাঃ)’^{৫৪২}। এই হাদীস খৃষ্টানদের মত বাড়াবাড়িকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে {যেমন ঈসা (আঃ) এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল}, মহান আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সাঃ) কে যে তাঁর পয়গাম্ভার ও রাসুল এবং ভালোবাসার পাত্র মনোনীত করেছেন, এতেই সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে।

৫৩৯। সুবাহ্ আল-ইমরান (৩৫৩১)।

৫৪০। সহীহ মুসলিম।

৫৪১। মুসনাদ-ই-আহমাদ ও অন্যান্য।

৫৪২। সহীহ আল-বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং-৪৭৮।

আল্লাহ্ মিরাজ রজনীতে তাঁর রাসুল (সাঃ) কে সর্বোচ্চ আস্মানে আরোহণ করিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো অবলোকন করিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসুল (সাঃ) কে দাস (ইবাদাহ্ করী) সম্বোধন করে বলেছিলেন, “পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, মাস্জিদুল হারাম (কা’বা শরীফ) থেকে মাস্জিদুল আক্সায় (দূরবর্তী মাস্জিদ), যার পরিবেশ করেছিলেন আশীষপুত; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”^{৫৪৩}

আল্লাহ্ রাক্বুল আ’লামীন যেভাবে বলেছেন, অর্থাৎ, তিনি {রাসুল (সাঃ)} আল্লাহ্‌র দাস ও রাসুল; এবং এটাই তাঁর {রাসুল (সাঃ) এর} প্রশংসা করার সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ্‌র বলাটাই সর্বাঙ্গীন সঠিক এবং এতে সীমা অতিক্রম করার কোন উপাদানের উপস্থিতি নেই, বা তাঁর {রাসুল (সাঃ)} ন্যায় অধিকার এবং মর্যাদার কোন অবহেলা করা হয়নি।

যখন কিছু লোক আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) কে বললো, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ)! আপনি সর্বোত্তম এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং আমাদের প্রভু এবং আমাদের প্রভুর সন্তান’। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি {রাসুল (সাঃ)} বললেন, ‘হে লোক সকল! তোমাদের বক্তব্য সোজাসোজি বল, অবৈধ কথা বলে শয়তানকে প্রলোভিত করোনা। আমি শুধুমাত্র, আল্লাহ্‌র দাস এবং রাসুল। মহান আল্লাহ্‌ যেভাবে আমার প্রশংসা করেছেন, তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় উত্তোলন করা আমি পছন্দ করি না।’^{৫৪৪}

অন্য এক সময়, যখন ছোট মেয়েরা আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) গা’য়িব জানেন বলে গান গাইছিল, তখন রাসুল (সাঃ) তাদেরকে এরকম বলতে বাধা দিয়েছিলেন। রাবিয়াহ্‌ বিন্তে মুয়া’জ (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) আমার বিয়ের দিন সকাল বেলা আসলেন। আমার সাথে দুই দাসী বালিকা ছিল। তারা বদরের যুদ্ধে আমার যে আত্মীয়রা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে বিলাপ করে গান গাইছিলো। তার মাঝে তারা বলছিলো, ‘আমাদের মাঝে এক নাবী (সাঃ) আছেন, যিনি জানেন, কাল কি হবে।’ নাবী (সাঃ) তখন বলেছিলেন, ‘তোমরা কি বলছো? তোমরা এটা বলোনা! সর্বশক্তিমান ও মহামহিয়ান আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ বলতে পারে না, কাল কি হবে’।^{৫৪৫} সহীহ্‌ বুখারীর বর্ণনায় আছে, তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, ‘এটা বন্ধ কর, আগে যা বলছিলে, তাই বলো।’^{৫৪৬}

৫৪৩। সূরাহ্‌ আল-ইস্রা (১৭:১)।

৫৪৪। মুসনাদ-ই-আহমাদ ও আন-নাসা’ই।

৫৪৫। সুনা-ই-ইবনে মাজাহ্‌।

৫৪৬। সহীহ্‌ আল-বুখারী, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং-২০২।

ফাজায়েলে আ'মাল ও আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন

ফাজায়েলে আ'মালে অতি প্রশংসার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। 'ওয়াসীলা' অধ্যায়ে একজনের প্রয়োজনে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট অনুনয় করে চাওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা আগেই দেখেছি। ফাজায়েলে হাঙ্গে আরো একটা অতিরঞ্জিত বর্ণনা আমরা পেয়েছি, যেখানে মাওলানা যাকারিয়াহ বলেছেন, 'তঁার {রাসুল (সাঃ)} ক্বাবর পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে শ্রেষ্ঠ এবং যে জায়গা নাবী (সাঃ) এর দেহ মোবারকের সাথে মিলিত আছে, তা আল্লাহ পাকের আরশ থেকেও শ্রেষ্ঠ, কাবা থেকেও শ্রেষ্ঠ, কুরসী থেকেও শ্রেষ্ঠ, এমনকি, আস্মান-যমীনের মধ্যে অবস্থিত যে কোন স্থান হতে শ্রেষ্ঠ।'^{৫৪৭}

“এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামায পড়বে- এ তোমার জন্য অতিরিক্ত (নাফল) কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদে) অধিষ্ঠিত করবেন।”^{৫৪৮} মাওলানা যাকারিয়াহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ফাজায়েলে দরুদে বলেছেন, ‘আল্লাহ পাক কর্তৃক তাঁকে {নাবী (সাঃ)} রোজ কিয়ামত্য় আরশের উপর অথবা কুরসীর উপর বসানো হবে, এবং সম্ভাবনা আছে, আরশের কুরসীতে বসিয়ে শাফায়া'তের অনুমতি দেবেন এবং হাম্দের পতাকা নাবী (সাঃ) এর হাতে দেবেন’।^{৫৪৯}

মাকামে মাহমুদ (গৌরবান্বিত ও প্রশংসিত স্থান), যা আল্লাহ সুরাহ ইসরার ৭৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন^{৫৫০}, তার ব্যাখ্যায় উমার (রাঃ) বলেছেন, ‘হাশরের দিনে সমস্ত লোক নতজানু হয়ে যাবে, প্রত্যেক উম্মাহ তাদের নাবী (আঃ) কে বলবে, ‘হে অমুক! আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন, হে অমুক! আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন। শাফায়া'তের অনুমতি নাবী (সাঃ) কে দেয়া হবে এবং তাঁকে গৌরবান্বিত ও প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করা হবে’।^{৫৫১}

একটা বিবরণী পাওয়া গিয়েছিল যে, বাগদাদের এক গল্পকার সুরাহ ইসরার (১৭ঃ৭৯) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন যে, আল্লাহ নাবী (সাঃ) কে তাঁর (আল্লাহ) কুরসীর পাশেই বসাবেন। এই ব্যাখ্যা মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারীর (প্রখ্যাত মুফাস্সিফের কুর'আন, মৃত্যু-৩১০ হিঃ, ৯২২ খৃঃ) নিকট পৌঁছেছিল। তিনি এ ব্যাখ্যা প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং তাঁর (আত্-তাবারী) দরজায় লিখে দিয়েছিলেন, ‘আল্লাহ মহামহিমামণ্ডিত, তাঁর সমকক্ষ কেউ

৫৪৭। ফাজায়েলে-ই-আ'মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে-ই-হাঙ্গে, ৯ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ-১৪৩, নং ১৪ (১৯৮২ সনের নতুন সংস্করণ, দ্বিনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৫৪৮। সুরাহ ইসরা (১৭ঃ৭৯)।

৫৪৯। ফাজায়েলে-ই-আমাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েলে-ই-দরুদ, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৫৬, নং ১৪(১৯৮৫ সনের সংস্করণ, দ্বিনি বুক ডিপো দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৫৫০। সুরাহ ইসরা (১৭ঃ৭৯)।

৫৫১। সহীহ আল-বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং-২৪২।

নেই, তাঁর কুব্‌সীর পাশে বসার যোগ্যতাও কেউ রাখে না।' এতে বাগদাদের লোকেরা এত উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা পাথর ছুঁড়ে তাঁর (আত-তাবারী) দরজাটা সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছিল।^{৫৫২}

মাওলানা জামীর ক্বাসীদাহ্ ^{৫৫৩}

মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাজায়েল-ই-দারুদ ^{৫৫৪} বইতে বর্ণনা করেন, হযরত মাওলানা জামী (প্রখ্যাত সুফী সাধক) এর ক্বাসীদাহ্ ^{৫৫৫} ফার্সী ভাষায়। ক্বাসীদাহ্ সম্পর্কে তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'যখন মাওলানা জামী হাজ্জে যান, তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর ক্বাসীদাহ্ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর রওজা শরীফে গিয়ে আবৃত্তি করবেন। কিন্তু, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বপ্নে মক্কার শাসককে বললেন, 'তাকে (মাওলানা জামী) মদীনা যেতে দিও না।' মক্কার শাসক মাওলানা জামীকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু, মাওলানা জামী গোপনে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) আবার স্বপ্নে মক্কার শাসনকর্তাকে বললেন, 'সে মদীনার দিকে যাত্রা করেছে, তাকে মদীনা যেতে দিও না।' এরপর মাওলানা জামীকে ফিরিয়ে আনা হলো এবং কারাগারে আবদ্ধ করা হলো। পুনরায়, আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) স্বপ্নে মক্কার শাসনকর্তাকে বললেন, 'সে তো অপরাধী নয়, সে আমার উদ্দেশ্যে কিছু ছন্দ রচনা করেছে এবং তা আমার ক্বাবর শরীফে আবৃত্তি করতে চাচ্ছে। সে যদি ঐগুলি সেখানে আবৃত্তি করে, তবে, মোসাফাহা করার জন্য আমার হাত বের করতে হবে, তাতে লোকের মনে ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হবে।' মাওলানা যাকারিয়াহ্ বলেন, 'হযরত মাওলানা জামীর ক্বাসীদাহ্ ফার্সী ভাষায়। আমাদের মাদ্রাসার নাজিম মাওলানা আসাদুল্লাহ্‌র ফার্সীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে, বিশেষ করে ফার্সী কবিতায়। তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর প্রথম শ্রেণীর খলীফাদের একজন।' মাওলানা জামীর মাস্‌নাবী মাওলানা আসাদুল্লাহ্

৫৫২। তাহবীর আল-খাওয়াছ মিন আহাদীস-আল-ক্বাসাস (পৃষ্ঠা: ১৬১, জালাল উদ্দীন সুয়ুতী সংকলিত (বৈরুত-১৯৭২)), দেখুন সুন্নান-ই-ইবন মাজাহ (পৃষ্ঠা-৪০) এর উদ্ধৃতিতে 'মুসলিমদের মাঝে হাদীসের সমালোচনা'।

৫৫৩। আবদুর রাহমান জামী (মৃত্যু-৮৯৮ হিঃ/১৪৯২ খৃঃ), একজন আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও কবি। তিনি খুরাসানের জাম-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনেক কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও জামী ইব্নী আরাবীর ফুসুস-ই-হিকামের ব্যাখ্যামূলক এক খানা বড় গ্রন্থ, নাকদ আন-নুসুস নামে এক খানা ছোট বই, ওয়াহিদাহ্ আল-ওজুদ মতবাদের বুনয়াদী শিক্ষার উন্মোচন; লাওইয়ীহ্- আংশিক গদ্যাকারে এবং আংশিক পদ্যাকারে, ধর্মতত্ত্ব, হযরত সুফীর জীবন পরিচিতি ও শিক্ষা, নাকাহাত-ই-উনস লিখেন। তার কবিতার জন্য দেখুনঃ এ, যে, আরবেরীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্সী সাহিত্য (এলেন এণ্ড আন উইন, লন্ডন, ১৯৫৮) পৃঃ-৪২৫-৪৫০ সুফীবাদ ও শরীয়াহ্, পৃঃ ১৪৯।

৫৫৪। ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েল-ই-দারুদ (পবিত্র নাবী সাঃ এর নামে আরবী ক্বাসীদাহ্), পৃঃ ১৫৭, (১৯৮৫ সনের সংস্করণ, দ্বীন বুক ডিশো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৫৫৫। 'ক্বাসীদাহ্', উচ্ছসিত প্রশংসা, অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির প্রশংসাসূচক বক্তৃতা বা লিখন; বিশেষভাবে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য প্রশংসা বাক্য। [The World Book Dictionary]

ভাষান্তর করেছেন, তার কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।^{৫৫৬}
 হে মনোমুগ্ধকর পুষ্প! তোমার সুগন্ধ দানে উল্লসিত কর মোদের,
 সুখ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠ তুমি, আলোকিত কর হৃদয় মোদের।
 হে আল্লাহর প্রত্যাदिষ্ট মানব! সবুজ গম্বুজ ছেড়ে এস বাহিরে বেড়িয়ে,
 তব পদযুগল দিয়ে হেঁটে বেড়াও মোদের শিরোপরি দিয়ে।
 হে প্রত্যাदिষ্ট মানব! সহায় হও মোদের, মোরা তব প্রতি বিনয়ান্বিত;
 মোরা অসহায় প্রেমিক তোমার, অন্তর মোদের ভরে দাও তব শান্তনা বাণীতে,
 কত ভাগ্যবান মোরা, এসেছি তব যিয়ারাহুয়, চোখের সুরমা করেছি
 এই মদীনার ধূলিকণা। কত ভাগ্যবান মোরা, তাওয়াফ করেছি
 ক্বাবর আর সবুজ গম্বুজ তোমার; পাগলের প্রায় কেঁদেছি মর্ম বেদনায়।
 যদি ও ধূলিকণা চোখের ক্ষতিকারী, (পবিত্রতার জন্য) তা দিয়ে চোখের
 মলম বানাবার ইচ্ছা করি। অপরিমিত ক্ষুধায় ক্রান্ত আমি,
 হে রাসুল খোদার! সদয় হোন, ক্ষমাশীল হোন এ বিনীত দাসের পরে,
 ক্ষতিগ্রস্ত হবো মোরা, যদি না করেন দয়া এই অসহায় অভাগাদেরে।

দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ক্বাসিম নানোত্ভী থেকে আরো কিছু পদ্যাংশ^{৫৫৭}

যদি তুমি (আল্লাহ), না সৃজিতে তাঁরে {রাসুল (সাঃ)}, না সৃজিতে এ বিশ্বলোক,
 হে বিশ্বভুবনের নেতা {রাসুল (সাঃ)}! নিবেদন করিবো তব সকাশে
 যদি সহায় হয় জিব্রাইল।

সারা জাহান অস্তিত্বে আছে শুধু তোমারই তরে।

হে রাসুল আল্লাহর! যদি কেউ বলে বিশ্বলোকের কেন্দ্র তুমি, তবে সে ঠিক;
 কিছু নেই, থেকে এসেছে বিশ্বজাহান, সে তো তোমারই তরে,

হে রাসুল আল্লাহর! তুমি হয়েছে আলোসম দ্রুত।

নাবী মুসার আশা ছিলো আল্লাহকে দেখার, আল্লাহর ইচ্ছা তোমায় দেখার।

(নিজেকে সম্বোধন করে মাওলানা ক্বাসিম বলেন--)

ক্বাসিম পাপী, পক্ষিল আর কলঙ্কিত, তোমার ভক্ত হবার আশায় সে গর্বিত;

সে বসে আছে তোমারই আশায়,

তুমি পাপীদের শাফায়াতকারী, একথা শুনে আমি, সংগ্রহ করেছি অগণিত

পাপ (যাতে এগুলো পূণ্য হিসেবে গণ্য হয়),

৫৫৬। ফাজায়েল-ই-আমাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েল-ই-দরদ {পবিত্র নাবী (সাঃ) এর নামে আরবী ক্বাসিদাহ} পৃঃ ১৫৭, পংক্তি নং ৩, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৯, ২৫ ও ২৬।

৫৫৭। ফাজায়েল-ই-আমাল (ইং অনুঃ), ফাজায়েল-ই-দরদ {পবিত্র নাবী (সাঃ) এর নামে আরবী ক্বাসিদাহ}, পৃঃ ১৬০ (১৯৮৫ সনের সংস্করণ, বীনি বুক ডিশো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

সর্ব শক্তিমান আল্লাহ, তোমার প্রার্থনার এতই মূল্য দেন যে, স্থিরীকৃত নিয়তিও বদলে দেন তোমার প্রার্থনায়।

অগণিত পাপের জন্য কুকুরও আমার নাম শুনে অবজ্ঞা করে।

কিন্তু, আমি তোমার নামে ও তোমার সাথে আমার সম্পর্কের জন্য গর্ব বোধ করি; তুমি যদি আমাদের প্রতি যত্নশীল না হও, আর কেউ এমন নেই, যে আমাদের প্রতি যত্নশীল ও দয়াদ্র হবেন।

আমার আশার তরী ঘিরে ফেলেছে, ভীতির তরঙ্গে আর সাহসিকতায়;

মনের আশা, মদীনার (রাস্তায়) কুকুরের তালিকায় আমার নাম লিখা হবে।

আমি আশাবিস্তৃত যে, তোমার হারামের কুকুরদের সাথে আমি বেঁচে থাকবো,

এবং যখন মারা যাবো, মদীনার শকুনেরা যেন আমার দেহ ভক্ষণ করে।

এই ক্বাসীদাহুয় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর মিথ্যা প্রশংসা করা হয়েছে। যা বলা হয়েছে, তা আল্লাহও বলতে বলেননি, বা তিনি {রাসুল (সাঃ)} ও নিজেকে ঐভাবে বর্ণনা করেননি। এতে এমন সব গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, যা শুধু একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহ ওয়াতাতালালার জন্যই প্রযোজ্য, কোন সৃষ্টির জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়। যেমন, “সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তোমার প্রার্থনার এতই মূল্য দেন যে, স্থিরীকৃত নিয়তিও বদলে দেন তোমার প্রার্থনায়”।

“নিঃসন্দেহে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।”^{৫৫৮} যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একটা কাজ করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁকে ‘ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চাহেন)’ বলতে আদেশ করা হয়েছিল; আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ ইচ্ছা করলে- একথা না বলে কখনোই তুমি কোন বিষয়ে বলো না, ‘আমি এটি আগামীকাল করবো।’”^{৫৫৯}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে কেউ যদি বলতো, ‘যদি আল্লাহ এবং আপনি ইচ্ছা করেন’- তিনি তাকে তিরস্কার করতেন। রাসুল (সাঃ) বলতেন, ‘তোমরা কি আল্লাহ এবং আমাকে সমান করলে? বরং (তোমাদের বলা উচিত), ‘যদি আল্লাহ একাই ইচ্ছা করেন।’^{৫৬০}

ফাজায়েল-ই আ‘মালে যে সকল ক্বাসীদাহ্ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে আল্লাহর হাক্ব এবং রাসুল (সাঃ) এর হাক্বের কোন পার্থক্য নেই। ইবাদাহ্ পাওয়া শুধু আল্লাহর হাক্ব; সাহায্য কামনা, দোওয়া, আশা করা, তওয়াফ করা, শাফায়াত কামনা করা, ইত্যাদি, এর অন্তর্ভুক্ত। মাওলানা জামী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ক্বাসিম নানোতভী তাঁদের দ্বিপদি শ্লোকের সকল ইবাদাহ্গুলো আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপর আরোপ

৫৫৮। সূরাহু আল-হাজ্জ (২২ঃ১৪)।

৫৫৯। সূরাহু আল-কাহ্ফ (১৮ঃ২৩-২৪)।

৫৬০। আল মুস্নাদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-২৫৩।

করেছেন, যা পরিস্কার শিরক।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আক্বীদাহ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। শিরকযুক্ত কোন কথা বললে, তিনি তা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিতেন। একদা, এক সাহাবী তাঁকে উদ্বেগ্য করে বললেন, ‘আপনি আমাদের মনিব।’ তিনি বললেন, ‘মনিব হলেন করুণাময়, মহামহিমামণ্ডিত আল্লাহ।’ যখন তাঁরা (সাহাবীগণ) তাঁর {রাসুল (সাঃ)} গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন, ‘আপনি আমাদের মাঝে সর্বোত্তম ও দয়ালু’। রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘তোমরা কি বলতে এসেছো, বল, তোমরা নিজেদেরকে শয়তানের অনুসরণ করার এবং অতি-বিশ্বাসী কথা বলার সুযোগ করে দিওনা।’^{৫৬১}

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি। এরপরও, তিনি সাহাবীগণকে ‘আপনি আমাদের মনিব’, ‘আমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম, ইত্যাদি, কথাগুলো বলতে নিষেধ করেছিলেন। এটা করেছিলেন, শুধু মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা থেকে সাহাবীগণকে বিরত রাখতে এবং তাওহীদ (আল্লাহর এককত্ব) রক্ষার নিমিত্তে। আল্লাহর বান্দাহরা সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ যে মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন, রাসুল (সাঃ) সাহাবীগণকে সেই দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নামে সম্বোধন করতে বলেছেন। তিনি (সাঃ) বলেন, ‘নিঃসন্দেহে, আমি আল্লাহর দাস, অতএব, বলবে, আল্লাহর দাস এবং তাঁর (আল্লাহ) রাসুল (সাঃ)।’^{৫৬২} এ পদমর্যাদা দুটি তাঁর (সাঃ) প্রতি বাড়াবাড়িও নয় এবং আক্বীদাহর পরিপন্থীও নয়।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট সাহায্য ও দোওয়া চাওয়া

মাওলানা জামীর ক্বাসীদাহয় বলা হয়েছে, ‘হে আল্লাহর পয়গাম্ভার! আমরা আপনার অনুগত ও অসহায়, তাই আপনার প্রেমিকদেরকে সাহায্য করে হৃদয়ে প্রশান্তি দান করুন’। কিন্তু, মহিমামণ্ডিত আল্লাহ কুর’আনে বলেন, “অথবা তিনি আত্মের আব্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে; এবং বিপদাপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো।”^{৫৬৩}

উপরে উদ্ধৃত ক্বাসীদাহ, পরিস্কার আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট বিনীত প্রার্থনা করা, যা প্রকৃতপক্ষে শিরক। আল্লাহ, সাহাবীগণকে বলার জন্য রাসুল (সাঃ) কে আদেশ করেছেন, “হে মুহাম্মাদ! বল, আল্লাহ যা ইচ্ছে, তাই করেন; তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপর আমার কোন অধিকার নেই।”^{৫৬৪}

৫৬১। আবু দাউদ।

৫৬২। সহীহ আল-বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং-৪৭৮।

৫৬৩। সূরাহ আন-নামল (২৭ : ৬২)।

৫৬৪। সূরাহ আল-আরাফ (৭ : ১৮৮)।

তিব্রানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসুল (সাঃ) এর সময় এক মুনাফিক ছিল, যে বিশ্বাসীদের অনিষ্ট করতো। তাদের কিছুলোক বললো, ‘চলো আমরা আল্লাহর রাসুল (সাঃ)এর নিকট গিয়ে এই মুনাফিকের বিরুদ্ধে সাহায্য চাই।’ রাসুল (সাঃ) এর উত্তরে বলেছিলেন, ‘অবশ্যই, কেউ আমার কাছে সাহায্য চাইবেনা। শুধুই ‘আল্লাহ’, যার নিকট সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য প্রার্থনা করতে হবে।’ রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন, ‘ইবাদাহতে যদি কিছু চাও, শুধু আল্লাহর কাছেই চাও, আর যদি সাহায্য চাও, সেটাও শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও।’^{৫৬৫}

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট সুপারিশ (শাফায়াত) প্রার্থনা করা

যদিও আল্লাহ শেষ বিচার দিনে তাঁর রাসুল (সাঃ) কে উম্মাহর সুপারিশ করার সুযোগ দিয়েছেন, তারপরও সুপারিশের জন্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর নিকটই করতে হবে। আল্লাহ কুর’আনে বলেন, “বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর, তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে”^{৫৬৬}

আল্লাহ আরো বলেন, “কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?”^{৫৬৭}

শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, “যখন তাঁর রাসুল (সাঃ) সুপারিশ করবেন..... তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। তাঁরা, সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সম্বস্ত।”^{৫৬৮}

যখন এই আয়াত “তোমার স্বজনবর্গকে সতর্ক করে দাও”^{৫৬৯} নাযিল হলো, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘হে কুরাইশগণ! আল্লাহর শান্তি থেকে মুক্তির পথ সুনিশ্চিত করার চেষ্টা কর (সৎকার্যাবলীর মাধ্যমে), কারণ, আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না।.... হে ফাতিমা! মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কন্যা, ইহজগতে আমার সম্পদ থেকে তুমি যা ইচ্ছে চাইতে পারো, কিন্তু, আল্লাহর সম্মুখে আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবোনা (শেষ বিচার দিনে)’^{৫৭০}

৫৬৫। তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত, সহীহ্ সুনানে আত্-তিরমিযী (২য় খণ্ড, হাদীস নং-২০৪৩), মিশ্কাত আল-মাসাবিহ (২য় খণ্ড, হাদীস নং-১০৯৯)।

৫৬৬। সূরাহ্ আয-যুমার (৩৯ : ৪৪)।

৫৬৭। সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ (২ : ২৫৫)।

৫৬৮। সূরাহ্ আযিয়াহ্ (২১ : ২৮)।

৫৬৯। সূরাহ্ আশ-শূরা’রা (২৬ : ২১৪)।

৫৭০। সহীহ্ আল-বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৭২৭-৭২৮ এবং সহীহ্ মুসলিম, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৪০২।

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) নাবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার শাফায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে কে সব চাইতে বেশী সুখী (সৌভাগ্যবান) হবে?’ তিনি (সাঃ) বললেন, ‘যে সুগভীর আন্তরিকতায় বিশ্বাস চিন্তে (ইখলাসের সাথে) ক্বাল্ব থেকে বলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’। সুতরাং, যদি আল্লাহ্ চান, এই শাফায়াত অবশ্যই, ঐ অত্যন্ত আন্তরিক বিশ্বাস-চিন্তা লোকদের জন্য। কিছুতেই, শির্ককারীদের জন্য নয়। আর, যে কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে সুপারিশ চায়, সে শির্ক এ লিপ্ত। পরিনামে, শাফায়াত লাভের অযোগ্য সম্পূর্ণরূপে।

ভ্রান্ত বিশ্বাস

এই ক্বাসীদাহ্ আর একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রচারণা করে যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসুল (সাঃ) কে সৃষ্টি করবেন বলেই, এই জগৎসমূহ এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। যেমন, ক্বাসীদাহ্য় বলা হয়েছে, ‘সারা বিশ্ব-জাহানের অস্তিত্ব টিকে আছে শুধু তোমারই জন্য..... কোন কিছু ছিল না, এ অবস্থা থেকে সারা বিশ্ব-জাহানের আবির্ভাব হয়েছে, শুধু তোমারই জন্য।’ এ ধারণার জন্ম হয়েছে একটা জাল হাদীস থেকে^{৫৭১}, এবং এটি কুর’আনের একটি আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আল্লাহ্ বলেন, “শুধু আমার দাসত্বের জন্যই আমি মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি।”^{৫৭২, ৫৭২ক, ৫৭২খ} অতএব, আল্লাহ্র মানুষ ও জ্বিন জাতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে, তারা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাহ্ করবে।

ক্বাসীদাহ্ সম্পর্কে মাওলানা যাকারিয়াহ্ তার উল্লেখিত কাহিনীতে যা বলেছেন, উপরোল্লিখিত প্রতিবাদ যিনি বুঝার চেষ্টা করবেন, তিনি এই কাহিনীর মিথ্যা বর্ণনা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ), যিনি সারা জীবন মানুষকে তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ্র নিকট দোওয়া করেছেন, যেন পূজা থেকে তাঁর ক্বাব্রকে রক্ষা করা হয়। তিনিই কিনা মাওলানা জামীর সাথে মুসাফাহা করার জন্য ক্বাব্র থেকে হাত বের করে দেবেন, এটা হতেই পারেনা। আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার ক্বাব্রকে পূজার স্থান হতে দিও না, যারা তাদের নাবীদের ক্বাব্রকে

৫৭১। সিদ্দিসিলাহ্ আহাদীস আয-যরীফাহ্, হাদীস নং-২৮২, শাইখ্ আলবানী কর্তৃক প্রণীত।

৫৭২। সূরাহ্ আয-যারীয়াহ্ (৫১ : ৫৬)।

৫৭২ক। আর তিনি যমীনকে বিছিরেছেন / সৃষ্টিছেন / স্থাপন করেছেন সকল সৃষ্ট জীবের জন্য।” [(সূরাহ্ আয-রাহমান (৫৫:১০)- অনুবাদকের সংযোজন)।

৫৭২খ। তিনি (আল্লাহ্) পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য।” [(০২:২৯) (অনুবাদের সংযোজন)।

ইবাদাহুতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।^{৫৭৩} রাসুল (সাঃ) জীবিতাবস্থায় যে কাজের ভয় করতেন, ধর্ম-বিরোধীদের সেই কাজকে তিনি কখনই কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করতে পারেননা; আর হাত বের করে মোসাফাহা করারতো কোন প্রশ্নই আসে না। বরঞ্চ, এইসব লোকদেরকে তিনি লা'নাত করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে আর একটি লজ্জাস্কর অপবাদ

ফাজায়েল-ই-আ'মালে আর একটি এমন লজ্জাজনক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা লিখতেও বিব্রতবোধ করছি; কিন্তু, বাধ্য হয়ে (ঈমানী দায়িত্ব বোধে) লিখতে হচ্ছে, যাতে, মানুষ দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পেতে পারে। মাওলানা যাকারিয়াহু ফাজায়েল-ই-দরুদে বর্ণনা করেছেন, 'এক বালক প্রতি পদক্ষেপেই পড়ছিলো, 'আল্লাহুমা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিন অলা আলে মুহাম্মাদিন'। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, এরকম ভাবে দরুদ পড়ার কারণ কি? সে বললো, 'একবার আমি আমার মায়ের সাথে হাজ্জে গিয়েছিলাম। পথে আমার মা মারা যান, তাঁর মুখ কালো হয়ে যায় এবং পেট ফুলে যায়। মনে হলো, সে অনেক বড় পাপ করেছে। তখন আমি আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দোওয়া করলাম। এসময় হিজাজের দিক থেকে একখন্ড মেঘ উড়ে আসলো এবং তা থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে আমার মায়ের মুখে হাত বুলালেন, আর অমনি তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেলো এবং পেটে হাত বুলালেন, পেটের ফুলাও চলে গেলো। আমি আরজ করলাম, 'আপনার ওয়াসীলায় আমার মায়ের বিপদ কেটে গেলো, আপনি কে?' তিনি বললেন, 'আমি তোমার নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)'। আমি (বালক) নাবী (সাঃ) এর নিকট আরজ করলাম, 'আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।' নাবী (সাঃ) বললেন, 'যখন কদম উঠাবে এবং রাখবে, তখনই পড়বে, 'আল্লাহুমা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন অলা আলে মুহাম্মাদিন'।^{৫৭৪}

আমরা জানি, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) মহান, পূত-পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি সারা জীবনে কখনও গায়ের মাহুরাম মহিলাদের দেহ স্পর্শ করেননি। তিনি যখন মহিলাদের থেকে শপথ নিতেন, শুধু মৌখিকভাবেই নিতেন।

৫৭৩। ইমাম আহমাদ কর্তৃক সংগৃহীত (২য় খন্ড, হাদীস নং-২৪৬), তাবাক্বাত্-ই-ইব্ন সা'দ (২য় খন্ড, হাদীস নং-৩৬২) এবং আল-হিলিয়াহুয় আবু নাসীম (৭ম খন্ড, হাদীস নং-৩১৭)।

৫৭৪। ফাজায়েল-ই-আ'মাল (বাংলা অনুবাদ), ফাজায়েল-ই-দরুদ খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-তাবলীগী কুতুব খানা, চকবাজার, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশিত।

উরওয়াহ্ বলেন, আয়িশা (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, “রাসুল (সাঃ) মহিলাদের থেকেও শপথ গ্রহণ করতেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কখনও গায়ের মাহরাম মহিলাদেরকে স্পর্শ করতেননা। তিনি শুধু তাদের থেকে মৌখিক শপথ গ্রহণ করতেন এবং বলতেন, ‘তোমরা যাও, আমি তোমাদের শপথ গ্রহণ করলাম’।”^{৫৭৫} আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) এর উপর অপবাদ দেয়া ও মিথ্যা আরোপ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

উপসংহার :

আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) এর প্রশংসা করতে হবে সেইভাবে, যেভাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসুল (সাঃ) এর প্রশংসা করেছেন, এবং যতটুকু মর্যাদাসম্পন্ন প্রশংসা আল্লাহ্ তাঁর (সাঃ) জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা’য়ালা কুর’আনে বলেন, “আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্তাগণ নাবী (সাঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর (সাঃ) প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাও।”^{৫৭৬} নিশ্চয়ই, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) উচ্চ প্রশংসিত মর্যাদার অধিকারী এবং সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্ রাব্বুল আ’লামিন তাঁকে নাবী রূপে পছন্দ করেছেন এবং তাঁকে মাকাম-ই-মাহমুদ (উচ্চতম প্রশংসিত স্থান) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আদেশ অমান্য ও অবজ্ঞা করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ হীনমন্যতা এবং অবমাননা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) কে শ্রদ্ধা করার অর্থ, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। কিন্তু, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি, মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করে।

৫৭৫। সহীহ্ আল-বুখারী (ইং অনুঃ), ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯, হাদীস নং-২১১, সহীহ্ মুসলিম (ইং অনুঃ), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৩৯, হাদীস নং-৪৬০৩, সুনান-ই-ইব্ন মাজাহ্ (জিহাদ) এবং মুসনাদ-ই-ইমাম আহমাদ।
 ৫৭৬। সূরাহ্ আল-আহযাব (৩৩ : ৫৬)।

একাদশ অধ্যায়

সুফী শাইখগণের অন্ধ অনুসরণ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো দেওবন্দিগণ পীর অথবা শাইখগণকে কি রকম গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আমরা দেখবো, কিভাবে তাঁরা তাদের শাইখগণকে নিরঙ্কুশ শর্তবিহীন আনুগত্য প্রদান করেন। তাঁরা ভয় পান যে, কেউ যদি শাইখের আনুগত্য না করে, বা কারো শাইখ না থাকে, তবে সে বিপথগামী হবে। পরিশেষে, তাঁরা মুরীদের সাহায্যার্থে শাইখের নৈপুণ্যের অতিরঞ্জন করেন।

বাইয়াহু, দেওবন্দি আলিমগণ এবং তাবলীগ জামা'আত :

মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, ‘বছরের পর বছর ধরে মাযাহিরুল উলুম ও দারুল উলুম দেওবন্দের মুরুব্বীদের জীবনে তাসাউফ (আধ্যাত্মবাদ) এবং জিগরী-খুন নির্যাসের মত স্থায়ী হয়ে রয়েছে। আমি মনে করি না, এই দুই জায়গার মুরুব্বীদের এমন কেউ আছেন, যে কোন শাইখের নিকট বাইয়াহু (আধ্যাত্মিক গুরুর হাতে শপথ) গ্রহণ করেননি। তাছাড়া, আপনি এমন কাউকে পাবেননা, যে যিক্র অনুশীলন না করে’।^{৫৭৭}

জামা'য়াত-ই-তাবলীগের প্রধান কার্যালয়, হযরত নিজাম উদ্দিন, দিল্লী, ভারত অথবা রাওয়ালপিণ্ডি, পাকিস্তানে জামা'য়াত-ই-তাবলীগের সকল নিয়মিত কর্মীরা বাইয়াহু গ্রহণ করেন। জামা'য়াত-ই-তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস যদিও মৃত, কিন্তু, তাঁর পক্ষ থেকে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত আমীর জামা'য়াত-ই-তাবলীগের কর্মীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে থাকেন। ভূতপূর্ব আমীর মাওলানা ইনামুল হাসানের কর্তৃত্বের রেকর্ড থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।^{৫৭৮}

সুফীবাদে একজন শাইখ থাকার প্রয়োজনীয়তা :

সুফীগণ একজন শাইখ বা আধ্যাত্মিক গুরু নিযুক্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। যেমন ইরশাদুল মূল্কে উদ্ধৃত করা হয়েছে, “প্রকৃতপক্ষে দলের মধ্যে একজন শাইখ, একটি জাতির মাঝে নাবীর অনুরূপ।”^{৫৭৯} “শাইখ প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজন, এটা ফারজ।”^{৫৮০} “যার কোন পীর (শাইখ) নেই, শয়তান তার পীর।”^{৫৮১}

৫৭৭। আ'প বেতি (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২৫৭।

৫৭৮। অডিও টেপের জন্য <http://www.ahya.org> গুয়েব-সাইট দেখুন।

৫৭৯। ইরশাদুল মূল্ক (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-৪৬।

৫৮০। আদাবুল মুয়া'শারাত (সামাজিক জীবনের শিষ্টাচার), মাওলানা আশরাফ আলী খানভী লিখিত (ইং অনুঃ), শাইখের প্রতি আদাব অধ্যায়, পৃঃ ৮৯-৯০।

৫৮১। ইরশাদুল মূল্ক (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৭২।

শাইখের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য তারা কিছু সংখ্যক নীতি এবং আইন উদ্ভাবন করেছেন। অনুসারীগণকে মুরীদ বলা হয়, তাদেরকে (মুরীদ) শাইখের হাতে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াহ) গ্রহণ করতে হয় এবং শাইখকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হয়।

শাইখবিহীন লোক বিপথে পরিচালিত হয় :

আব্বাহর রাসুল (সাঃ) বিদায় হাজ্জে লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে দু’টি জিনিস রেখে গেলাম, যা আঁকড়িয়ে ধরে থাকলে, তোমরা কখনও বিপথগামী হবে না; তা হচ্ছে— আব্বাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ।”^{৫৮২}

আশরাফ আলী খানভী বলেছেন, “দু’টি জিনিস অত্যন্ত উপকারী, কেউ যদি এদু’টি জিনিস পালন করতে পারে, সে কখনও বিপথগামী হবে না। প্রথম— নিজের মতামতকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে (নিজের মতামতকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, শাইখ যা বলবেন, তাই করতে হবে)। দ্বিতীয়— ফলাফলের প্রতি আশাবাদী না হয়ে শাইখ যা বলবেন, সেই ভাবে কাজ করে যেতে হবে”।^{৫৮৩}

শাইখ না থাকার কারণেই কাদিয়ানী দাজ্জালরা পথভ্রষ্ট :

রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর জীবন চরিত গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, “মির্য়া গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যে সময়ে তার বই ‘বারহি’ লিখেছিলেন, খবরের কাগজগুলো তার সুনাম প্রচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো। সে সময়ে গোলাম আহমাদ, হযরত (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) কে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। এমন কি, যারা তাঁর (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) দর্শন করে ফেরত আসতো, তাদেরকে সে (গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী) জিজ্ঞেস করতো, “মাওলানা ভালো আছেন তো”? সে আরো জিজ্ঞেস করতো, “গাঙ্গোহা থেকে দিল্লীর দূরত্ব কত? রাস্তা কেমন?” এতে মনে হয়, তার হযরতের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল। সে সময়ে ইমাম রাব্বানী (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) বলেছিলেন, “এই লোক (মির্য়া গোলাম আহমাদ) যে কাজ করছে, তা ভালো, কিন্তু, তার একজন পীরের (আধ্যাত্মিক গুরু) প্রয়োজন, না হলে হয়তো, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।”^{৫৮৪}

৫৮২। আল-হাকিম (১ম খন্ড, পৃ-৯৩), বাইহাক্বী (১০ম খন্ড, পৃঃ-১১৪) এবং ইবন হায়ম আল-আহকাম (৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ-১০৮)।

৫৮৩। মালফুয়াত (আশরাফ আলী খানভীর বক্তৃতা ও বিবৃতি), পৃঃ-৪১।

৫৮৪। তায়কিরাত আর-রাশীদ (আশিক ইলাহী মারাগী লিখিত রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর জীবন চরিত), ২য় খন্ড, পৃঃ-২২৮। আশিক ইলাহী মারাগী লিখিত ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ), পৃঃ-৪৯।

শাইখ ও মুরীদের মাঝে বিশেষ বন্ধন :

রাশীদ আহমাদ গাজোহী, তাঁর এবং তাঁর শাইখের মাঝের বিশেষ বন্ধন এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, “আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম, মৌলভী মুহাম্মাদ ক্বাসিম সাহিব বর বেশে, এবং আমি তাঁকে মাত্রই বিবাহ করেছি। সুতরাং, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সুযোগ-সুবিধা দেখাই কর্তব্য, আমি তাঁর থেকে উপকার পেয়েছি, আর তিনিও আমার থেকে উপকার পেয়েছেন।” এ ব্যাপারে হাকিম মুহাম্মাদ সিদ্দিক সাহেব কান্দাহলভী বলেছেন, “আর-রিজালু ক্বাওয়ামুনা আ’লান্নিছা” (পুরুষ, স্ত্রীলোকদের রক্ষক এবং ভরন-পোষণ দাতা)। সূরাহ্ আন-নিসা (৪ঃ ৩৪)। রাশীদ আহমাদ আরো বলেছিলেন, “মোটকথা, আমি তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরকে প্রশিক্ষণ দান করি।”^{৫৮৫}

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী বলেন, “রুহানী (আধ্যাত্মিক) প্রশিক্ষণের পরিসরে শাইখ জড়িত, এবং বৈষয়িক বিষয়ে পিতা প্রশিক্ষণ দানের সময় যেমন স্নেহভরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, তাঁর (শাইখের) স্নেহ সে রকমই। সত্যি বলতে কি, আধ্যাত্মিক গুরু পিতার চেয়েও অধিক স্নেহ করেন। আধ্যাত্মিক গুরু যা করেন, পিতা তা করতে সমর্থ নন। তিনি (আধ্যাত্মিক গুরু) মানুষের আত্মাকে (রুহ) আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করে দেন। তিনি একজন মানুষকে আ’রিফ (যে অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী) এবং ওয়াসীলে (যে স্বর্গীয় লক্ষ্য অর্জন করেছে) পরিবর্তিত করে। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের এই পবিত্র প্রক্রিয়ায় যত গভীর মেলা-মেশাই থাক না কেন, দু’পক্ষ (শাইখ ও মুরীদ) এর জন্য তা কখনই যথেষ্ট নয়।”^{৫৮৬}

শাইখের প্রতি পরিপূর্ণ নিঃশর্ত আনুগত্য :

ইরশাদুল মূলক এ ‘শাইখের প্রতি আনুগত্য’ এই শিরোনামে বর্ণিত, “শাইখ যা কিছু করেন এবং আদেশ করেন, মুরীদ সেগুলোতে কোন আপত্তি করবে না, কারণ, শাইখের প্রতিটি আদেশ-উপদেশ তার জন্য অবশ্য পালনীয়।”^{৫৮৭}

“মুরীদ বিনয়, সম্মান ও সন্তানের সাথে তার পারদর্শী শাইখের প্রতি অনুগত থাকবে, যেমন, মাইয়েত (মৃত ব্যক্তি) গোসল দাতার হাতে চুপচাপ থাকে।”^{৫৮৮}

“তোমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা নির্মূল করে দাও। শাইখের নিকট নিজেকে

৫৮৫। তাক্বিরাতু-রাশীদ (আলিক ইলাহী মারাঠী লিখিত রাশীদ আহমাদ গাজোহীর জীবন চরিত), ২য় খণ্ড, পৃঃ-২৮৯।

৫৮৬। আদাবুল মুয়াশারাত (সামাজিক জীবনের শিষ্টাচার), মাওলানা আশরাফ আলী খানভী লিখিত (ইংরেজী অনুবাদ), শাইখের প্রতি আদাব অধ্যায়, পৃঃ ৮৯-৯০।

৫৮৭। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ) পৃষ্ঠা-৫৮।

৫৮৮। ইরশাদুল মূলক (ইংরেজী অনুবাদ) পৃষ্ঠা-৯৬।

পরিপূর্ণভাবে সোপর্দ করে দাও। শাইখের তা'লিম (শিক্ষা) এর প্রতি সামান্যতম আপত্তিও উত্থাপন করোনা।”^{৫৮৯}

আশিক ইলাহী মারাঠী লিখেছেন, “একদা একজন সাধারণ লোক বায়াজিদ বোস্তামী (রঃ) কে প্রশ্ন করলো, ‘একজন পীর (শাইখ) কেমন হবে, এবং মুরীদের কেমন হওয়া উচিত?’ বায়াজিদ বোস্তামী বললেন, ‘তুমি আগামীকাল আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে বলবো’। পরদিন যখন লোকটি এলো, তিনি তাকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, ‘এ চিঠিটি নিয়ে প্রাপকের কাছে যাও, ফিরে এলে তুমি উত্তর পাবে।’ যে লোকটির নিকট পত্র লিখা হয়েছিল, সে ত্রিশ দিনের দূরত্বে একজন দাড়ি বিহীন সুন্দর বালককে নিয়ে থাকতো। বায়াজিদ বোস্তামী আমন্ত্রণকারীকে বলে দিয়েছিল, যাতে অত্যন্ত ভালোভাবে আদর-যত্ন করা হয়, থাকার জন্য আলাদা ঘর দেয়া হয় এবং বালকটি যেন সমস্ত কাজ কর্ম করে দেয়। যদি লোকটি পাপকার্যেও লিপ্ত হয়, তবু যেন বালকটি অবাধ্য না হয়। ত্রিশ দিন পর অতিথি পৌঁছে চিঠিটি হস্তান্তর করলো। যে লোকের নিকট চিঠি লিখা হয়েছিল, সে চিঠির ভাষা অনুসারে সব বন্দোবস্ত করে দিল। অতিথি এবং বালকটি নির্জনে ছিল, এমতাবস্থায় অতিথির মনে অনৈতিক চিন্তা জাগরিত হলো। সে পাপকাজের ইচ্ছা করলো। তৎক্ষণাৎ মনে হলো, যেন বায়াজিদ বোস্তামীর হাত তাকে (অতিথি) আঘাত করলো। অতিথি পাপ কাজ থেকে বিরত হলো এবং অনুতপ্ত হলো। পরের দিনই অতিথিই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো এবং ফিরে এসে বায়াজিদ বোস্তামীকে বললো, ‘আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।’ বায়াজিদ বোস্তামী বললেন, ‘পীর হবে ঐ রকম, যে রকম তোমাকে আঘাত করেছিলো এবং মুরীদ হবে ঐ লোকের মত, যার কাছে চিঠি লেখা হয়েছিলো (অর্থাৎ, মুরীদ ঐ রকম হবে যে, তার সম্মানও যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তবুও, অবাধ্য হবে না; আর পীর হবে ঐ রকম, যে পাপ থেকে রক্ষা করবে)।’^{৫৯০}

রাশীদ আহমাদ গাসোহী মুরীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন, “মুরীদ হবে ঐ রকম, যে পীরের প্রতিটি কথাই বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেবে এবং নিজের কোন ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেবে না।”^{৫৯১}

মুরীদকে সাহায্য করার ব্যাপারে শাইখের কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে বলা :

উপরোক্ত বিশ্বাসকে দেওবন্দিগণ তাদের বইয়ে নিম্ন বর্ণিত কথায় প্রকাশ করেছেন-
“মুরীদকে বুঝতে হবে যে, শাইখের রূহ নির্দিষ্ট কোন জায়গায় স্থির নেই। শাইখের রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিক কর্মফল এবং বিশ্বাস) মুরীদ যেখানেই থাক, সেখানেই

৫৮৯। আদা'বুল মুয়া'শারাত (সামাজিক জীবনের শিষ্টাচার, ইং অনুঃ, শাইখের আদাব অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০)।

৫৯০। তাক্বিরাতু'র-রাশীদ (আ'শিক ইলাহী মারাঠী লিখিত রাশীদ আহমাদ গাসোহীর জীবন চরিত) ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৮-২৬৯।

৫৯১। তাক্বিরাতু'র-রাশীদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৭।

পৌছাবে। মুরীদ যখন শাইখের নৈকট্য অনুভব করতে পারবে, তখন সে সর্বাবস্থায় তার শাইখকে স্মরণে রাখবে এবং হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি হবে। এই ভাবে, সে শাইখের নিকট থেকে আধ্যাত্মিক সুবিধা অর্জন করবে।”^{৫৯২}

মাওলানা যাকারিয়াহ বলেন, “হযরত শাইখ আতার এক মুরীদ হাজ্জ গিয়েছিলো। যদিও যাবার সময় তার শাইখের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে গিয়েছিলেন, কিন্তু, সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, কা’বা শরীফের মাকাম-ই-ইব্রাহীমে এবং অন্যান্য স্থানে তার শাইখকে দেখে। সে ফিরে এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো যে, তার হাজ্জ রওয়ানা হবার পর তার শাইখ হাজ্জ গিয়েছিলো কি না? সবাই বললো, ‘না, তিনি (শাইখ) হাজ্জ যান নি।’ সে দেখা করতে গিয়ে শাইখকে বললো, হাজ্জের সময় কোথায় কোথায় তাঁকে দেখেছে। শুনে, হযরত শাইখ শুধু স্মিত হাসি দিলেন।”^{৫৯৩}

আশিক ইলাহী মারাঠী রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর জীবন চরিতে বর্ণনা করেছেন, “মৌলভী মাহমুদ হাসান নাগোনভী সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত ধার্মিক ও সংযমী ছিলেন এবং মক্কায তাঁর পিতার সাথে ১২ বৎসর কাটিয়েছেন। তিনি একদিন তাঁকে (মারাঠী) বললেন, ‘হে পুত্র! হযরত (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) এর অনেক ছাত্র এবং মুরীদ আছে, কিন্তু, কেউই সত্যিকার অর্থে তাঁকে চিনতে পারেনি। যখন আমি মক্কায থাকতাম, প্রায়ই দেখতাম হযরত (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী) হারাম শরীফ (মাস্জিদ আল-হারাম) এ ফাজরের নামায পড়ছেন। অন্যদের থেকেও শুনেছি যে, ইনিই রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী, যিনি ভারতের গাঙ্গোহায় বসবাস করেন।”^{৫৯৪}

এই সমস্ত কাহিনী দিয়ে দেওবন্দিগণ মুরীদের মনে বিশ্বাস আনয়ন করেন যে, কিভাবে শাইখগণ মুরীদের ধর্ম রক্ষা করেন, বিপদে সাহায্য করেন এবং ক্বাবরের কঠিন সময়েও তাকে সাহায্য করবেন।

দেওবন্দি শাইখগণ মুরীদগণকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করেন :

খলিল আহমাদ শাহরানপুরীর এক খাদিম, এক সাধু (হিন্দু পুরোহিত) এর সাথে রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করছিলেন। খাদিম সাধুকে বললো, ‘শাহরানপুরে এক বিরাট নামী শাইখ থাকেন এবং অনেক লোক তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসে’, পরক্ষণে খাদিমের অন্তরে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হলো এবং হৃদপিণ্ডে মারাত্মক চাপ অনুভব করলো। বিবেক-বুদ্ধি শূন্যতা তার মনে চেপে বসলো। সে সম্পূর্ণ চেতনা ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেললো, কিন্তু, কেন এমন হলো, তার কোন কারণই বোঝা গেল না। এমতাবস্থায়, সে হযরত শাহরানপুরীকে দেখলো, এবং তিনি ‘হাছরুনাল্লাহি ওয়া নি’মাল ওয়াকিল’ পড়ার জন্য হুকুম করলেন। যদিও, সে কথা বলতে পারছিলো না,

৫৯২। ইমদাদুস সুলক (উর্দু), পৃষ্ঠা-৬৭ এবং ইরশাদুল মুলক (ইং অনুঃ), পৃষ্ঠা-৫২।

৫৯৩। ইখ্বা’লুশ শিয়া’ম, পৃষ্ঠা-৫৩।

৫৯৪। তায়কিরতুর-রাশীদ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১২।

তবুও, মনে মনে এই যিকর শুরু করে দিল এবং শীঘ্রই সে ঐ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলো। সে তখন শুনলো, সাধু বলছে, ‘সত্যিই তোমার গুরু (খলিল আহমাদ শাহরানপুরী) একজন উঁচু স্তরের জ্ঞানী এবং শক্তিশালী।’^{৫৯৫}

শাইখ ক্বাবর আযাব থেকে রক্ষা করেন :

“একদা হযরত হারুনী, তাঁর আধ্যাত্মিক ভাই (একই শাইখের মুরীদ) এর দাফনে উপস্থিত হলেন। দাফনের পর সবাই চলে গেলো, হযরত সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন এবং ক্বাবরস্থ ব্যক্তির অবস্থা তাঁর সামনে দৃশ্যমান হলো। যখন আযাবের ফিরিশতা ক্বাবরবাসীর দিকে অগ্রসর হলেন, হযরত হারুনী তাদেরকে বললেন, ক্বাবরবাসী তাঁর সাথী ছিল। তাঁর সুপারিশে মৃতব্যক্তি শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে গেলো।”^{৫৯৬}

একদা আশরাফ আলী থানভী, রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্বাবরে কি শাজরাহ (কোন ত্বরীক্বার সমস্ত শাইখদের নামের ক্রম তালিকা) রাখা জায়িয? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। আশরাফ আলী থানভী আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘এর কোন উপকারিতা আছে কি?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ’ এবং বললেন, ‘শাহ গোলাম আলী (একজন সুফী) অসিয়ত করেছিলেন, তার পীরের জুতা যেন তার ক্বাবরে দেয়া হয়।’^{৫৯৭}

তুমি তোমার পীরের সমকক্ষ হতে পারবেনা :

এক রুটি প্রস্তুতকারী ব্যক্তি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহুর অতিথিদের জন্য খাবার তৈরী করছিলো। কৃতজ্ঞতা পরবশ হয়ে হযরত তাকে বললেন, ‘তোমার যা ইচ্ছে তাই চাও।’ রুটি প্রস্তুতকারী বললো, ‘হযুর আমাকে আপনার মত বানিয়ে দিন।’ হযরত বললেন, ‘তুমি তা সহ্য করতে পারবেনা।’ কিন্তু, রুটি প্রস্তুতকারী হযুরকে বার বার চাপ দিতে লাগলো। অবশেষে, হযরত তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার উপর তাওয়াজ্জুহ ইত্তিহাদী^{৫৯৮} নিক্ষেপ করলেন। যখন তারা ঘর থেকে বের হলো, দেখা গেলো তাওয়াজ্জুহর ফলে তার (রুটি প্রস্তুতকারী) ভিতর, এমনকি তার বাহ্যিক চেহারা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। রুটি প্রস্তুতকারকের চেহারা হুবহু হযরতের

৫৯৫। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২৮৬-২৮৭ এবং ইখ্বামুল শিয়াম (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-৫৩।

৫৯৬। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ) পৃষ্ঠা-১৪৪।

৫৯৭। তায়কিরাতুল-রাশীদ (আশিক ইলাহী মারাতী লিখিত রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর জীবন চরিত) ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯০।

৫৯৮। মাওলানা যাকারিয়াহ ব্যাখ্যা করেছেন, “এই প্রকারের তাওয়াজ্জুহতে শাইখ তাঁর রুহ মুরীদের রুহের সাথে এমন পর্যায়ের সম্মিলন ঘটান যে, দুই রুহ এক রুহে পরিণত হয়।” মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ) পৃষ্ঠা-১৬।

মত হয়ে গিয়েছিলো; শুধু পার্থক্য ছিলো, হযরত চেতন ও সতর্ক ছিলেন, আর রুটি প্রস্তুতকারক অর্ধ-চেতন অবস্থায় ছিলো। তৃতীয় দিনে লোকটি মারা গেলো।^{৫৯৯}

সুফী শাইখ এবং ইমামগণকে অন্ধ-অনুসরণ না করার ফল :

পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে আমরা দেখেছি যে, সুফীগণ চান, লোকজন তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করুক। তাঁরা এটা অবশ্য কর্তব্য করে নিয়েছেন যে, প্রতিটি লোকেরই একজন শাইখ থাকতে হবে। শাইখের প্রতি আনুগত্য এরকম থাকবে যে, শাইখের আদেশ-উপদেশ ব্যতীত অন্যান্য আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা সব বিসর্জন দিবে, এর বাইরে কিছু করলেই, সেটা অশ্রদ্ধা বলে গণ্য হবে।

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী বলেন, ‘আমি মাশাইখ (শাইখের বহুবচন) ও উলেমাদের প্রতি অশ্রদ্ধাকে সাংঘাতিক ভয় করি, কারণ, এটার ফলাফল ভীষণ বিপজ্জনক (ঈমানের জন্য)’^{৬০০}।

মাওলানা রাশীদ আহমাদ গান্জোহী বলেছেন, ‘যারা ধীনের আলিমগণের সমালোচনা, অপমান এবং অবজ্ঞা করে, ক্বাবরে তাদের মুখ ক্বিবলা থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।’^{৬০১} তায়্কিরাতুর-রাশীদে আর একটি অতিরিক্ত বর্ণনা আছে, ‘যারা ইচ্ছা করে, তারা নিজেরাই দেখতে পারে (ক্বিবলা থেকে অন্য দিকে মুখ ফেরানো), যদি তারা গায়ির মুকাদ্দিস^{৬০২} হয়; কারণ, তারা আলিমদেরকে খারাপ বলে। আর তাদের পিছনে নামায পড়া অবাস্তিত (মাকরুহ)।’^{৬০৩}

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো দেখা হয়েছে এজন্য যে, যাতে লোকজন সুফীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার সামান্যতম চিন্তাও না করে।

নতুন ধরণের তাওহীদের প্রবর্তন - “তাওহীদ আল-মাতলাব”ঃ

রাশীদ আহমাদ গান্জোহী কর্তৃক ‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ এর ব্যাখ্যা ----

‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ অর্থ- যার যার নিজের শাইখের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া। কারণ, এর সাথেই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা জড়িত। আমার শাইখ ছাড়া অন্য কেউই আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম নয়,^{৬০৪} যদিও আমার শাইখের

৫৯৯। মাশাইখ-ই-চিশ্ত, মাওলানা যাকারিয়াহ কর্তৃক লিখিত, পৃষ্ঠা-১৬।

৬০০। আ’দাবুল মুয়া’শারাত (সামাজিক জীবনের শিষ্টাচার, ইং অনুঃ, শাইখের প্রতি আদাব, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০)।

৬০১। মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২৫৭।

৬০২। গায়ির মুকাদ্দিস : যারা ধর্মীয় সমস্ত বিষয়াদিতে নির্দিষ্ট একজন ইমাম বা আলিমকে অন্ধ-অনুকরণ করেন না। বরং, দলিলাদির ভিত্তিতে আহল আস-সুন্নাহর সব ইমাম বা আলিমকে অনুসরণ করেন।

৬০৩। তায়্কিরাতুর-রাশীদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮২।

৬০৪। এটি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর নিজস্ব বক্তব্য, মাশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২৫৭।

সমগুণ সম্পন্ন বহু শাইখ পৃথিবীতে রয়েছেন। অতএব, ‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ সূলুকের (সূফীদের পথ) প্রধান স্তম্ভ। যে এটা (একজন শাইখের সাথে) অর্জন করতে না পারে, সে সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত থাকে, যদিও সে বনে-বনে ঘুরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আল্লাহ্ এইসব লোকদের প্রতি সামান্য খেয়ালও দেননা। তারা আমার তৃষ্ণা মেটাতে পারে এবং লক্ষ্যে পৌছাতে পারে, এই ভেবে, প্রত্যেক শাইখকে এক সমান মনে করা সূলুকের জন্য ক্ষতিকর। যেমন, হাক্ক (সত্য) একটি এবং ক্বিবলাও একটি, তেমনি, আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকও একজনই হতে হবে। অন্যথা, ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অর্জন করা যাবে না, এই রকম দুঃখ-কষ্টের পরে অনেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং, কেউ যদি সামান্যতম চিন্তাও করে যে, তার শাইখ ছাড়া এ দুনিয়ার অন্য কেউ মাতলাব এ পৌছার জন্য সাহায্য করতে পারবে; শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যাপারে তাকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে রাখবে।

এরকম অনেক সময়ই ঘটে যে, শয়তান অন্য শাইখের বেশে উপস্থিত হয়। মুরীদের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় যদি দুর্বলতা থাকে, তবে সে পীর বেশে উপস্থিত হওয়া শয়তানের প্রতি বুকে পড়বে। একবার যদি শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে, তার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সে (শয়তান) কেড়ে নেয়, এবং মুরীদ শয়তানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা। ফলে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শয়তানের প্রতি বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য সে (শয়তান) তাকে (মুরীদ) অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণ বস্তু দেখায় বা অসাধারণ কাজ করে। যদি কেউ ‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ অর্জন করে, শয়তান কখনও খুশী হয়না। শয়তান কারো নিজের পীরের বেশে উপস্থিত হতে পারেনা। নাবী (সাঃ) তাঁর উম্মাহর জন্য যেমন, পীর তার মুরীদের জন্য তেমনি। তিনি (রাসূল সাঃ) বলেছেন, ‘এই উম্মাহর আলিমগণ, বানী ইস্রাঈলের নাবীর সমতুল্য।’কাজেই, শয়তান কারো নিজের শাইখের বেশে উপস্থিত হতে পারে না^{৬০৫}, যেমন, সে (শয়তান) রাসূল (সাঃ) এর আসল চেহারায় উপস্থিত হতে পারে না।^{৬০৬} রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী বলেন, ‘যদি জুনাইদ বাগ্দাদী সহ অন্যান্য আউলিয়াগণ এক সাথে সমবেত হন, এবং আমাদের হাজী সাহেবও (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) যদি সেখানে থাকেন, আমরা তাঁকে ছাড়া হযরত জুনাইদ বাগ্দাদী বা অন্য কারো দিকে লক্ষ্য করবোনা। আমরা হযরত হাজী সাহেবের কাছেই যাবো। হ্যাঁ, হযরত হাজী সাহেবের কর্তব্য তাঁদের দিকে দৃষ্টি দেয়া। আমাদের সম্পর্ক শুধু হাজী সাহেবের সাথে’।^{৬০৭}

৬০৫। মাওলানা যাকারিয়াহ মশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২৫৬ তেও বর্ণনা করেছেন।

৬০৬। ইরশাদুল মূলক, পৃষ্ঠা-২৭, কাহিনী নং-৩, (মাজলিসুল উলোমা কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত, পৃষ্ঠা-৪৯)।

৬০৭। মশাইখ-ই-চিশ্ত (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-২৫০।

আশরাফ আলী খানভী কৃত ‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ এর ব্যাখ্যা :

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী তাঁর তাফসীরে “{হে মুহাম্মাদ (সাঃ)} তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তোমার পূর্বেও যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এতেও—” এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘এই আয়াত থেকে কিয়াসের সিদ্ধান্ত এই যে, একজনকে সব শাইখের উপরই বিশ্বাস রাখতে হবে; যেমন, একজন তার নিজের শাইখের উপর বিশ্বাস রাখে। যাহোক, এই অনুসরণ (ইস্তিবা) একজনের নিজের শাইখের জন্য। যেমন, রাসুলদের ব্যাপার (আমরা প্রত্যেক নাবী-রাসুলের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাদের অনুসারীদেরকে আহলে-কিতাব বলে মনে করি; কিন্তু, অনুসরণ শুধু নিজের রাসুলকেই করি)।’^{৬০৮} আশিক ইলাহী মারাঠীর ইরশাদুল মূলকেও একই রকম বর্ণনা দেয়া হয়েছে^{৬০৯}।

আদাবুল মু’আশারাত গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী খানভী বলেন, ‘প্রত্যেক শাইখের প্রতিই সম্মান দেখাবে এবং ইজ্জত করবে, কিন্তু, তাদের তালিম গ্রহণ করবেনা। কারো শাইখ যদি জীবিত থাকেন, আর সে যদি অন্য কোন শাইখের তালিম গ্রহণ করে, এটা তার জন্য ধ্বংসাত্মক। নিজের শাইখের তালিমের প্রতি আপত্তি করলে, সে আধ্যাত্মিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত হবে।’^{৬১০}

অতএব, দেওবন্দি আলিমগণ তাদের লেখায় ‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ এর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তারা একজনের পীর (শাইখ) থাকা ফারুজ ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমাদের সময়কালের দাজ্জাল, মির্যা গোলাম আহমাদের পীর নেই বলে সে বিপথগামী হবে, এই দোষারোপও করেছেন।

‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ ও তাক্বলীদ :

দেওবন্দিগণের ‘তাওহীদ আল-মাতলাব’ এর ধারণার উপর ভিত্তি করেই হয়তো, মাযহাবের গোঁড়া ও ধর্মোন্মত্ত অন্ধ অনুসরণ (তাক্বলীদ) গড়ে উঠেছে। দেওবন্দিগণ অন্ধভাবে যে সব ইমামের অনুকরণ করেন, তাঁরা কিন্তু, মাযহাবের ভিত্তি তৈরী

৬০৮। মাওঃ আশরাফ আলী খানভী এটি ‘মাসায়িল-আস-সুদুক’ নামে বর্ণনা করেছেন। আধ্যাত্মিকতার পথ এর রায়ে ৪নং আয়াতের/সূরাহ বাক্বারাহর (০২ : ০৪) তাফসীরে (তাক্বলীদ বয়ান-আল-কুরআন, পৃঃ ৩)।

৬০৯। ইরশাদুল-মূলক (ইং অনুঃ), পৃঃ- ৪৮।

৬১০। আদাবুল মু’আশারাত (সামাজিক জীবনের শিষ্টাচার ইং অনুঃ), শাইখের হাতি আদাব অধ্যায়, পৃঃ- ৮৯- ৯০।

করেননি, বা লোকদেরকে অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করতেও বলেননি। অনেকের মত তাঁরাও ধার্মিক ও জ্ঞানী ছিলেন, মুসলিম উম্মাহর অনেক খিদমাত করেছেন। তাঁদের জ্ঞান, শিষ্য এবং কিতাবের মাধ্যমে রেখে গেছেন। দেওবন্দিগণ ইমামগণের অন্ধ অনুসরণ (তাক্বলীদ) এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পরিশেষে, এটাই প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরাই দ্বীনের চূড়ান্ত দিক-নির্দেশক। তাঁরা আরো কামনা করেন, লোকেরা শুধুমাত্র দেওবন্দবাদের অনুসারী হোক।

দ্বাদশ অধ্যায়

দেওবন্দিগণের তাক্বলীদ সম্পর্কে ধারণা

ইবনে আক্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, “তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, -‘রাসুল (সাঃ) বলেছেন,’ অথচ, তোমরা বলছো,- ‘আবু বাক্বর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) বলেছেন।’”^{৬১১} (মুস্নাদে আহমদ, হাদীস নং ৩৩৭/১।)

সার-সংক্ষেপ :

দেওবন্দি ও বেরেলুভীগণের অতি উৎসাহ এবং অতিরঞ্জনের ফলে পাক-ভারত উপমহাদেশে তাক্বলীদ একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। দেওবন্দিগণ দাবী করেন যে, তাঁরা হানাফী মায্হাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। ধর্মীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মায্হাবের অনুসরণ মুকাল্লিদের জন্য ফারজ। এতদসত্ত্বেও, বাস্তবে, দেওবন্দিগণ ফিক্হ এর ক্ষেত্রেই শুধু মায্হাব অনুসরণ করেন। আমরা এর আগে ‘ওয়াহ্‌দাতুল-ওজুদ’ ও ‘ওয়াসীলা’য় দেখেছি, তাঁরা শুধু ফিক্হের ক্ষেত্রে মায্হাব মানেন, আক্বীদাহর বেলায় নয়।

দেওবন্দিগণের সাথে আলোচনা করলে বুঝা যায়, ইমামগণের অনুসরণ কোন বিষয়ই নয়। যেহেতু, তাঁরা মায্হাবের সাথে বিশ্বস্ততার সাথে সংযুক্ত থাকার ব্যাপারে জোড় দাবী করেন, আমরা তাদের বিভিন্ন দাবী কুর’আন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখবো, এগুলো বাতুলতা মাত্র।

তাক্বলীদ সম্পর্কে দেওবন্দিগণের বুকের ভিতর প্রচুর অসংগতি আছে। এই অধ্যায়ে তা আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো, ইনশা’আল্লাহ্‌।

- ইমামগণের তাক্বলীদের ছত্রছায়ায় তাঁদের নিজেদের (সূফী-মাশাইখগণের) অঙ্ক-অনুসরণে উৎসাহিত করা।
- তাক্বলীদে দেওবন্দিগণের অতিরঞ্জন, অবাস্তবতা ও স্ব-বিরোধীতা মুসলমানদের মাঝে অপ্রয়োজনীয় বিভক্তি এবং সহীহ সুন্নাহ পালনের পথে প্রতিবন্ধক।

৬১১। শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব সংকলিত ‘কিতাব-আত্-তাহ্বীদ’।

- ধর্মপ্রাণ ইমামগণের অনুসরণে দেওবন্দিগণ অবিশ্বস্ত ।

দেওবন্দিগণের মতে তাক্বলীদ ৪

দেওবন্দিগণের মতানুসারে, তাক্বলীদ অর্থ, ‘দলিল-প্রমাণাদি মোতাবেকই দেয়া হয়েছে,- এই বিশ্বাসে একজনের বক্তব্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই গ্রহণ করা।’ সোজা কথা, ‘ইমাম বলেছেন’, এটাকেই প্রমাণ হিসেবে মেনে নিয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে চার ইমামের কোন একজনকে অনুসরণ করা; অর্থাৎ,- ইমামের বক্তব্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা। প্রমাণাদি ব্যতীত কোন বক্তব্য গ্রহণ করার মনোভাব দেওবন্দিগণের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। কারণ, কোন হাদীসের ভিত্তিতে ফাতোয়া দেয়া হয়েছে, এটা জিজ্ঞেস করলেই, তাঁরা অতি সহজেই রাগান্বিত হয়ে যান।

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী বলেছেন, “শরীয়াহর কোন ফাতোয়া পাওয়ার জন্য প্রশ্ন করলে, তার নিয়ম হলো, ‘(যখন আলিমের নিকট থেকে ফাতোয়া চাওয়া হয়) শুধু মাস’আলা (নিয়ম) জানতে চাও। কোন দলিল (কিসের ভিত্তিতে ফাতোয়া দেয়া হয়েছে) চাইবে না”।^{৬১২}

আশরাফ আলী খানভী বলেছেন, ‘মানুষের মন কলুষিত হয়ে গেছে। এক লোক কিছু কুটিলতাপূর্ণ প্রশ্ন করে লিখেছে, ‘হাদীসের আলোকে উত্তর দিন।’ আমি উত্তরে লিখেছিলাম, ‘আমি ফিকাহর আলোকে উত্তর মনে করতে পারছি, হাদীস থেকে উত্তর মনে করতে পারছি না; অতএব, আমাকে মা’ফ করুন।’ মালফুযাত গ্রন্থের ভাষান্তরকারী আরো যোগ করেছেন, ‘এই কায়দার মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া হয়নি। নিরর্থক অনুরোধের এটা প্রতিকার।’^{৬১৩}

ইমাম/আলিমগণকে প্রশ্ন করাই কি তাক্বলীদের প্রমাণ ?

দেওবন্দিগণ তাক্বলীদের সত্যতা প্রমাণের জন্য দাবী করেন যে, তাক্বলীদ হলো-

- ১। প্রচারিত জ্ঞানের অনুসরণ মাত্র।
- ২। ‘ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী’- একথা বিশ্বাস করেই ইমাম/আলিমগণকে জিজ্ঞেস করা।

৬১২। আ’দা’বুল-মুয়া’শারাত (সামাজিক জীবনের শিষ্টাচার), প্রণেতা-আশরাফ আলী খানভী, পৃষ্ঠা-৬১ (ইতি ফা’র আদা’ব)।

৬১৩। মালফুযাত (আশরাফ আলী খানভীর বিবৃতি এবং জীবনের বিশেষ ঘটনা), পৃঃ-৫৪।

প্রমাণ হিসেবে তারা এই আয়াত উপস্থাপন করেন, “তোমরা যদি না জানো, তবে ঐশী গ্রন্থধারীগণকে জিজ্ঞাসা কর।”^{৬১৪} দেওবন্দিগণের দাবী অনুসারে, কুর’আনের এই আয়াত মুসলমানদেরকে অকৃতভাবে একজন ইমামকে অনুসরণ করতে বলে কি না, তা আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তাছাড়াও, আমরা দেওবন্দিগণের সংজ্ঞা এবং তাকুলীদের শর্তসমূহ তুলনা করবো— ইমাম বা আলিমগণকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ এবং প্রচারিত জ্ঞানের অনুসরণ করা-র সাথে; এজন্য যে, দু’টি ধারণা একই, বা একই রকম কি না।

ইমাম/আলিমগণকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ :

আল্লাহ্ কুর’আনে বলেন, “(হে মুহাম্মাদ সাঃ!) তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই (রাসূল রূপে) প্রেরণ করেছিলাম (মানব জাতিতে ‘আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাস’-এ আহ্বান এবং এর প্রচারের জন্য), তোমরা (হে মক্কার মুশরিকগণ!) যদি না জানো, তবে, ঐশী গ্রন্থধারী (তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলিম) গণকে জিজ্ঞাসা কর। (আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম) সুস্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ; আর আমরা তোমার প্রতি (কুর’আন) অবতীর্ণ করেছি, মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছিলো, তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝাবার জন্য, যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।”^{৬১৫}

ইসলাম ধর্মের মূল উৎস হলো কুর’আন ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আদর্শ, যাঁকে শিক্ষক এবং পথ-প্রদর্শকরূপে পাঠানো হয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রতিটি কথা, কাজ ও নীরব সমর্থনই ধর্মের স্বপ্রমাণিত অংশ।

সাহাবা (রাঃ) গণের শিক্ষার মৌলিক উপাদান ছিলো, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যা প্রচার (মুখ থেকে নির্গত) করেছেন, তাই পূর্ণ নিষ্পত্তি হিসেবে মেনে, শুনা এবং মুখস্ত করা। তাঁরা এসকল রায় বা বাণী অনুসরণ করতেন, মুখস্ত করতেন এবং যাঁরা অনুপস্থিত, তাদের কাছে বলতেন। সাহাবী (রাঃ) গণ বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করতেন। কাজেই, তাঁরা অন্যদের চেয়ে ফাতোয়া ও আদেশ-নিষেধ বেশী জানতেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর ইত্তিকালের পর সাহাবী (রাঃ) গণ কার্যাবলী সেই ভাবেই করেছেন, যে ভাবে রাসূল (সাঃ) করতে বলেছেন, বা তাঁকে (সাঃ) করতে দেখেছেন বা শুনেছেন। আর, যদি বিশেষ কোন ফাতোয়া অজানা থাকতো, তবে, অধিক জ্ঞানী

৬১৪। সূরাহ্ আন-নাহ্ল (১৬ : ৪৩-৪৪)।

৬১৫। সূরাহ্ আন-নাহ্ল (১৬ : ৪৩-৪৪)।

সাহাবী (রাঃ)গণের নিকট থেকে জেনে নিতেন। এরপরও, যদি কোন বিষয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান না পেতেন, তখন ইজ্জতিহাদের আশ্রয় নিতেন। যেহেতু, সাহাবী (রাঃ)গণ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কাজেই, পরবর্তী সময়ে তাবে'ঈগণ সাহাবী (রাঃ)গণ থেকে একই পন্থায় ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সাহাবী (রাঃ) গণ শাসন ও ধর্মীয় কাজে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করতেন। তাবে'ঈগণ নিকটস্থ শহরে অবস্থানকারী সাহাবী (রাঃ)র নিকট থেকে হাদীস ও ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ শিখতেন। পুরুষানুক্রমে, ঐ শহরের যারা সুপরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, তাদের থেকে লোকেরা জ্ঞান আহরণ করতো এবং ফাতোয়া চাইতো।

সাধারণ লোকদের, নিকটস্থ শহরের কোন সবচেয়ে জ্ঞানী আলিমকে জিজ্ঞাসা করে ধর্মীয় বিষয়াদি জেনে নেয়ার প্রচলিত অভ্যাস তাবে'ঈগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চালু আছে। এই প্রচলিত নিয়মটিই আল্লাহর বাণী, “তোমরা যদি না জানো, তবে, ঐশী গ্রন্থধারীগণকে জিজ্ঞাসা কর।” আল্লাহর রাসুল (সাঃ) থেকে সহীহ সনদে যা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর অনুসরণ করাই প্রচারিত জ্ঞানের অনুসরণ এবং উপরের নিয়মই তার জন্য প্রচলিত আছে।

‘প্রচারিত জ্ঞানের অনুসরণ’, ‘জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা’ এসব রীতি দেওবন্দিগণ তাক্বলীদ হিসেবে গণ্য করেননা। নিম্ন লিখিত শর্তসমূহ (বিভিন্ন গ্রন্থ, বিভিন্ন বিষয় ও অনুচ্ছেদ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত) যারা কঠোরভাবে মেনে না নেয়, তাদেরকেও দেওবন্দিগণ মুকাল্লিদ (মায্হাবের অনুসারী) বলে স্বীকার করেননা।

১। সমস্ত অনুসরণযোগ্য ইমাম/আলিমগণ থেকেই মুসলিম উম্মাহ্ উপকৃত হয়েছেন; কিন্তু, তাক্বলীদ (অন্ধ-অনুসরণ)যোগ্য ইমাম মাত্র চারজন।

২। কোন ইমামের মায্হাব অনুসারীকে ধর্মীয় সকল বিষয়াদিতে ঐ মায্হাবের নিয়ম-কানুনই মানতে হবে।

৩। কোন ফাতোয়া মানার জন্য মুকাল্লিদের ঐ ফাতোয়া যাচাই করতে কোন বই-পুস্তক দেখার প্রয়োজন নেই। ‘ইমাম প্রমাণ ব্যতীত কিছুই বলেননি’- এ বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট, কারণ, ইমামের কথা স্বপ্রমাণিত।

৪। কোন মায্হাবের মুকাল্লিদ সামান্যতম কোন ব্যাপারেও অন্য তিন মায্হাবের অনুসরণ করতে পারবেনা। অন্য মায্হাব অনুসরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন মায্হাবের মুকাল্লিদ যদি, কোন বিষয়ে কুর'আনের কোন আয়াতে বা সহীহ হাদীসে তাঁর মায্হাবের ফাতোয়া বিরোধী কিছু পায়, তবুও তাকে তার মায্হাবের ফায়সলাই মানতে হবে। তাক্বলীদের শর্তসমূহ, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করা বা সাহাবী (রাঃ)

গণের অনুশীলন বা পরবর্তী প্রজন্মের নিয়মের মত নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবী (রাঃ) গণও তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেশী জ্ঞানী তাদের দ্বারস্থ হতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একান্ত সান্নিধ্যে যাঁরা বেশী থাকতেন, তাঁরাই জ্ঞান এবং বুঝের দিক থেকে উচ্চ স্তরের ছিলেন। যাহোক, তাঁরা মাত্র একজন জ্ঞানী সাহাবীকেই ধর্মের সমস্ত বিষয় জানার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়াকে অবশ্য কর্তব্য মনে করতেননা। তাঁরা শুধুমাত্র জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাক্বলীদ করতেননা। দেওবন্দিগণের যুক্তি-তর্কের মত যদি, একজনের সাহাবী (রাঃ) গণের অনুশীলনকে তাক্বলীদও ধরে নেয়া হয়; তা'হলে, এটা একজন সাহাবীর তাক্বলীদ ও অন্ধ অনুসরণ প্রমাণিত হয়, কিন্তু, কোন নির্দিষ্ট ইমাম বা আলিমের নয়।

এভাবেই, দেওবন্দিগণ দাবী করেন, যখন রাসুল (সাঃ) মু'য়াজ ইব্ন জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন, ইয়েমেনবাসীরা তাকে (মু'য়াজ ইব্ন জাবাল) তাক্বলীদ করতো। এখানে ইয়েমেনবাসীরা মু'য়াজ ইব্ন জাবাল (রাঃ) এর মতামতের অনুসরণ করাকে অবশ্যিক করে নেননি বা অন্য সাহাবীগণের ফাতোয়া নিষিদ্ধ করেননি। এখানেও তাক্বলীদের শর্ত পূরণ হচ্ছে না। রাসুল (সাঃ) থেকে সহীহ বর্ণনায় যা কিছু পেয়েছেন, ইয়েমেনবাসীরা তা মেনে নিয়েছেন।

যাহোক, দেওবন্দিগণের মতে, ইয়েমেনবাসীগণের উচিত ছিলো, রাসুল (সাঃ) এর তাক্বলীদ- তথা, ইত্তিবা বাদ দিয়ে, চার ইমামের তাক্বলীদ করা। এছাড়াও, তাক্বলীদের সমর্থনে দেওবন্দিগণ 'জাল হাদীস' তুলে ধরেন, 'আমার সাহাবাগণ তারকার মত, এঁদের যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করবে, সঠিক পথের নির্দেশ পাবে।'^{৬১৬} সুতরাং, এই জাল হাদীসের আলোকেও ইয়েমেনবাসীদেরকে মু'য়াজ ইব্ন জাবাল (রাঃ) এর তাক্বলীদ করতে দেয়া উচিত। কিন্তু, তাও দেওবন্দিগণের নিকট অগ্রহণযোগ্য। তাদের স্ব-বিরোধিতার কি শেষ আছে?

দেওবন্দিগণের দাবী ও তাক্বলীদের শর্তসমূহের বিশ্লেষণ

'চার ইমামই সত্যের উপর আছেন'- এই বক্তব্যের বিশ্লেষণঃ

যদিও দাবী করা হয়, চার মায্‌হাবই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু, দেওবন্দিগণ হানাফী মায্‌হাব ছাড়া, অন্য কোন মায্‌হাবকে মানুষের জন্য কল্যাণকর বা পথ-নির্দেশের উৎস হিসেবে গণ্য করেননা। নিম্ন লিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে তার সত্যতা পাওয়া যাবে-

১। দেওবন্দিগণ হানাফী মায্‌হাবের পক্ষে পক্ষপাতিত্বের চেষ্টা করেনঃ

দেওবন্দিগণ দাবী করেন, চার মায্‌হাবই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপরও, তারা হানাফী মায্‌হাবের দিকে আসার জন্য প্রচলিত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

৬১৬। ইরশাদুল-মূলক (ইংরেজী অনুবাদ), পৃঃ- ৪৬ এবং ফাজায়েল-ই-আ'মালের বিভিন্ন জায়গায় দেখুন।

মাজলিস-ই-গুরাহ কি হাইয়াত-ই-তারকিবিয়া-এর ১২নং দফার শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে, 'প্রত্যেক সদস্যকেই হানাফী মাযহাবের হতে হবে।'^{৬১৭}

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী 'ইমদাদ উল-মুশতাক্ব ইলা আশরাফ-উল-আখলাক্ব' (উর্দু) গ্রন্থের ৩৬ নং পৃষ্ঠা, বক্তব্য নং -১ এ বর্ণনা করেছেন, 'তিনি (ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী) বলতেন, ফাকির সে-ই, যে হানাফী মাযহাবের অনুসারী, অনুশীলনে সুফি। আমার পরিচিতদের মাঝে থেকে কেউ যদি এটা লক্ষণ করে, সে আমার পরিচিত বা আত্মীয়-স্বজনদের থেকে কিছু অর্জন করতে পারবে না। আর কেউ যদি ফাকির (নিজে) এর প্রতি অনুগত হতে চায়, তাকে অবশ্যই হানাফী মাযহাবের হতে হবে, এবং বাস্তব জীবনে হতে হবে সুফি।'

২। মুসলিম উম্মাহর যে কোন একজনের তাক্বলীদ :

কোন ইমামের অনুসারীকে সর্ব বিষয়ে তার নিজের ইমামকে অনুসরণ করতে হবে, অন্য ইমামের ফাতোয়া অনুসরণ করতে পারবেনা; যদিও দাবী করা হয়, সব ইমামই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিতাব-উল-ঈমানে (পৃষ্ঠাঃ ৭২-৭৪) উল্লেখ করা হয়েছে, 'সামান্য ব্যাপারে এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে গেলে, সে মাযহাব থেকে বহিস্কৃত বলে গণ্য হয়; পরিশেষে, তার ঈমান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।'

একজনের ঈমান ধ্বংস হয় বাতিল (বিদ্রোহমূলক) কাজ, যেমন- শির্ক, বিদয়াহ বা কাবিরাত গুনাহ করলে। তখন, কি করে দাবী করা হয় যে, অন্য মাযহাবগুলো হাক্ব (সত্য)' এর উপর আছে; যখন, এগুলোতে ও বাতিল কিছু করলে একই প্রতিফল অর্জিত হবে? এরপর, একজন যদি সব মাযহাবের উপর দৃষ্টান্তমূলক পাণ্ডিত্য অর্জন না করতে পারেন, তবে পৈত্রিক সূত্রে যে মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত, তা পরিবর্তন করতে পারবেননা। আর যদি পরিবর্তন একান্ত করতেই হয়, তবে, পুরোপুরি অন্য মাযহাবভুক্ত হতে হবে।

৩। যে আ'মাল শাফিঈগণের নামাযে বৈধ, তা হানাফীগণের নামাযে অবৈধঃ

যুফতী লাজপুরীর নিম্ন লিখিত ফাতোয়াতে দেওবন্দিগণের গৌড়ামি ও অসহিষ্ণুতা দেখা যাবে। যেমন, যদি একজন হানাফী, নামাযে শাফিঈদের সামান্য একটা আ'মালও অনুসরণ করেন, তবে তার নামায ফাসেদ (অবৈধ) হবে।

প্রশ্নঃ আমি হানাফী মাযহাবভুক্ত এবং শাফিঈ মাযহাবভুক্ত একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা

করি। কোন কোন সময় আমি সরব কির'আত বিশিষ্ট নামায়ে ইমামতি করি।
যেহেতু, মুজাদিগণ শাফিঈ মায্‌হাবভুক্ত, অতএব, সূরাহ ফাতিহা পাঠের পর এতটা
সময় থেমে থাকি যে, ঐ সময়ে তারা তাড়াতাড়ি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে অন্য সূরাহ
শুরু করতে পারে; এতে আমার নামায়ে কোন দোষ হবে কি?

উত্তরঃ এরকম দেৱী (সূরাহ ফাতিহার সাথে অন্য সূরাহ মিলাতে) হানাফী ইমামের
জন্য ঠিক নয় এবং এটা নিষিদ্ধ। এ নামায ত্রুটিযুক্ত, সাহ্‌ সিজদায়ও পূরণ হবে না।
কাজেই, আবার নতুন করে পড়তে হবে; কারণ, দেৱীটা ইচ্ছাকৃত।^{৬১৮}

৪। অন্য মায্‌হাব অনুসরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ

‘যদি হানাফী মায্‌হাবের একজন লোক শাফিঈ মায্‌হাব ভুক্ত হয়, তবে তার সাক্ষ্য
গ্রহণযোগ্য হবে না।’^{৬১৯}

‘যদি কোন ব্যক্তি এক মায্‌হাব থেকে অন্য মায্‌হাবে চলে যায়, তবে তার উপর
তা’জির প্রয়োগ করা হবে (দুরুল মুখতার)। তা’জির অর্থ-ইসলামী বিচারালয়
নির্ধারিত শাস্তি। এই শাস্তি বেত্রাঘাত হতে পারে, অথবা কারাবাস।’^{৬২০}

এই শাস্তির আলোকে দেখা যায় যে,- মায্‌হাবের বিভক্তি, রাহুমাহুর পরিবর্তে
কাঠিন্য, যা লা’নাত। অথচ, দেওবন্দিগণ জাল হাদীস,- ‘আমার উম্মাহর মতবিরোধ
রাহুমাহু সন্নপ’- এর ভিত্তিতে মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্যকেই আশীর্বাদ, তথা-
রাহুমাহু বলে গণ্য করেন।

৫। নাবী-রাসুলদের পার্থক্যের সাথে মায্‌হাবগুলির পার্থক্যের তুলনা করা :

প্রত্যেক নাবী-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখা, মুসলমানদের ঈমানের অংশ; কিন্তু,
শরীয়াহ পালন করতে হবে শুধু রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ)এর। দেওবন্দিগণ এটাকে
ইদানিং কালের মায্‌হাবের তাকুলীদের সাথে তুলনা করে থাকেন। যেমন, কোন এক
মায্‌হাব বা ত্বরীক্বার অনুসারী সব মায্‌হাব বা ত্বরীক্বাকে সত্য বলে মেনে নেবে,
কিন্তু, অনুসরণ করবে শুধু নিজের মায্‌হাব বা ত্বরীক্বা।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, “এবং যে বিশ্বাস করে, যা তোমার উপর নাযিল
করা হয়েছে {হে মুহাম্মাদ (সাঃ!)} এবং যা নাযিল করা হয়েছিলো তোমার
পূর্বে” এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, এই আয়াত থেকে কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করা যেতে পারে যে, একজন তার শাইখকে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি, সব

৬১৮। ফাতোয়া-ই-রাহিমীয়াহ (ইং অনুঃ), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫ (কিতাবুস-সালাত)।

৬১৯। দুরুল মুখতার (উর্দু অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৭।

৬২০। ‘কিতাবুল ঈমান, পৃঃ- ৭৩।

শাইখকেও বিশ্বাস করতে হবে। যাহোক, ইত্তিবা (অনুসরণ) করতে হবে (শুধু) নিজের শাইখকে। এটা নাবী-রাসুলদের বিষয়ের মতই {যেমন, আমরা সব নাবী-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাদের অনুসারীদেরকে আহ্‌লুল-কিতাব বা ঐশীগ্রন্থধারী বলি, কিন্তু, অনুসরণ করি আমাদের নিজেদের রাসুল (সাঃ)কে}।^{৬২১}

মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর এই তাফসীর (ব্যাখ্যা) প্রকাশ্য এবং নিশ্চিতভাবে ভুল। নাবী-রাসুলগণের শরীয়াহর পার্থক্য আল্লাহ্‌ রাব্বুল আল'আমিনের পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। মহান দয়ালু এভাবেই ওয়াহী করেছেন নাবী-রাসুলগণের উপর। তিনি এক উম্মাহর জন্য যা হালাল করেছেন, অন্য উম্মাহর জন্য তা হারাম করেছেন। কিন্তু, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাহর প্রতি এমনই শরীয়াহ্‌ নাযিল করেছেন, যা প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য; সে ইমামই হোক, বা শাইখ অথবা সাধারণ মানুষ। কিয়াস করা যায় শুধু সম পর্যায়ে বিষয়ের মাঝে ও প্রেক্ষিতে।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, 'চার মায্‌হাবই সত্যের উপর'- বাস্তবে, এই কথাগুলোর কোনই গুরুত্ব নেই। আর দেওবন্দিগণ, অন্য ইমামগণের শিক্ষায় যে সত্য ও পথ-নির্দেশ আছে, তাতে যেমন গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিলো, সে রকম গুরুত্ব দেন নাই। যদিও তারা স্বীকার করেন, অন্য মায্‌হাবের ফাতোয়াগুলো কুর'আন ও সুন্নাহর অধিক নিকটতর, তারপরও, সেটাকে অনুসরণ করার অনুমোদন করেননা। যেমন, মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি বলেন, 'এ বিষয়ে ন্যায্য বিচার এটাই- ইমাম শাফি'ঈর মতামতগুলো অনেক ওজনদার, কিন্তু যেহেতু, আমরা মুকাল্লিদ, ইমাম আবু হানীফাকে অনুসরণ করা আমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য।'^{৬২২}

“চার ইমামের পর ইজ্‌তিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে”- এই বিবৃতির বিশ্লেষণঃ

দেওবন্দিগণ দাবী করেন, চার ইমাম মুজ্‌তাহিদ (ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন) ছিলেন, এবং তাঁদের শরীয়াহর নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিলো। তাঁদের সময়ের পরে ইজ্‌তিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। যে সকল পণ্ডিত নিজেরা সরাসরি কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ বুঝতে সক্ষম এবং ইজ্‌মা, কিয়াস, রহিত বা রদকরণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রেও জ্ঞান রাখেন, তাঁদের জন্যও দেওবন্দিগণ তাকুলীদ প্রয়োজন মনে করেন।

৬২১। আশরাফ আলী খানভী 'মাসাইল আন্-সালুক' এই শিরোনামে এটা উল্লেখ করেছেন{পথ-নির্দেশ (সুফিবাদ)- এর ফাতোয়া, সুরাহ বাঙ্কারার চতুর্থ অধ্যায়ের তাফসীর, তাফসীর বাইয়ানুল কুর'আন, পৃষ্ঠা-৩}।

৬২২। তাকুলীদ-ই-তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা একখানা কিতাব পাঠিয়েছেন, যার মাঝে বিশ্বাসীদের জন্য ইহকাল ও পরকালের সফলতার পথ-নির্দেশ রয়েছে। এছাড়া, তিনি একজন রাসূল (সাঃ) পাঠিয়েছেন, কিতাবখানা ব্যাখ্যা এবং আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান করার জন্য। এরপরও, যে সকল বিষয়ে কুর'আন ও হাদীসে সরাসরি কোন ব্যাখ্যা নেই; পরবর্তী প্রজন্মের পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাঁর কুর'আন এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে নতুন ফাতোয়া প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। সঠিকভাবে বলা যায়, '(যে সকল বিষয়ে কুর'আন ও সুন্নাহয় পরিস্কার কোন নির্দেশ নেই) ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক জটিল বিষয়ে শরীয়াহ অনুসারে ফাতোয়া উদ্ভাবন করা।'

আল্লাহ, যিনি অনন্ত অতীতে যা হয়েছে এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও যা হবে, সবই জানেন; তিনি ইচ্ছা করলে, পুরুষানুক্রমে মুসলিমগণ যে সব বিষয়ের মুকাবিলা করবে, সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করা শরীয়াহ নাযিল করতে পারতেন। কিন্তু, তিনি স্বর্গীয় মহাপ্রজ্ঞা বলে, সাধারণ ও বিস্তৃত আদেশ - নিষেধ নাযিল করেছেন। আবার ইজ্জতিহাদের দরজাও খোলা রেখেছেন, যেন ইসলামী পণ্ডিতগণ কুর'আন ও সুন্নাহর উপর গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতঃ শরীয়াহর ব্যাপারে বিশ্বাসীগণকে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। যাহোক, মাযহাবের অঙ্ক অনুসারীগণ সেই দরজা বন্ধ করেছেন এই বলে যে, 'ইসলামী চতুর্থ শতাব্দীতে ইজ্জতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।' কিন্তু, এটা অবাস্তব ও অসম্ভব, দুই-ই; এবং তাকুলীদের উদ্যোক্তারা নিজেরাই তাঁদের এ দাবী রক্ষা করেননি, যা আমরা পরবর্তীতে দেখবো, ইনশা'আল্লাহ।

তাকুলীদের দাবীকৃত সুফলের বিশ্লেষণঃ

(দাবী-১) : শুধুমাত্র চার ইমাগণেরই শরীয়াহর সকল বিষয়ে উত্তম সংগ্রহের সংকলন ছিলো।

দেওবন্দিগণ দাবী করেন, শুধুমাত্র এই চার ইমামই শরীয়াহর সমস্ত শাখার সংগৃহীত বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করেছিলেন, এবং সেজন্যই শুধুমাত্র, তাঁদেরই তাকুলীদ করা যায়। তাঁদের পূর্বেও কেউ পূর্ণাঙ্গরূপে সংগ্রহের সংকলন করেননি এবং পরেও কেউ তা করতে পারবেননা। তাঁরা মনে করেন, সাহাবী ও তাবেরীগণের সংগ্রহ সংকলনের চেয়েও ইমামগণের সংগ্রহ-সংকলন অধিকতর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁরা এটাও বলার দুঃসাহস দেখান, 'আমরা এরকম সুবিন্যস্ত ও আইনাকারে তৈরি সার-

সংক্ষেপের (ইসলামী শিক্ষার সকল শাখার) সংকলন আর দেখিনি, না সাহাবীগণের, না অন্যান্য তাবেঈগণের।^{৬২৩}

তারা বলেন, “চার ইমাম সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ইমাম, যারা এগুলো (ইসলামী শিক্ষার সকল শাখার) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করেছিলেন, এরপর ইজ্জতিহাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাধারণ লোকের একটাই মাত্র পথ, তা’হলো, তাক্বলীদ”। কিন্তু, দেওবন্দিগণ এই দাবী রক্ষা করতে পারেননি; কারণ, সব সময়ই ইজ্জতিহাদের কিছু না কিছু প্রয়োজন রয়েছে। ইজ্জতিহাদ পুরোপুরি বাদ দেয়া অসম্ভব এবং আবাস্তব।

খণ্ডনঃ

১। দেওবন্দিগণ আক্বীদাহুর সর্ব বিষয়ে তাদের ইমামের অনুসরণ করেন না।

আমরা ‘ওয়াহদাতুল-ওজুদ’ ও ‘ওয়াসীলাহ’র আলোচনায় এসম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। সুতরাং, প্রশ্ন উঠে, এই পূর্ণাঙ্গ সংকলনে কি আক্বীদাহুও অন্তর্ভুক্ত? যদি উত্তর হয় ‘হ্যাঁ’, তা’হলে, দেওবন্দিগণ কেন তাদের আক্বীদাহু (বিশ্বাসের বিষয়বস্তু) তাঁদের উপর আরোপ করেন, যারা ইমাম আবু হানীফাহু (রহঃ) এর পরে আগমন করেছেন, যেমন, আবু মানসুর মাতুরিদী। ফাতোয়াহু রাহিমীয়াহুতে বর্ণনা করা হয়েছে, ‘অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বস্তু ও বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁরা (দেওবন্দিগণ) ইমাম আবু হানীফাহু (রহঃ) এর মৌলনীতির অধীনে ইমাম আবু হাসান আশা’রী এবং ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদীকে অনুসরণ করেন। এবং তাঁরাই শুরু করেন চিশ্টিয়াহু, নাক্বশবান্দিয়াহু, ক্বাদ্রিয়াহু এবং সোহরাওয়ার্দিয়াহু নামের সূফি ক্রমধারা।’^{৬২৪}

তায়কিয়াহু (আত্মতত্ত্ব ও রহু সংক্রান্ত) ও কি ইমাম আবু হানীফাহু (রহঃ) কৃত সর্ব শাখার পূর্ণাঙ্গ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত? উত্তর যদি হয় ‘হ্যাঁ’, তা’হলে, কেন দেওবন্দিগণ নিজেদের প্রতি সিলসিলাহু আরোপিত করেন, যা ইমাম আবু হানীফাহু (রহঃ) এর অনেক পরে সংগঠিত হয়েছে?

২। ইমাম আবু হানীফাহু (রহঃ) এর শাগরেদগণ তাঁদের ইমামের বিপরীত যে সব ফাতোয়া দিয়েছেন, দেওবন্দিগণ সেগুলো অনুসরণ করেন।

ইমাম আবু হানীফাহু (রহঃ) এর অব্যবহিত পরে তাঁর শাগরেদগণ তাঁর অনেক

৬২৩। মুহম্মদী মাহমুদ হাসান গাঙ্গোহীর লেখা গ্রন্থ ‘শরীয়াহু তে তাক্বলীদের ভূমিকা এবং চার ইমামের যে কোন একজনের তাক্বলীদ কেন করতে হবে?’ থেকে উদ্ধৃত {“Awake” এ প্রকাশিত (জানুঃ/ফেব্রুঃ:১৯৯৬ খ্রীঃ), ওয়াই এম এম এ, দক্ষিণ আফ্রিকা}।

৬২৪। ফাতোয়া রাহিমীয়াহু (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-৫৮।

ফাতোয়া পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা (শাগরেদগণ) ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ) এর মতামত কে শেষ কথা বলে ধরে নেননি। ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ) নিজে তাঁর ফিকহু এর সংকলনকে যে কোন সাহাবী বা তাবেরঈ এর সংকলন থেকে ভালো, এটা কখনও দাবী করেননি। সত্যিকার অর্থে, তিনি কখনও লোকজনকে অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করতে বলেননি।

দেওবন্দিগণ ইমামের শাগরেদগণের ফাতোয়াকে উচ্চতর স্থানে বসিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত খোদা ফাজায়েল-ই-আ'মালেই পাওয়া যাবে। যেমন, ফাজায়েল-ই-রামজানে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ) এর মতে, 'নাফল (ঐচ্ছিক) ইতি'ক্বাফ কমপক্ষে পুরো একদিন পালন করতে হবে'। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, 'নিম্নতম সময়ের কোন সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন নেই'। মাওলানা যাকারিয়াহ্ ইমাম মুহাম্মাদ আশ্-শায়বানীর ফাতোয়াকেই সমর্থন করেন।^{৬২৫}

মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাজায়েল-ই-রামাজান এ বলেন, 'ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ) এর সুপরিচিত অভিমত যে, 'লাইলাতুল ক্বাদর সারা বছরে পরিভ্রমণ করে,' এবং অন্য আরেকটি অভিমত যে, 'সারা রামজান মাসেই পরিভ্রমণ করে'। তাঁর বিখ্যাত শাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত, 'রাত্রিটি পবিত্র মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখেই আসে, কিন্তু সেটা অজানা'।^{৬২৬}

ইমাম আবু হানিফাহ্ শর্ত প্রদান করেছেন, 'ইতি'ক্বাফ সেই মাস্জিদে পালন করতে হবে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত জামা'য়াতে নামায পড়া হয়'। অপর পক্ষে- আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ আশ্-শায়বানীর অভিমত, 'শরীয়াহ্ মতে স্থাপিত যে কোন মাস্জিদই ইতি'ক্বাফের জন্য ব্যবহার করা যাবে'।^{৬২৭}

ইমামগণের শাগরেদগণ অধিকতর শক্তিশালী দলিল পেয়ে ফাতোয়ায় যে পরিবর্তন এনেছেন, তা ইমামগণেরই শিক্ষা। ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ) বলেছেন, 'যদি

৬২৫। ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল-ই-রামাজান, তয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৬৫ (১৯৮৫ সংস্করণ, দ্বিনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৬২৬। ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল-ই-রামাজান, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৬০ (১৯৮৫-সংস্করণ, দ্বিনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৬২৭। ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ), ফাজায়েল-ই-রামাজান, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৬৫ (১৯৮৫-সংস্করণ, দ্বিনি বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, সেটাই আমার মায্হাব।^{৬২৮}

৩। দেওবন্দিগণ অন্যান্য ইমামগণের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

দেওবন্দিগণ যে অন্য ইমামগণের ফাতোয়া অনুসরণ ও অনুশীলন করেন, তার দু'টি দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধৃত করা হলো—

ক) নিরুদ্দেশ স্বামীর জন্য জ্বর অপেক্ষা করার সময়সীমা।

হানাফীহ মায্হাবের যে ফাতোয়া মাওলানা আশরাফ আলী খানভী তাঁর ‘বেহেশতী জেওর’ বইতে (১০ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা) লিখেছেন—

‘যদি কোন জ্বীলোকের স্বামী ফেরার হয়ে যায় এবং যদি জানা না যায় যে, জীবিত আছে, না ইন্তিকাল করেছে, তবে, সে তখনই অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবেনা। এই আশায় তাকে অপেক্ষা করতে হবে যে, তার স্বামী অবশ্যই ফিরে আসবে। তারপর, সে এতটা সময় অপেক্ষা করবে যে, ধরে নেয়া যায়, তার স্বামীর বয়স নব্বই বৎসর পার হয়ে গেছে। তখন, ইসলামী আদালত রায় দিতে পারে, সে ইন্তি কাল করেছে। যদি জ্বীলোকটির বিয়ের বয়স থাকে এবং কাউকে সে বিয়ে করতে চায়, তবে সে ইন্দতের পর বিয়ে করতে পারে; যেহেতু, ফেরার লোকটিকে ধর্মীয় বিচারক মৃত ঘোষণা করেছেন।’

“মালফুয়াত হাকীমুল-উম্মাহ্ (আশরাফ আলী খানভীর বাণী সংকলন)” এর ৮ম খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা কোন এক ব্যক্তি আশরাফ আলী খানভীর নিকট এসে বললো, “ইমাম (ইমাম আবু হানিফাহ) সাহেবের পরে ‘মাফকুদ আল-খবর (নিরুদ্দেশ স্বামী)’ এর বিষয়টি একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।” তিনি (মাওলানা খানভী) এই বলে উম্মা প্রকাশ করলেন যে, ‘হ্যাঁ এটাও একটা বিরাট সমস্যা, এবং কুর’আনে জিহাদের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা আরও একটি বড় সমস্যা। সুতরাং, কুর’আন থেকে এটা ও উচ্ছেদ কর (নাউযুবিল্লাহ!)।’

৬২৮। ইবন আবিদীন ‘আল-হাসিয়াহ্ (১/৬৩)’ তে বর্ণনা করেছেন এবং রাসুলুল-মুফতী (১/৪)।

অত্যন্ত পরিভাষার বিষয় যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)র এই সুবিখ্যাত উক্তি, এবং মায্হাবের অন্য ডিন ইমামের ও প্রায় সমার্কক উক্তি (যা, কিছু পরে এই গ্রন্থেই বর্ণিত), চার মায্হাবের প্রায় সমগ্র বিজ্ঞ আলেমগণ সবদলে এড়িয়ে যান, বা অনুশ্রব রাখেন, মায্হাবী রসম-রেওয়াজ সেউদানে নিরুদ্দেশভাবে পালন করতে পারার জন্য। খুবই দুঃখ এবং আতর্ভ্রমকভাবে, বলা যায় যে, উপমহাদেশের প্রায় আম মুসলমানের দ্বাকুওয়া (আত্মাভীতি) শরতানের ওয়াসওয়াসার কাছে সাংঘাতিকভাবে শিথিল। আত্মাভীতি আমাদের কমা করে প্রকৃত হিদায়াহ্ লাভের তৌফিক দান করেন। আমীন—অনুবাদক।

আশরাফ আলী খানভীর এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হানাফী মায্হাবের কোন কোন ফাতোয়া পরিত্যক্ত ঘোষণা করার কতটা তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তিনি এতই জোড়ালো তাগিদ অনুভব করেছিলেন যে, তা জিহাদ পরিত্যক্ত ঘোষণার সাথে তুলনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর, এই জিহাদ ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি এবং ফাযিলাত সম্পর্কে কুর'আন ও হাদীসে শত শত বাণী রয়েছে। যাহোক, দেওবন্দিগণ 'মাফকুদ আল-খবর' এর ফাতোয়া পরিত্যাগ করেছেন, যা তাদের মতে, নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ সংকলনের অংশ।

দেওবন্দিগণ এখন এ ব্যাপারে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলের মায্হাব অনুসরণ করেন, যেখানে এই অপেক্ষা করার সময়, চার বৎসর নির্ধারণ করা আছে। যেমন, আব্দুর রাহিম লাজপুরী তার ফাতোয়া রাহিমীয়াহতে বলেন, "...এবং আজকাল হানাফী মুফতীগণও...ইমাম মালিকের মায্হাব নির্ধারিত চার বৎসর' হিসেব করেই ফাতোয়া প্রদান করেন"।^{৬২৯}

(খ) যাকাতের অর্থ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) এ ব্যবহারঃ

হানাফী মায্হাবের ফাতোয়া অনুসারে যাকাতের অর্থ কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অর্থাৎ, মাদ্রাসায় ব্যবহার করা যাবে না। হানাফী মায্হাবে এই নিষেধাজ্ঞার ফাতোয়ার উৎস হলো, 'কুর'আন শিক্ষা দিয়ে কোন পারিশ্রমিক নেয়া যাবে না', এই বাণী থেকে। এই ফাতোয়া হানাফী দেওবন্দিগণের মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা হানাফী মায্হাবের ফাতোয়া পরিত্যাগ করতে না পেরে এ ব্যাপারে নতুন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এ সমস্যা উত্তরিয়ে গেছেন। তাঁরা যাকাতের বিপুল পরিমাণ অর্থ এই মাদ্রাসার যাকাত পাবার যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের মাঝে বন্টন করে দেন। পরে, আবার ঐ অর্থ ছাত্রদের দ্বারা মাদ্রাসায় সাদকা (দান) হিসেবে প্রদান করান। এদ্বারা, তারা এক টিলে দুই পাখি মেরেছেন। যাকাতের অর্থ মাদ্রাসায় ব্যবহার করা যাবে না, এ নিষেধাজ্ঞাও পালন করেছেন; আবার যাকাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থও পরক্ষোভাবে মাদ্রাসা পরিচালনায় ব্যবহার করেছেন। মুফতী আব্দুর রাহিম লাজপুরী এই পদ্ধতি অনুমোদন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছেন, 'এটা তখনই অনুমোদনযোগ্য, যখন ছাত্রদেরকে দান করতে বাধ্য করা না হয়।' (ফাতোয়া রাহিমীয়াহ, ২য় খণ্ড, ফাতোয়া নং-৪, পৃষ্ঠা-৭)।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো 'যথাযথ সংকলন' এর কল্প কাহিনী ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে

৬২৯। ফাতোয়া রাহিমীয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১২ (নিরুদ্দিষ্ট স্বামী সম্পর্কে ফাতোয়া)।

দিয়েছে। প্রথমতঃ দেওবন্দিগণের তাক্বলীদ ফিকাহুর বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখেছি, ইমাম আবু হানিফাহুর শাগরেদগণের দেয়া ইমামের বিপরীত ফাতোয়া, দেওবন্দিগণ শুধুমাত্র গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ, সেগুলো ব্যবহারেও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। কোন কোন সময় তারা অন্য ইমামের মায্হাব অনুসরণে বাধ্য হন। আমরা দেখেছি, তাঁরা কেমন স্বার্থপরের মত স্বার্থোদ্ধারের বেলায় নিজেদের ইমামের ফিকাহু নিয়ে ছেলে-খেলা করেন। কাজেই, অন্যান্য ইমাম ও তাদের শাগরেদগণের ক্ষেত্রে একই রকম বদান্যতা কেন দেখানো যাবেনা? যদি তা সম্ভব হতো, তবে, মুসলমানদের মাঝের এই অপ্রয়োজনীয় বিভক্তি,-তথা দলবাজী শেষ হয়ে যেতো।

(দাবী-২)ঃ একই ইমামের অনুসরণ ধর্মে বিশৃঙ্খলা ও সন্দেহ অবদমিত করে।

১। ক্বুর'আন ও সুন্নাহ মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার ভিত্তি প্রদান করে এবং বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করে। এখানে তাক্বলীদের কোন অনুমোদন দেয়া হয়নি। আব্বাহুর রাসুল-(সাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে পরিস্কার প্রমাণসহ ছেড়ে গেলাম, এর অন্ধকারটাও দিনের মত আলোকিত। যে ধ্বংসে পতিত হতে চায়, সে ছাড়া কেউ এ থেকে বিপণ্ণগামী হবেনা। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে (অনেক দিন), সে মহাদুর্যোগ দেখতে পাবে। অতএব, আমার সুন্নাহর উপর বহাল থেকে, ধর্মের নিয়ম-কানুন ও সংপথে পরিচালিত খলিফাদের সুন্নাহ দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে রেখো'।^{৬৩০}

২। মুকাদ্দিগণ নিজেরাই অসংখ্য শাখা ও দলে বিভক্ত। দেওবন্দি ও বেরেলুতীদের বিভক্তি, এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। একই মায্হাবভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলা ও সন্দেহের সৃষ্টি করে রেখেছেন।

৩। প্রতিটি মায্হাবই নির্দিষ্ট কোন ফাতোয়ার ব্যাপারে নিজেরাই সব সময় একমত থাকেন না। দৃষ্টান্ত সরাপ, বেশীরভাগ ফিকাহু গ্রন্থগুলো ইবাদাহ্ সংক্রান্ত বিষয় দিয়ে শুরু করা হয়। ইবাদাহুর প্রথম স্তর হলো, পবিত্রতা অর্জন এবং পবিত্রতা অর্জনের প্রথম ধাপ হলো, পানির পবিত্রতা। এই একটি মাত্র বিষয়েই হানাফীদের নিজেদের মধ্যেই নানা রকম মতপার্থক্য বিরাজিত। ইব্বনুল হাম্মাম আল-হানাফী লিখিত 'ফাতহুল ক্বাদির' দেখুন (পৃষ্ঠাঃ ৬৮-৮১)। এই গ্রন্থখানা হানাফী ফিকাহুর প্রামাণ্য কিতাব।

(দাবী-৩)ঃ এই ইমামগণের উপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহুর ঐকমত্য আছে। প্রথমতঃ এই দাবীটিই মিথ্যা। কারণ, ইমামগণ নিজেরাই তাদের অন্ধ অনুসরণ

৬৩০। কর্না-আহমাদ (৪/১২৬), ইব্বন মাজাহ (নং-৪৩), আল-হাকিম (১/৯৬)।

প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া, এই মতবাদটি মাযহাবের সাথে সংযুক্ত হওয়ার অস্তিত্বে এসেছে ইসলামের চতুর্থ শতাব্দীতে। নিম্নোলিখিত বক্তব্যগুলো থেকেই ইমামগণের অন্ধ অনুসরণের বিরোধীতা প্রতীয়মান হয়—

১: ইমাম আবু হানিফাহ (রহঃ) : ‘যখন কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, সেটাই আমার মাযহাব।’^{৬৩১} ‘কোন সূত্র (দলিল) থেকে আমরা পেয়েছি, তা না জেনে আমাদের মতকে গ্রহণ করা কারো জন্য বাঞ্ছনীয় (হালাল) নয়।’^{৬৩২}

যারা সূত্র (দলিল) জানে না, তাদের সম্পর্কে যদি ইমাম আবু হানিফাহ (রহঃ) এই কথা বলে থাকেন, তা’হলে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বিধান হবে, যে দলিল জানে এবং তা তাঁর (ইমাম আবু হানিফাহ) বক্তব্যের বিপরীত? তাঁর বক্তব্য দলিলের বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি বিচার-বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফাহ (রহঃ) বলেছেন, ‘আমি যখন কিছু বলি, তা যদি মহান আল্লাহর কিতাব বা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তোমরা আমার বক্তব্যকে অগ্রাহ্য কর।’^{৬৩৩}

২: ইমাম মালিক ইবন আনাস (রহঃ) : ‘সত্যিকার অর্থে, আমি মরণশীল; আমি ভুল করি (কখনও কখনও) এবং আমি ঠিক বলি (কখনও কখনও)। সুতরাং, আমার মতামতের প্রতি লক্ষ্য কর, যা কিছু কুর’আন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা গ্রহণ কর, আর যা কিছু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা বর্জন কর।’^{৬৩৪} ‘রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পরে যারা আসবে, তাদের প্রত্যেকেরই কিছু কথা হবে গ্রহণযোগ্য,

আর কিছু কথা হবে বাতিলযোগ্য, শুধুমাত্র রাসুল (সাঃ) এর বাণী ব্যতীত।’^{৬৩৫}

৩: ইমাম শাফিঈ (রহঃ) : ‘যদি কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, সেটাই আমার মাযহাব।’^{৬৩৬} ‘প্রতিটি বিষয়ে, বর্ণনাকারী যদি সহীহ সনদে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কিছু পায়, যা আমার বক্তব্যের বিপরীত, সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার যোগ্য, তা আমার জীবিতকালে হোক বা মরণের পরে।’^{৬৩৭} ‘রাসুলুল্লাহ

- ৬৩১। ইবন আব্বাসী ‘আল-হাশিয়াহ’তে (১/৬৩), শাইখ সা’লিহ আল-ফুলা’নী ‘ঈক্বায আল-হিমানি’ (পৃষ্ঠা-৬২) তে এবং অন্যান্য বর্ণনা।
 ৬৩২। ইবন আব্দুল বার ‘আল-ইনতিক্বা’আ আহ-ছালাছাহ আল-আইম্বাহ আল-ফুকাহা’ (পৃষ্ঠা-১৪৫) তে, ইবনুল ক্বাইয়িম ‘আল-মুক্দি ইন’এ (২/৩০৯)।
 ৬৩৩। আল-ফুলা’নী ‘ঈক্বা’য আল-হিমানি’ (পৃষ্ঠা-৫০) তে বর্ণনা করেছেন।
 ৬৩৪। ইবন আব্দুল বার ‘জামী বাইয়ান আল-ইলম (২/৩২)’ এ বর্ণনা করেছেন।
 ৬৩৫। ইবন আব্দুল হাদী ‘ইরশাদ আস-সালিক (২২৭/১)’ এ সহীহ ঘোষণা করেছেন, ইবন হাযাম উসুল আল-আহকাম (৬/১৪৫, ১৭৯) এ, আবু দাউদ, ইমাম আহমাদ-এর ‘মাসাইল (পৃষ্ঠা-২৭৬)’ এ বলেছেন।
 ৬৩৬। নাব্বী ‘আল-মাজমুউ (১/৬৩)’ তে বর্ণনা করেছেন, শা’রা’ আনী (১/৫৭) হাকিম, বাইহাক্বি এবং ফুলা’নীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
 ৬৩৭। আবু নুরাইম (৯/১০৭), হারাবী (৪৭/১), ইবনুল ক্বাইয়িম ‘ঈশাম আল-মুওয়াক্কিঈন (২/৩৬৩)’ এ বর্ণনা করেছেন এবং ফুলা’নী (পৃষ্ঠা-১০৪)।

(সাঃ) থেকে সহীহ সনদে পাওয়া প্রতিটি বাণীই আমারও মতাদর্শ, যদি তা আমার নিকট থেকে নাও শুনে থাকে।^{৬৩৮}

৪ : ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহঃ) : ‘আমার মতাদর্শ অনুসরণ করোনা; এমনকি মালিক, শাফিঈ, আওয়াঈ অথবা সাওরী, কারো মতাদর্শই অনুসরণ করো না। যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তুমিও সেখান থেকেই গ্রহণ কর।’^{৬৩৯} ‘যদি কেউ আব্বাহুর রাসুল (সাঃ) এর বাণী অবজ্ঞা করে, সে ধ্বংসের মুখোমুখি।’^{৬৪০}

এছাড়া, তাক্বলীদের ধারণা ইঙ্গিত করে যে, শুধুমাত্র চার ইমামেরই ইজ্জতিহাদের অধিকার আছে, এবং পরবর্তী প্রজন্মের লোক, সে ধর্মীয় পন্ডিতই হোক, অথবা সাধারণ লোক, তাদেরকে অবশ্যই ইমামগণের তাক্বলীদ করতে হবে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ইমামগণ তাক্বলীদ করার তাগিদ দেননি। সুতরাং, মুকাল্লিদগণেরও তাক্বলীদ করার জন্য তাগিদ দেয়া বা শর্তারোপ করা উচিত নয়। তাক্বলীদ, পরবর্তী প্রজন্মকে ইজ্জতিহাদ করা থেকে নিবৃত্ত করেছে, এমন কি, কোন সামান্য বিষয়েও নয়। তা’হলে, পরবর্তী মুকাল্লিদগণ কি করে মাযহাবের তাক্বলীদ করা ফারজ এবং ঈমানের অংশ বলে ঘোষণা করার মত এতবড় ইজ্জতিহাদ করলেন? বিস্ময়ের বিষয় যে, এতবড় ইজ্জতিহাদ করার পরও হানাফীগণ কি করে ঘোষণা করেন যে, চতুর্থ শতাব্দীর পর ইজ্জতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে?

পরিশেষে, যেহেতু, পরবর্তী প্রজন্মের ইজ্জতিহাদের অধিকার নেই, তখন কিসের উপর ভিত্তি করে ইজ্জমা গঠন হলো; এবং সেই ইজ্জমা তাক্বলীদের আলোকে কি করে বৈধতা পেলো?

দেওবন্দিগণের চরম তাক্বলীদ

১ : তাক্বলীদকে ঈমানের অংশ দাবী করা। তাক্বলীদের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করে দেওবন্দিগণ এটাকে ঈমানের অংশ বানিয়ে ফেলেছেন। তারা বলেন, ‘ঈমান রক্ষার্থে তাক্বলীদে বিশ্বাস করা অবশ্য কর্তব্য। তাক্বলীদ ব্যতীত কেউ ঈমান এবং ইসলামের সত্যিকারের বুঝ পেতে পারে না’^{৬৪১}।

৬৩৮। ইবন আব্বি হাতিম (পৃষ্ঠা : ৯৩-৯৪)।

৬৩৯। ফুলা’নী (পৃষ্ঠাঃ ১১৩) এবং ইবন আল-ক্বাইয়িম ‘ঈলা’মে আল-মুওয়াত্ত্বাঈন (২/৩০২)’।

৬৪০। ইবন আল-জাওয়াযী (পৃষ্ঠা-১৮২)।

৬৪১। কিতাবুল-ঈমান (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-৭২।

‘এই চার মায্হাবের বাইরে সুন্নাহ্ ও পথ নির্দেশের জন্য যদি কেউ সত্যের অনুসন্ধান করে, তবে, সে অবশ্যই ক্রমান্বয়ে ভ্রান্ত পথের দিকে অগ্রসর হবে এবং ঈমানের ক্ষতি করবে’^{৬৪২}।

ঈমান (বিশ্বাস) ইসলামের মূল ভিত্তি, এর অঙ্গীভূত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি এও ব্যাখ্যা করেছেন, কি কি ঈমানের অন্তর্গত, আর কি কি ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক, ঈমানের কি কি শাখা আছে, ও কি কি কাজ ঈমান বৃদ্ধি করে এবং ঈমান হ্রাস করে।

ঈমান পূর্ণতার শর্তগুলো, সাহাবী এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে বিচার দিবস পর্যন্ত সবার জন্যই এক, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং, কোন কাজ ঈমানের উপর প্রভাব ফেলে, এই দাবী প্রমাণ করার জন্য, কুর’আন ও সুন্নাহ্ থেকে পরিস্কার ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন। লোকজনের প্রতি অযাচিত শর্ত প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহ্ কাউকেই প্রদান করেন নি। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন শর্ত, যা আল্লাহর কিতাবে (আইন) নেই, তা বাতিলযোগ্য, যদি একশত শর্তও থাকে’।^{৬৪৩}

২: মায্হাব অনুযায়ী হাদীসের বুঝ। যদিও দেওবন্দিগণ দাবী করেন, যে সকল বিষয়ে কুর’আন ও হাদীসে পরিস্কারভাবে বলা আছে, সে সকল বিষয়ে কিয়াস ও ইজ্জাহাদের কোন প্রয়োজন নেই,^{৬৪৪} – কিন্তু, তাঁদের কার্যাবলী এর পুরোপুরি উল্টো।

মাওলানা যাকারিয়াহ্ তাঁর আত্ম-জীবনী গ্রন্থ ‘আপ বার্তে’তে বলেন, ‘আমি আগেই বলেছি, আমার পিতার শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিলো অনুপম। অনুবাদ ব্যতীত তিনি পুরো মিশ্কাতে শিক্ষা দিতেন। তিনি অনুবাদ বলতেন, যখন তাঁকে তা বলতে অনুরোধ করা হতো; আর পরীক্ষা করার জন্য, তিনিই হাদীসের অনুবাদ জিজ্ঞাসা করতেন। মাযাহির হাফ্ফ (মাদ্রাসা) এর কোন ছাত্রের অনুবাদ খোঁজ করা ছিলো

বিরাট অপরাধ। হিহা’হর কিতাবগুলো থেকে মিশ্কাতে যে হাদীসগুলো এসেছে, তা বের করার জন্য ‘তাহাবী’ এবং ‘হিদায়াহ্’ দেখার প্রয়োজন হতো। হাদীস বিচার-বিবেচনা করে, তা হানাফী মায্হাবের পক্ষে না বিপক্ষে, এটা নিরূপণ করার জন্য এই কাজগুলো করার প্রয়োজন হতো। যদি কোন হাদীস, হানাফী মায্হাবের বিপক্ষে হতো, তবে, আমার কাজ, হানাফীদের পক্ষ থেকে যুক্তি-তর্ক উত্থাপনের মাধ্যমে ঐ হাদীসটির উত্তর প্রদান করা। যেহেতু, হিদায়াহ্ ও তার পাদটীকা নিরীক্ষণ করার

৬৪২। কিতাবুল-ঈমান (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-৭২।

৬৪৩। সহীহ্ আল-বুখারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২০৯, হাদীস নং-৩৭৭।

৬৪৪। দেখুন *The Sharee'ah Role of Taqleed—by Jamiatul Ulama of South Africa*.

সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো, কাজেই, আমার মনে পড়ে না যে, হানাফীদের বিপক্ষে এমন কোন মাস'য়ালা আছে, যার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করা হয় নি।^{৬৪৫}

এখানে আমরা দেখছি, ফাজায়েল-ই-আ'মালের গ্রন্থাকার হানাফী মায্হাবের দেওবন্দি সংস্করণ, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর কথা, কাজ ও সমর্থন অনুযায়ী আছে কিনা তা পরীক্ষা করার বদলে, হানাফী মায্হাবের বিরুদ্ধে কোন হাদীস আছে কি না, তাই নিরূপণ করেছেন। তা ছাড়া, তিনি (মাওঃ যাকারিয়াহ) নির্বিকার-নির্ণঙ্কভাবে স্বীকার করেছেন, পরম সত্যবাদী আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর কোন কথা তাঁর মায্হাবের বিপক্ষে গেলে, তা খণ্ডন করার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

৩ : মায্হাব প্রীতির কারণে দুর্বল দলিলের প্রতি অনুরাগ। মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি, 'আদান-প্রদান' সংক্রান্ত এক ফিকাহুর বিষয়ে এক রিসালা, যাকে 'তাক্বীর-ই-তিরমিযি' বলা হয়, এতে বলেন- '..... এ বিষয়ে ন্যায্যতা হচ্ছে, ইমাম শাফি'ঈর মত বেশী ওজনদার। কিন্তু, যেহেতু, আমরা মুকাদ্দিদ, কাজেই, আমাদের অবশ্য করণীয় হলো, ইমাম আবু হানিফাহকে অনুসরণ করা।'^{৬৪৬} এই দৃষ্টান্ত গৌড়া অন্ধ-অনুসরণকারীদের জন্য একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। যদি তারা অনুধাবনও করেন যে, অন্য ইমামগণের রায় অধিক নিখুঁত এবং প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত; তারপরও, তাঁরা নিজেদের মায্হাব আঁকড়ে থাকেন; এবং যদি তাঁদের ক্ষমতা থাকে, তবে অন্যদেরকে বাধ্য করেন তাঁদেরকে অনুসরণ করতে, অথবা 'ঈমান নষ্ট হবে'- এই ভয় দেখিয়ে মায্হাবের ভুল ফাতোয়া অনুসরণ করতে প্রভাবিত করেন।

৪ : ইমাম কি ভুল করতে পারেন? আল্লাহ বলেন, "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট তো প্রত্যাবর্তন।"^{৬৪৭}

৬৪৫। 'আপ বাতৈ', মাওলানা যাকারিয়াহ (পৃষ্ঠা-২৯)। আবু আল-হাসান আল-কার্বখী যা বলেছিলেন, এটি একই রকম কথা, 'আমাদের লোকেরা (হানাফী মায্হাব অনুসরণকারী) যা বলে, তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সব আয়াতই নাস্ব (বাতিলযোগ্য), অথবা অর্থের পরিবর্তনযোগ্য (হানাফীরা যা বলে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে)। প্রতিটি হাদীস (হানাফীরা যা বলে তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ) এর জন্যও একই কাজ করতে হবে, অর্থাৎ, হয় বাতিল, নতুবা, পরিবর্তন করতে হবে। (আল-কার্বখী, রিসালাহু আল-কারখী; আল-মাক্তাবা আল-আরাবিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৮৪-৮৫।)

৬৪৬। তাক্বীর-ই-তিরমিযি, পৃষ্ঠাঃ ৩৯-৪০।

৬৪৭। সূরাহ লুগ্মান (৩১ঃ ১১)।

শাব্বির আহমাদ উসমানী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিতদের মতে বাচ্চাদের দুধ ছাড়ানোর বয়স দুই বৎসর। আর ইমাম আবু হানিফাহ্ যে আড়াই বৎসর বলেছেন, তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।’^{৬৪৮}

কুর’আনের এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বাচ্চাদের দুধ ছাড়ানোর বয়স দুই বৎসর। শাব্বির আহমাদ উসমানীর মতে, অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিতগণই কুর’আনের এই আয়াতের দৃশ্যমান অর্থের সাথে একমত হয়েছেন। ইমাম আবু হানিফাহ্‌র এই আড়াই বৎসরের বিতর্কিত মতের কারণ শাব্বির আহমাদ উসমানী নিজেও জানেননা। অন্যত্র, সূরা আহক্বাফের ১৫ নং আয়াত এবং সূরা বাকারাহ্‌র ২৩৩ নং আয়াতের^{৬৪৯} ব্যাখ্যায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ফাতোয়াই বিস্তৃততম; অর্থাৎ, দুই বৎসর। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও তিনি বলেন, ‘ইমাম আবু হানিফাহ্‌ যে আড়াই বৎসর বলেছেন, তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।’ ইমাম যে ভুল করতে পারেন, বা হাদীস সামনে না থাকার কারণে নিজের ব্যক্তিগত মত অনুসারে ফাতোয়া দিতে পারেন, এটা দেওবন্দিগণের নিকট বিরক্তিকর। তাঁরা মনে করেন, এরকম ঘটনা ঘটা অসম্ভব, যদিও তাঁরা স্বচক্ষে এর বিপরীত অকাট্য প্রমাণ দেখেন। অনেক প্রমাণ আছে যে, অন্যান্য তিন মায়্‌হাবের ফাতোয়া, কুর’আন ও সুন্নাহ্‌র সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

৫ : ইমামকে রক্ষা করার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন : মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাজ্জায়েল-ই-আ’মালে (সাহাবীদের কাহিনী) বর্ণনা করেন যে, আবু বাক্বর সিদ্দিক (রাঃ) পাঁচশত হাদীসের সংগ্রহ সংকলন পুড়িয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, এটা করেছিলেন এই সাবধানতার জন্য যে, আবু বাক্বর সিদ্দিক (রাঃ) এর মাধ্যমে যেন কোন গায়ের সহীহ্ হাদীস বর্ণিত না হয়। এই বক্তব্যের আড়ালে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ইমাম আবু হানিফাহ্‌কে আগলে রাখার চেষ্টা করেন যে, উপরোক্ত কারণেই, ইমাম কর্তৃক খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই কারণেই ইমাম আবু হানিফাহ্‌ হাদীস বর্ণনায় উদার ছিলেন না।’

মাওলানা যাকারিয়াহ্ এই বর্ণনাটি ‘তায়কিরাতুল-হুফফাজ’ থেকে গ্রহণ করেছেন, যা তিনি ফাজ্জায়েল-ই-আ’মাল-এর হিন্দি ও উর্দু অনুবাদে উদ্ধৃত করেছেন। যাহোক, ‘তায়কিরাতুল-হুফফাজ’ এর লেখক এই বর্ণনাটিকে মন্তব্যে ভিত্তিহীন বলেছেন এই জন্য যে, এর সনদে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু, মাওলানা যাকারিয়াহ্

৬৪৮। তায়সীর-ই-উসমানী (ইংরেজী অনুবাদ), ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯৭।

৬৪৯। শাব্বির আহমাদ উসমানী কৃত তায়সীর-ই-উসমানীতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

ইচ্ছাকৃতভাবে এই মন্তব্যটি উল্লেখ করেননি।^{৬৫০} এসব বর্ণনা থেকেই বুঝা যায়, যারা হাদীসকে অবজ্ঞা করেন, তারা কিভাবে হাদীস বর্ণনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়েও সাধারণ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। মাওলানা যাকারিয়াহ ফাজায়েল-ই-আ'মাল-এ তাঁর অজ্ঞ জামা'য়াত কে কি করে (সত্য আড়ালে রেখে) এই সাংঘাতিক ধরণের সন্দেহ (যা, বাস্তবে মনে করেন, 'নিঃসন্দেহ') এর মুখোমুখি করেছেন? এ থেকে দেওবন্দিগণের মনোভাব বুঝা যায় যে, তাঁদের ইমামকে বাঁচাতে তাঁরা যে কোন পর্যায়ে যেতে পারেন, যদিও, তাতে আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর হাদীস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, এখানে আমরা আরো অসঙ্গতি দেখছি। দেওবন্দিগণ দাবী করেন, ইমাম আবু হানিফাহ্ প্রতিটি ফাতোয়াই হাদীসের আলোকে নির্ধারণ করেছেন। আবার বলেন, তিনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন নি! (স্ব-বিরোধীতা নয় কি?- অনুবাদক।)

তাঁদের দাবী অনুসারে, হয় ইমাম বেশী হাদীস জানা সত্ত্বেও বর্ণনা না করে জ্ঞান গোপন করার মহাপাপে পাপী (নাউয়িব্লাহ....); অথবা, সন্দেহমুক্ত নন, এরকম জ্ঞানের ভিত্তিতে ফাতোয়া দিয়েও পাপ করেছেন। নিঃসন্দেহে, এর একটিও ঠিক নয়। ঠিক তাই যে, তিনি হাদীস না পেয়ে ক্বিয়াস ও ইজ্‌তিহাদের দিকে ঝুঁকেছেন, এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'যখন আমি কিছু বলি, তা যদি সর্বোচ্চ প্রশংসিত আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহর পরিপন্থী হয়, তবে আমারটা প্রত্যাখ্যান করো।'^{৬৫১} কাজেই দেওবন্দিগণ যে দাবী করেন, তাঁদের মায়হাবের প্রতিটি ফাতোয়াই সহীহ হাদীসের আলোকে প্রণীত, এটা তাঁদের অতিরঞ্জনের ফসল।

এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে দেখা যায়, দেওবন্দিগণ চরম তাক্বলীদবাদী। যে ইমামগণ শিখিয়েছেন, কুর'আন ও আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ সবার উপরে; সেখানে দেওবন্দিগণের পথ, ইমামগণের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

তাক্বলীদ, ইত্তিবার বিপরীতধর্মী একটি মতবাদ

উপরোল্লিখিত চরম তাক্বলীদ ও এর শর্তাবলীর আলোকে, ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট হাদীস বিশারদগণ স্বতঃস্ফূর্ত ও অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাক্বলীদের নিন্দা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, এই মতবাদ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহর সমান্তরাল

৬৫০। তায়কিরাতুল হুফাজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫ : আবু বাক্বর সিদ্দিক (রাঃ) সম্পর্কিত এই বর্ণনাটিতে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে, এর সনদে আলী বিন সালিহ নামে এক অজ্ঞাত (মাব্বুল) রাবী রয়েছে (তাক্বরীব)। মুহাম্মদ ইব্বন মুসা নামে আর এক রাবী আছেন, যিনি বিশ্বাসযোগ্য নন (লিসা'নুল-মি'যান) এবং তৃতীয় রাবী মুসা ইব্বন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রাঃ) 'ফিহি নাজার' (তাঁর সম্পর্কে (কু) মতব্য আছে) বলেছেন।

৬৫১। 'ইক্বা'য আল-হিমানী'তে আল-ফুয়ানী (পৃষ্ঠা-৫০)।

(অর্থাৎ, তাক্বলীদ যেন আরেক ধীন) এবং অগ্রহণযোগ্য। পৃথিবীর এই অঞ্চলে তাক্বলীদ একটি অপ্রতিরোধ্য মতবাদ, অর্থাৎ, একজন ইমামের মাযহাবের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও গোঁড়ামি করা; যদিও ইমাম ভুল করে থাকেন, অথবা যদিও তাঁর ইজ্‌তিহাদ আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহর পরিপন্থিও হয়। এ অঞ্চলে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহর পাকিত্ব ও জ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে ইমামগণের মাযহাবকে ধরে রাখার জন্য। মাযহাবকে পরিশুদ্ধ করা, বা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ সম্মুখ বা বিস্তারের জন্য নয়।

সাল্‌ফে-সালেহীন বা কুর'আন হাদীসে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, তা ভারত উপমহাদেশেরই হোক বা অন্য কোন অঞ্চলের, তাঁরা ইমামগণের শিক্ষাকে বাতিল করেননা, বা তাঁদের অসম্মান করেননা; যা নাকি, দেওবন্দিগণ অভিযোগ করে থাকেন। বরঞ্চ, চার ইমামসহ আহ্‌লে-সুন্নাহর সব জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে সম্মান করেন, এবং তাঁদের জ্ঞান থেকে উপকার পেতে চেষ্টা করেন। একমাত্র দেওবন্দিগণ একই ইমামের সাথে সংযুক্ত সব জ্ঞানী ব্যক্তি, ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসগণের ফাতোয়া ও ইজ্‌তিহাদ বাতিল ঘোষণা করেন, এবং আ'মল করার অনুমোদন দেননা; যদিবা, কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলো তাঁদের জন্য উপযোগীও হয়।

তাক্বলীদের উপর ফাতোয়া বা নিয়ন্ত্রণ, অবস্থার উপর নির্ভরশীল

তাক্বলীদের অনুমোদন সম্পর্কে সালাফদের অনেক বক্তব্য আছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, 'তাক্বলীদ' জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়ার অভ্যাসকে অনুমোদন দেয়; কিন্তু, বিভ্রান্তি মিশ্রিত বিশ্বাস নিয়ে মাযহাবের অন্ধ অনুসরণকে অনুমোদন দেয়না। সাধারণ নিয়মানুসারে জনসাধারণ, যাদের ধর্মের উপর ভালো জ্ঞান আছে, তাঁদের মতামত জানার জন্য তাঁদের দ্বারস্থ হবে এবং সেগুলো আ'মল করবে; যদিও মতামতের পিছনের সব যুক্তি-প্রমাণ পুরোপুরি তাদের বুঝে না ও আসে। অপ্রত্যাশিত পথে না গিয়ে, এটাই সাধারণ মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় ও পছন্দসই পন্থা। কিন্তু, যে জাতির আম মুসলিমগণের অধিকাংশ স্থাপনা ও তাদের নেতাগণ নরকাগ্নির দরজার দিকে আহ্বানকারী হয় এবং সাহাবীগণ কুর'আন ও সুন্নাহকে যেভাবে বুঝেছিলেন, সেই বুঝের লোক স্বল্প সংখ্যক হয়; আর ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করেনা, তাদের জন্য তাক্বলীদ অনুমোদিত হতে পারে; যা জনসাধারণকে নানা রকম ছল-ছুতায় ভুলিয়ে শির্ক ও বিদ'আহর পথে আটকিয়ে রাখতে পারে (কিন্তু, তাক্বলীদ যারা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের আকাংখা এমন ছিল না)।

প্রথমতঃ একজনকে ইমামের তাক্বলীদ করতে হলে, এমন এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে, যিনি ইমাম আবু হানিফাহ্ অথবা ইমাম শাফি'ঈকে আক্বীদাহ্য়, ফিকাহ্য় এবং ধর্মের অন্যান্য নীতিগত বিষয়ে পুরোপুরি অনুসরণ করেন। কিন্তু, এটি একটি অবলুপ্ত ধারণা। এখন এমন একজনকে খুঁজে বের করুন, যাকে লোকেরা অত্যন্ত সম্মান করে, যিনি হানাফী ফিকাহ্‌র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে যদি মিথ্যাও বলতে হয়, তবুও, তাঁর মায্‌হাবকে রক্ষা করেন। একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করেন, 'যিনি কুরসীর উপর বসেছিলেন আল্লাহ্‌ হয়ে, মুস্তাফা (আল্লাহ্‌র রাসুল সাঃ) রূপে দুনিয়ায় অবতরণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্‌ পা পিছলে নরকাগ্নিতে পড়ে গিয়েছিলেন প্রায় (নাউযুবিল্লাহ্‌), যদি তাঁকে বাঁচাবার জন্য আব্দুল ক্বাদির জিলানী সেখানে উপস্থিত না হতেন। আরও যদি তিনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্‌ ক্ষমতাশূন্য এবং তাঁর সমস্ত ক্ষমতা রাসুল (সাঃ) ও সূফি সাধকগণকে বন্টন করে দিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ্‌ মিন যালিক)।

যাঁরা নিজেদেরকে ইমামগণের মুকাল্লিদ বলে দাবী করেন, তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের (ইমামগণের) ফিকাহ্‌ অনুসরণ করেন। মুসলিমগণকে একত্রিত করার জন্য তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছামত পথ বের করে নেন এবং শিয়াদের শাস্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন সাহাবার সমালোচনা করেন। তাঁরা হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ করতঃ নিজস্ব কায়দায় নুতন নীতি বিধিবদ্ধ করেন। তারপর, তাঁদের বিকৃত মানসিকতায় যে হাদীসগুলো মায্‌হাব বিরোধী মনে করেন, ঐগুলোকে বাতিল করে দেন বা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। গোপনে সুন্নাহ্‌র কার্যকারিতা ও গুরুত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেন, আর সালাহ্‌ সম্পর্কিত তাদের নিজস্ব ফিকাহ্‌গুলোকে সামনে তুলে ধরেন।

আমরা দেওবন্দি ও তাবলীগ জামা'য়াতীগণের বিশ্বাস ও শর্তযুক্ত তাক্বলীদ দেখেছি। এই গ্রন্থে আমরা তাবলীগ জামা'য়াতের অলিখিত কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই লিখিনি। অজ্ঞতা সত্ত্বেও গর্ববোধ করা, হাদীস বর্ণনায় খোলামেলা ও অনুমোদিত অসাবধানতা, ফাজায়েল-ই-আ'মালের প্রতি চরম আসক্তি, দেওবন্দি পীর-মাশায়েখ্‌দের বন্দনা বা পূজা, তাদের জামা'য়াত এর কার্যপদ্ধতি ও মুরুব্বীদের ফাযিলাত বর্ণনায় অতিরঞ্জন, ইত্যাদি, তাদের এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

আর, কিছু লোক আছেন, যারা মায্‌হাব বাদ দেয়ার চরম বিরোধীতা করেন এবং বলে থাকেন, কুর'আনই যথেষ্ট, হাদীস তো পঁচে যাওয়া ইতিহাস মাত্র।

এরপর, আছেন প্রগতিবাদী হানাফী, যাঁরা রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর মু'জেযা এবং আউলিয়াদের কারামাতকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা নিজেদের বিশ্বাসের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কুর'আনের তরজমায় অর্থের পরিবর্তন ঘটান এবং ইসলামের সৃষ্টি

সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের সেতুবন্ধ রচনার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আরো অনেক দল, উপ-দল আছে, যারা ইমামগণের তাক্বলীদের দাবী করেন; অথচ, প্রকারান্তরে, তাঁদের নিজেদের তাক্বলীদ করার জন্য লোকজনকে প্রভাবিত করে।

দেওবন্দি-বেরেল্‌ভীগণের বিবাদ থেকে শিক্ষা

বিগত শতাব্দীতে দু'টি বড় হানাহী দলের বিবাদ অনেক অসুবিধা ও অরাজকতার সৃষ্টি করেছিলো। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরূপ ফল প্রতিটি এলাকা, অলি গলি এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দুই বিবাদমান দলের যুদ্ধংদেহী মনোভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, তাঁদের পরস্পরের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং সে সময়ে সংঘর্ষে প্রচুর রক্তপাত ও জীবনহানি ঘটেছিলো।

এরপর, অনেক বছর ধরে বেরেল্‌ভীগণ মাযার ও মাদ্রাসা নিয়েই ব্যস্ত ছিলো এবং তাঁদের অনুসারীদের দাওয়াতী কাজের জন্য চলাফিরা প্রায় বন্ধই ছিলো। দেওবন্দিগণের দ্বিমুখী নীতির জন্য তাঁদের প্রতি বেরেল্‌ভীগণ অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো; যেমন-আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, এটা অস্বীকার করা, অথচ, তাঁদের আলিম ও দরবেশগণের জন্য তার অনুমোদন দেয়া। ‘খতমে নাবুয়াত’ নিয়েও বেরেল্‌ভীগণ দেওবন্দিগণের সমালোচনা করেন। তাঁদের মাঝে বিভক্তি ও রেষারেষির সূত্রপাত এখান থেকেই।

তাবলীগ জামা'য়াতকে ঠেকাবার জন্য ইদানিং বেরেল্‌ভীগণও দাওয়াতী বিভাগ চালু করেছেন। দেওবন্দিগণের আছে ‘ফাজায়েল-ই-আ'মাল’ আর বেরেল্‌ভীগণের দাওয়াতের বইয়ের নাম ‘ফাইজান-ই-সুন্নাহ’।

দেওবন্দিগণের সমালোচনার ভিত্তি হলো, বেরেল্‌ভীগণ প্রকাশ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু (যেমন, পীর-আউলিয়াদের মাযার পূজা) ইবাদাহুতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা সত্য যে, মাযারের খাদেমদের সাহায্য সহযোগিতায়, হিন্দুয়ানী আচার অনুষ্ঠান, অজ্ঞাত বস্তুর প্রতি যুক্তিহীন ভক্তি এবং লাম্পট্য অবাধ গতিতে চলে।

দেওবন্দিগণের দাওয়াতী শাখা, ‘তাবলীগ জামা'য়াত’ এই বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে বিরত থাকে। বিতর্কিত বিষয়, যেগুলো সাধারণ মানুষ (যারা মাযার আউলিয়াহু-দরবেশগণের পূজায় নিমগ্ন) এর মনে ক্রোধের সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলো তাঁরা পরিহার করেন। এফ্‌ন, তাঁদের দাওয়াতী কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো, শুধু, লোকজনকে

তাদের ফাজায়েল-ই-আ'মাল পাঠের মজলিশে অংশ গ্রহণ এবং নির্দিষ্ট একটা সময় তাবলীগ জামা'য়াতের সাথে কাটানোর জন্য ডাকা। সাধারণ লোকের আকীদাহ্ সংশোধন এবং দীনকে বুঝার ব্যাপারে এই জামা'য়াতের তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই। বরঞ্চ, তাঁদের অনুসারীদের বেশীর ভাগ লোক সত্যিকার বিশ্বাস (আকীদাহ্) সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে। একটা লোক যদি, সারা জীবনভর এই জামা'য়াতের সাথে থাকে, তবুও, সে তাওহীদ সম্পর্কে খুব অল্পই শিক্ষা পায়। কিন্তু, সুফিবাদের দীক্ষা এবং তাবলীগ জামা'য়াতের প্রতিষ্ঠাতাদের নির্ধারিত নীতির শিক্ষা তাকে অত্যন্ত ভালোভাবেই দেয়া হয়; আর এটার একমাত্র উদ্দেশ্য, লোকজন যাতে দেওবন্দিগণের অন্ধভাবে অনুসরণ করে।

অপর পক্ষে, বেরেল্‌ভীগণ, দেওবন্দি এবং তাবলীগ জামা'য়াতীগণকে প্রত্যাখ্যানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেওবন্দিগণ, বেরেল্‌ভীগণের সাথে এই দূরত্ব দূর করার জন্য কয়েক দফা চেষ্টা করেছেন। এর কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বেশীরভাগ মতদ্বৈততা খুবই সামান্য বিষয় নিয়ে, এবং সুফিবাদ প্রকৃতিগত দিক থেকে এর চেয়ে বড় মতপার্থক্যও দূর করার সুযোগ তৈরী করতে পারে।

দেওবন্দিগণ বেরেল্‌ভীগণের সাথে সেতুবন্ধ রচনার জন্য যে সব বই-পুস্তক লিখেছেন, তাতে অনেক কুর'আনের আয়াত ও হাদীস আছে। 'এগুলো সেই কুর'আন ও হাদীস,' যার বরাতে কাজ করতে বললে, তাঁরা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য বলে থাকেন, 'কুর'আন ও হাদীস আজকালকার লোকজনদের বোধগম্যতার বাইরে, এখন কার্যকর পন্থা হলো মুজ্তাহিদ ইমামগণের তাক্বীদ করা।' এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, দৃশ্যতঃ যদিও দেওবন্দি ও বেরেল্‌ভীগণ দাবী করেন যে, তাঁরা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন; কিন্তু তাঁদের মতভেদ দূর করার জন্য মাযহাব থেকে তাঁরা কিছুই খুঁজে পান না।

কোন বিষয়ের উপর সহীহ হাদীস খুঁজে না পেয়ে ইমাম আবু হানিফাহ্ নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে কোন ফাতোয়া দিতে পারেন, সাধারণ অবস্থায় দেওবন্দিগণ এটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। তাঁরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, ইমামের প্রতিটি ফাতোয়াই হাদীসের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং মুকাগ্গিদগণের জন্য অবশ্য পালনীয়। কিন্তু, এ ব্যাপারেও তাঁরা বেরেল্‌ভীগণের সাথে অনেক নমনীয়।

বেরেল্‌ভীগণ, তাঁদের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেজা খানকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন এবং দেওবন্দিগণকে কাম্বির ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে মুফতী মুহাম্মদ খলিল স্বাদয়ী তাঁর গ্রন্থ 'ইনকাশাফ-ই-হাক্ব' এ মন্তব্য করে বলেছেন, 'মুজ্তাহিদ ইমামগণের নিজস্ব মতের

উপর ভিত্তি করা ইজ্জতিহাদ যদি সিদ্ধ ধরে নেয়া না যায়, তবে ইজ্জতিহাদের অনুমোদন যার নেই, সেই মুকাল্লিদ আলিম কর্তৃক একজন মুসলিমকে কাফির ঘোষণা করাকে সিদ্ধ এবং চূড়ান্ত বলে কি করে ধরে নেয়া যায়?^{৬৫২}

তারপর, তাঁরা উভয় দলই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং সৎকর্মশীল লোকেরা ক্বাবরে জীবিত আছেন এবং ইহজগত সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন। তাঁরা উভয়েই একমত যে, মাঝে-মধ্যে রাসূল (সাঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন অথবা বেরেল্‌জীগণের মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। তাঁরা উভয় দলই তাঁদের মুক্‌ব্বী ও সুফি-দরবেশগণের ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন। এতদসত্ত্বেও, যখন তারা পরস্পরকে দলে ভিড়াবার জন্য ডাকেন, তাঁরা হানাফী মায্‌হাবেরও দোহাই দেননা, বা রাসূল (সাঃ) এর উপদেশও অনুসন্ধান করেননা, অথবা তাঁদের মুক্‌ব্বী ও শাইখগণকেও মধ্যস্থতা করার জন্য ডাকেননা। বরঞ্চ, তাঁরা কুর'আনের আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে পরস্পরকে ডেকে থাকেন; যদিও তাঁরা বিশ্বাস করেন, সরাসরি কুর'আন ও হাদীস থেকে কোন রায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবও নয়, এবং অনুমোদিতও নয়।

অন্ধ অনুসরণকারীগণ, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, একমাত্র কুর'আন ও সহীহ হাদীসই মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করে আল্লাহর সিরাতুল-মুস্তাক্বিম (সহজ সরল পথ) এর দিকে নিয়ে যেতে পারে। নাবী-রাসূলগণ ও সৎকর্মশীল লোকেরা বারযাখ্‌ জীবনে জীবিত, ইহলোকের জীবিতদের সম্পর্কে সচেতন, উপদেশ দিতে ও সাহায্য করতে পারেন; - সাধারণ লোকদের মাঝে এসব বিশ্বাস জন্মাবার জন্য দেওবন্দিগণ ভুল উদ্ধৃতি দিতে পারেন, ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারেন, কুর'আন ও সুন্নাহর লিখাকে বক্রপথে নিতে পারেন; - কিন্তু, ইনশা'আল্লাহু এমন এক সময় আসবে, যখন কোন কিতাব বা প্রমাণ ছাড়াই তাদের এই ধোঁকাবাজি সাধারণ লোকের নিকট উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

শেষ কথা (উপসংহার)

শরীয়াহর সমস্ত বিষয়াদিই সাধারণ লোকজন জানবে, এটা আশা করা যায় না। কিন্তু, প্রতিটি মুসলিমেরই ঈমান ও ইবাদাহ্‌ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং, সাধারণ লোকেরা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ থেকেই তাদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে এবং যারা সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেও কিছু অর্জন করবে। সমস্যাটা অবশ্য শুরু হয় এখান থেকেই, যখন একই বিষয়ে, একই অবস্থার

৬৫২। 'ইনকাশাক-ই-হাক্ক', মুফতী মুহাম্মাদ খলিল আহমাদ খান প্রণীত, প্রকাশক আছম ফারুক -ই-সুন্নাহ, বোম্বে, ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৯২।

পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আলিম বিভিন্ন ফাতোয়া দেন। আমরা জানি, কুর'আন ঐ বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলে, তাঁদের বক্তব্য সত্য নয়, তা মিথ্যা। এই ক্ষেত্রে সত্যপন্থী ইসলামী পন্থিতগণের কর্তব্য হলো, বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করে তাঁদের ভুল শুধরে দেয়া।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, যখন জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মায্‌হাব ও ইমামগণকে কুর'আন ও সুন্নাহর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন; এবং মায্‌হাব যদি কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধীও হয়, তবুও, লোকদেরকে মায্‌হাব অনুসরণ করার তাগিদ দেন। ফলে, মুসলিমগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। মহান করুণাময় আল্লাহ, এমতাবস্থায়, তাঁর দ্বীনকে বিভিন্ন মতবিরোধে ডুবতে বা মায্‌হাব রক্ষার্থে কুরবানীর খাসী হতে দিতে পারেন না। তাই, তিনি তাঁর সুন্নাহ (বিধান) রক্ষার্থে সংকর্মশীল জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেরণ করেন। যেমন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরাই (কুর'আন ও সুন্নাহর একনিষ্ট ধারক) এই ইল্মকে গ্রহণ করবেন, যাঁরা এ থেকে সীমা লংঘনকারীদের তাহরীফ (বিকৃতি/রদবদল), বাতিল লোকদের মিথ্যা আরোপ ও জাহিলী [(মুর্খ)দের তা'বীল (বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা)] দূর করবেন।' ^{৬৫৩} এই জ্ঞানী (আলিম) ব্যক্তিগণই দ্বীনকে পরিশুদ্ধ (দ্বীন থেকে বিদ'আহ ও অন্যান্য বিভ্রান্তিকর বিষয় অপসারণ) করবেন। সঠিক পথের অনুসন্ধানে যে সাধনা করবে, সে সঠিক পথ-নির্দেশের মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। কারণ, এই দ্বীনের সঠিক কার্যক্রম, রাতের আঁধারেও দিনের মত উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত।

তাক্বলীদের প্রতি আহ্বানের বাস্তবতা

দেওবন্দিগণের তাক্বলীদের প্রতি আহ্বান, বিভিন্ন জামা'আত ও দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা মাত্র। কুর'আন ও সুন্নাহ আদেশ-উপদেশ পরিপূর্ণ, তা থেকে বিতর্কিত বিষয়ের সমস্ত সমাধান পাওয়া যাবে এবং সত্যে পৌছা যাবে। তাঁদের ফিরুকাহুকে তাঁরা দ্বীনের অংশ হিসেবে গণ্য করে সাধারণ লোকের জন্য শর্ত হিসাবে আরোপ করেন, যার কোন ক্ষমতা আল্লাহ তাঁদেরকে দেন নি।

যখন দেওবন্দিগণ নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাক্বলীদ করেন, তখন তাঁরা তাক্বলীদকে ঈমানের অংশ, এবং মায্‌হাব পরিবর্তনকে হারাম গণ্য করার শর্ত প্রদান করে থাকেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছেন যে, ভারত উপমহাদেশে মুসলিমগণের একটা বিরাট অংশ দেওবন্দিগণের অথবা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বি কোন হানারফী দলের খপ্পরে পড়েছে। এই পন্থায় যুদ্ধের অর্ধেক জয় তাঁদের ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। ^{৬৫৩ক}

৬৫৩। বায়হাক্বীর সুন্নে মিশকাতে বর্ণিত হয়েছে। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন (হাদীস নং-২৪৮)।

৬৫৩ ক। অনুবাদকের সংযোজনঃ অনেকটা - 'A good begining is half of the battle' - প্রবাদের মত।

এখন শুধুমাত্র বাকী আছে, লোকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করা যে, একমাত্র দেওবন্দ মাদ্রাসাই সঠিক মাযহাবের অনুসারী। এই পরিপ্রেক্ষিতে, দেওবন্দিগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি হানাফীদের বিরুদ্ধে অনেক ‘ফতোয়া’ বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ‘কিতাবুল ইমান’ গ্রন্থে বেরেলুভীগণকে ক্বাবর পূজারী, সাধু-দরবেশ পূজারী ও বিদ’আহুতী এবং ‘জামা’আত-ই-ইসলামী’কে মাওদুদীবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদেরকে ইসলামের ছত্র-ছায়ায় ‘মিথ্যুক-ধার্মিক’ ও ‘বিপথগামী ফিরকাহ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি, দেওবন্দিগণ তাদের দেওবন্দ মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সু-খবরের পর সু-খবরের দাবী করেছেন, যা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী তার ‘আল-বারাহি আল-ক্বাতিয়া’ গ্রন্থে লিখেছেন। তিনি বলেন, “আমার মনে হয়, আল্লাহর নিকট দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রশংসিত আসন পেয়েছে; কারণ, অসংখ্য আলিম এখান থেকে পাশ করেছেন এবং জনসাধারণের অনেক কল্যাণ সাধন করেছেন। পরবর্তীকালে, এক মহান ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর দর্শন লাভ করে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখেছেন, রাসুল (সাঃ) উর্দুতে কথা বলছেন। মহান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘আপনি একজন আরব দেশীয় লোক, আপনি কি করে এই ভাষা জানলেন?’ তিনি {রাসুল (সাঃ)} বললেন, ‘যখন থেকে দেওবন্দ মাদ্রাসার আলিম-উলামাদের সাথে যোগাযোগ হয়, তখন থেকেই আমি এই ভাষা জানি।’ রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী মন্তব্য করেন, ‘এ থেকে আমরা এই মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারি’।^{৬৫৪}

পরিশেষে, তাদের ‘জামা’আত-ই-তাবলীগ’ নামে অতি উৎসাহী একটি দল আছে, যারা ফাজিলাত ও সৎকর্মের ছদ্মাবরণে দেওবন্দি ফিরকাহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

উপসংহারে, মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর সন্দেহজনক ও দ্ব্যর্থ বক্তব্যে দেওবন্দি ইমামগণের তাক্বলীদের দিকে আহ্বান করার অন্তরালের উদ্দেশ্যটি প্রকাশ পেয়েছে। মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী আগে অনেকবার বলেছেন, ‘মনোযোগ দিয়ে শোন, সত্য তাই, যা রাশীদ আহমাদের জিহ্বা থেকে বের হয়। আমি শপথ করে বলছি, আমি কিছুই না, কিন্তু, এ যুগে সৎপথ প্রাপ্তি এবং সফলতা নির্ভর করে, আমার ইত্তিবা (অনুসরণ) এর উপর।’^{৬৫৫}

৬৫৪। আল-বারাহি আল-ক্বাতিয়া, পৃষ্ঠা-৩০।

৬৫৫। তায়কিরাতু-রাশিদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭, প্রণেতা-আলিক ইলাহী মারাঠী।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ‘সুফিবাদ’ শব্দের উৎপত্তি :

পূর্বের যুগে ধার্মিক ও জ্ঞানী লোক, যাদের মধ্যে বিদ্বান এবং পূজারীও অন্তর্ভুক্ত; এদেরকে বলা হতো উপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ের লোকেরা ‘আস্-সুফিয়া (সুফি),’ ‘আল-ফুফ্ফারাহ্ (ফাফ্ফির),’ এই শব্দগুলি আবিষ্কার করেছিলো। ‘সূফ’ শব্দ থেকে ‘সুফিয়া’ নামটির উদ্ভব হয়েছিলো। ‘সূফ’ অর্থ পশম, সেই অর্থে ‘সুফিয়া’ হলো ‘পশমী কাপড় পরিহিত ব্যক্তি’।

দ্ব্যুৎপত্তির দিক থেকে এটিই সঠিক। এছাড়া, ‘সুফিয়া’ শব্দটির অন্যান্য উৎপত্তির উৎসগুলো ভ্রান্তিপূর্ণ। যেমন, বলা হয়ে থাকে, এর উৎপত্তি হয়েছিলো ‘সূফাহ্ ইব্ন য়ুস ইব্ন আ’দ ইব্ন তা’আবিকা’ নামে এক আরব উপজাতি থেকে, যারা ইবাদাহ্কারী এবং ধর্মপ্রাণ বলে পরিচিত ছিলো। অথবা, যে সব লোক মাসজিদ-ই-নববীর ‘আস্-সুফ্ফা’ নামক এলাকায় বসবাস করতো, অথবা ‘আস্-সাফা (পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা),’ অথবা ‘আস্-সুফওয়াহ্ (পবিত্রতম),’ অথবা ‘আস্-সফ (সারি)’ -অর্থাৎ, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর পিছনের সর্ব প্রথম সারি (কাতার)।

আসহাব আস-সুফ্ফা (সুফ্ফার বসবাসকারীগণ) :

‘আস্-সুফ্ফা’ মাসজিদ-ই-নববীর উত্তরাংশের নাম। হিবরতের সময় যারা প্রথমবার মদীনায় আসতো এবং যাদের কোন পরিচিত কেউ বা বন্ধু-বান্ধব না থাকতো, তাঁরা এখানে (আস্-সুফ্ফায়) আশ্রয় গ্রহণ করতো। যখন কেউ অন্য কোথাও থাকার জায়গা পেয়ে যেতো, তখন সে আস্-সুফ্ফা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতো। সুফ্ফায় বসবাসকারীরা বিভিন্ন গোত্র থেকে আসতো, এদের সংখ্যা কখনও বাড়তো, কখনও কমতো। তাদের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকতোনা, বা নির্দিষ্ট জ্ঞান নিয়েও কেউ আসতো না। এমনকি, এদের ভিতর এক ব্যক্তি ছিলো, যে ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার মূর্তাদ হয়ে গিয়েছিলো; আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে একদল আরব সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এরা ‘সুফ্ফায়’ বসবাস করতো, কিন্তু, মদীনায় আবহাওয়া তাদের শরীরের জন্য অনুকূল ছিলো না। তখন নাবী (সাঃ) তাদেরকে মেষ ও উটের পাল দেখাশুনার দায়িত্ব দিলেন এবং এগুলোর দুধ ও উটের মুত্র (ঔষধ হিসেবে) পান করার আদেশ

দিলেন। তারপর থেকে তারা মেঘ ও উটের পাল দেখাশুনা করতো এবং এগুলোর দুধ ও মুত্র পান করতো, এতে, তাদের শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেলো। একদিন তারা মেঘগুলো হত্যা করে উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেলো। আব্বাহর রাসুল (সাঃ) এর নিকট খবর পৌঁছার সাথে-সাথে তিনি তাদেরকে ধরে আনার জন্য কিছু লোক পাঠালেন। যখন তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হলো, রাসুল (সাঃ) তাদের হাত-পা কেটে, গরম লৌহ শলাকা দিয়ে চোখ ফুঁড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।^{৬৫৬} এ থেকে বুঝা যায় 'আস্-সুফ্ফা'য় সব রকমের লোকই বাস করতো।^{৬৫৭} এমনকি, সা'দ ইব্ন ওয়াক্কাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) এর মত অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমানদেরও বাসস্থান এটাই ছিলো। {শাইখুল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহর 'পরম করুণাময়ের প্রিয় এবং শয়তানের প্রিয়'-এর 'নির্ধারণী নীতি' বই থেকে উদ্ধৃত।}

পরিশিষ্ট ২ : নাবী (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ সম্পর্কিত হাদীস সমূহের যথার্থতা যাচাইঃ

মাওলানা যাকারিয়াহ ফাজায়েল-ই-হাজ্জ (পৃষ্ঠা-১২৬) এ বর্ণনা করেন, 'হযরত মোল্লা জামী শুধুমাত্র যিয়ারাহ {নাবী (সাঃ)} এর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি এই ভ্রমণে হাজ্জ অস্তর্ভুক্ত করেননি। এ যিয়ারাহ রাসুল (সাঃ) এর ভালোবাসাকে নিশ্চিত করে'।^{৬৫৮} তিনি (মাওলানা যাকারিয়াহ) তারপর, অনেকগুলো হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেগুলো বিখ্যাত হাদীস বিশারদগণ একবাক্যে, হয় 'যয়ীফ (দূর্বল)', অথবা 'মাউয় (জাল)' বলেছেন। আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদদের একজন, শাইখ নাসির উদ-দ্বীন আলবানী (রাঃ) তাঁর 'যয়ীফ ও জাল হাদীস' এর এক সংকলনে এগুলো বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে-^{৬৫৯}

৬৫৬। সহীহ আল-বুখারী (৭ম খন্ড, হাঃ নং-৫৯০ এবং ৪র্থ খন্ড, হাঃ নং-২৬১)।

৬৫৭। যারা আস্-সুফ্ফাতে আতিথেয়তা গ্রহণ করতো, ইমাম আব্দুর রাহমান সালমী তাদের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন।

৬৫৮। মুফতী লাজপুরীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'অমুকান্নিদ {যারা অন্ধভাবে কোন ইমামের তাক্বীদ বা অনুসরণ করেনা} দের মতে রাসুল (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহর উদ্দেশ্যে মদীনা ভ্রমণ করা জাযিয় নয়' যদি এটা সত্য হয়, দেওবন্দি উলেমাদের এ সম্পর্কে ধারণা কি?'

উত্তর : হ্যাঁ, অমুকান্নিদগণ রাসুল (সাঃ) এর পবিত্র ক্বাবর যিয়ারাহর উদ্দেশ্যে মদীনা ভ্রমণ করা জাযিয় মনে করেন না। দেওবন্দের উলেমাদের ধারণা সেরকম নয়। রাসুল (সাঃ) এর পবিত্র ক্বাবর যিয়ারাহ করা উত্তম কাজগুলির (আফজালুল-মুসতাহাবাত) অন্যতম, বরং ওয়াজিব। তারপর, তিনি আমেথার মাওলানা খলিল আহমাদ, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী এবং মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাসোহীর ফাতোয়ার উদ্ধৃতি দেন {ফাতোয়া রাহিমীয়াহ্ (ইং অনুঃ), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩ (কিতাবুল ইলম)}।

৬৫৯। সমস্ত দূর্বল যুক্তি-তর্ক ও হাদীস জালকরণের প্রথার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিসগণ প্রতিবাদ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহ তাঁদের একজন।

১ : ‘যে ব্যক্তি হাজ্জ সম্পাদন করার পর আমার ক্বাবর যিয়ারাহু করলো, সে যেন জীবিত কালেই আমার সাক্ষাৎ লাভ করলো।’^{৬৬০} {মাউয়ু (জাল)^{৬৬১}।}

শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহু (রঃ) এই প্রথা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, “পুত-পবিত্র রাসুল (সাঃ) এর প্রতি যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং জীবিতাবস্থায় তাঁকে দেখেছেন, তিনি সাহাবা হিসেবে পরিগণিত হবেন।^{৬৬২} তিনি যদি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান, তবে তিনি আরো বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গাল-মন্দ করো না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ওহদ পাহাড় সদৃশ স্বর্ণ ও (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, তবুও, আমার সাহাবীদের এক মুদ (এক সেরের অনুরূপ) কিংবা আধ মুদ পর্যন্তও পৌছতে পারবেনা (অর্থাৎ, নিয়াতের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠার কারণে ক্ষুদ্র দানও আল্লাহর দরবারে অধিকতর পছন্দনীয়)।’^{৬৬৩} তা’হলে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহু করে কিভাবে সাহাবীদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামা যায়? আর যেখানে ক্বাবর যিয়ারাহুকে মুসলিমদের কোন ইমামই ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেন নি, অথবা তাঁর {রাসুল (সাঃ)} ক্বাবর যিয়ারাহুর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ সম্পর্কে স্বর্গীয় কোন প্রত্যাদেশ ও নেই। এ রকম ভ্রমণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{৬৬৪}

২ : ‘যে আমার ক্বাবর যিয়ারাহু করে, তার জন্য আমার শাফা’য়াত করা ওয়াজিব হয়ে যায়।’^{৬৬৫} {মাউয়ু (জাল)^{৬৬৬}।}

৩ : ‘যে হাজ্জ সমাধা করে এবং আমার যিয়ারাহু আসে না, সে অন্যায় করে এবং আমার প্রতি যুলুম করে’।^{৬৬৭}

৬৬০। ফাজায়েল-ই-আ’মাল, ফাজায়েল-ই-হাজ্জ (ইংরেজী অনুবাদ), ৮ম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-১২৪ (নুতন সংস্করণ ১৯৮২, ধ্বনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৬৬১। সেখুন, নাসিরুদ্দীন আলবানীর ‘সিলসিলাতুল-আহাদীস আয-যায়ীফা ওয়াল-মউযুয়াহু’, হাদীস নং-৪৭। জালাল হাদীস সনাক্তকারী হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এই হাদীসের সনদে দুইজন রাবীকে দুর্বল ঘোষণা করেছেন। ইব্ন হাজার আত্-তাকুরীবে, আত্-তাবারানী, বাইহাক্বী এবং ইব্ন আদী এ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৬২। সহীহ আল-বুখারী (ইংরেজী অনুবাদ), ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১।

৬৬৩। সহীহ আল-বুখারী (৭/২৭-২৮), সহীহ মুসলিম (হাঃ নং ২৫৪১), সুনান আবু দাউদ (হাঃ নং ৪৬৫৮) এবং সুনান আত্-তিরমিযি (হাঃ নং ৩৮৬০)।

৬৬৪। শাইখুল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহু ‘কিতাব-উল-ওয়াসীলাহু’য় (ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা-১৩০।

৬৬৫। ফাজায়েল-ই-আ’মাল, ফাজায়েল-ই-হাজ্জ (ইংরেজী অনুবাদ), ৮ম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-১২৫ (নুতন সংস্করণ ১৯৮২, ধ্বনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৬৬৬। শাইখ-আলবানীর ‘যায়ীফা আল-জামী-আস-সাগীর (৫৬০৭)’ এবং ইরউ’আ আল-গালীল, ৪র্থ খন্ড, নং-১১২৮ দেখুন। এই হাদীসটি মুনকার (বাতিল কৃত), কারণ, এই হাদীসের সনদেও আগের হাদীসের দুই রাবী (৬৬১ নং টীকায় উল্লেখিত) উপস্থিত।

৬৬৭। ফাজায়েল-ই-আ’মাল, ফাজায়েল-ই-হাজ্জ (ইংরেজী অনুবাদ), ৮ম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-১২৮ (নুতন সংস্করণ ১৯৮২, ধ্বনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

{মাউয় (জাল)^{৬৬৮}।} আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপর অন্যায় ও যুলুম করা,- ইসলামে মহাপাপ হিসেবে গণ্য। এর অর্থ, যে হাজ্জ করতে আসে, কিন্তু, নাবী (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহ করে না, সে মহাপাপী। অন্যভাবে, নাবী (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহ করাও হাজ্জের মতই ফারয। কিন্তু, একথা কোন ইমাম বা ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিই এ পর্যন্ত বলেননি।

৪ : ‘কেউ যদি আমার ক্বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরুদ পাঠ করে, তা আমি নিজেই শুনি, আর যে দূরে থেকে দরুদ পাঠ করে, তা আমার কাছে পৌছে দেয়া হয়’।^{৬৬৯} {মাউয় (জাল)^{৬৭০} }।

সাইদ বিন মানসুরের বরাতে সুনানে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন {আলী (রাঃ) এর নাতি} লক্ষ্য করলেন, একব্যক্তি ঘন ঘন রাসুল (সাঃ) এর ক্বাবর যিয়ারাহ করতে আসে। তখন তিনি বললেন, “ওহে লোক! নিঃসন্দেহে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘আমার ক্বাবরকে ইবাদাহর স্থান বানিয়ে না, যেখান থেকেই আমার প্রতি সালাম পাঠাও, তা আমার কাছে পৌছে যাব’। কাজেই, তুমি আর স্পেনের একজন বাসিন্দা, সালাম পেশ করার ক্ষেত্রে সমান”।^{৬৭১}

৫ : ‘যে সওয়াব লাভের আশায় মদীনাতে আমার যিয়ারাহ করে, সে আমার দলভুক্ত এবং কিয়ামাহর দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো’।^{৬৭২} {যয়ীফ - (দূর্বল)^{৬৭৩} }। যয়ীফ (দূর্বল) তো আছেই, এর পরও এই হাদীসটি এবং এর পরের

৬৬৮। দেখুন, নাসিরুদ্দীন আলবানীর *সিলসিলাতিল-আহাদীস আয-যাঈফা ওয়াল-মাউযুয়াহ*, হাদীস নং ৪৫। সকল হাদীস বিশারদগণ তাদের বেশীরভাগ ‘যয়ীফ ও জাল হাদীসের’ সংকলনে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম আয-যাহাবী ‘আল-মীযানে (৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭)’ এবং আস-সাগকানী ‘আল-আহাদীস আল-মাউযুয়াহ (পৃষ্ঠা-৬)’ এ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আশ-শাওকানী তার বই ‘আল-ফাওয়ায়েজ আল-মাজমুয়াহ ফিল-আহাদীস আল-মাউযুয়াহ (পৃষ্ঠা-৪২)’ তে এবং আয-যারকাশী ও ইবনুল-যাওজীও উল্লেখ করেছেন।

৬৬৯। *ফাজায়েল-ই-আ’মাল*, *ফাজায়েল-ই-হাজ্জ* (ইং অনুঃ), ৮ম পরিচ্ছেদ (যিয়ারাহ-ই-মাদীনা), পৃঃ ১৩১, হাদীস নং-১১ (১৯৮২ খ্রীঃ এবং নতুন সংস্করণ, ধীন বুক ডিপো, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৬৭০। দেখুন ‘সিলসিলাতিল আহাদীস আয-যাঈফা ওয়াল মাউযুয়াহ’, হাদীস নং-২০৩। এই হাদীসটিকে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে। কারণ, এর সনদে আ’মাল বলে এক রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে, যিনি দুর্বল, এবং তার বর্ণনা শুধু গ্রহণ করা যাবে, যদি তার চেয়ে শক্তিশালী অন্য রাবী থেকে একই বর্ণনা পাওয়া যায়। একই রকম আর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান থেকে, কিন্তু, তিনি আ’মালের চেয়েও বেশী দুর্বল। হাদীস বিশারদগণের নিকট এই দুই জনের কারো বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান মিথ্যাক এবং ইমাম আল-আকাইলী মারওয়ানের বর্ণনা তাঁর বই ‘যোয়াফাহ’তে উল্লেখ করেছেন; বলেছেন, ‘আ’মাল বিশ্বাসযোগ্য নয় বিধায় তার বর্ণনাও গ্রহণ করা যায় না’। এই বর্ণনাটি ইবনুল-যাওজী তার বই ‘আল-মাউযুয়াহ’তেও উল্লেখ করেছেন।

৬৭১। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ *কিতাব-উল-ওয়াসীলাহ* (পৃষ্ঠা-১৩৬) এবং *‘আল-ইকুতীদা’* (পৃষ্ঠাঃ ১৫৫-১৫৬) তে উল্লেখ করেছেন। শাইখ নাসির উদ্দীন আলবানী *‘আহকামুল-জানায়িয’*, পৃষ্ঠা-২৮০ তে উল্লেখ করেছেন।

৬৭২। *ফাজায়েল-ই-আ’মাল*, *ফাজায়েল-ই-হাজ্জ* (ইংরেজী অনুবাদ), ৮ম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-১২৯, (নতুন সংস্করণ ১৯৮২, ধীন বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৬৭৩। দেখুন, ‘যয়ীফ আল-জামী আস-সাগীর (৫/৫৬০৮)’।

হাদীসটি আলোচিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ, এ দু'টি হাদীসে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর দ্বাবর যিয়ারাহর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৬ : 'যে বিশেষভাবে আমার যিয়ারাহর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে, সে কিয়ামাহর দিন আমার প্রতিবেশী হবে।' ^{৬৭৪} {যয়ীফ-(দূর্বল) ^{৬৭৫} }।

৬৭৪। ফাজায়েল-ই-আ'মাল, ফাজায়েল-ই-হাজ্জ (ইংরেজী অনুবাদ), ৮ম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-১২৭, (মুতন সংস্করণ ১৯৮২, ধীনি বুক ডিপো-দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)।

৬৭৫। দেখুন, শাইখ্ আলবানীর 'তাহকীক মিশকাত আল মাসাবীহ'।

গ্রন্থ-পঞ্জি

(তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত)

- ১। এ. এ. তাবারী, সুফিবাদের অন্য পিঠ (The Other Side of Sufism) ১৯৮৮ সন সংস্করণ (ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা-কুয়েত)।
- ২। আশিক্ব ইলা'হী মিরাতী, ইরশাদুল-মূলক, ১৯৮৮ সন সংস্করণ, (আস্-সা'দিক পাবলিকেশন্স-দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত)। ইরশাদুল-মূলক, রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর ফাসী গ্রন্থ ইমদাদুস্-সুলুক- এর উর্দু অনুবাদ। ইংরেজী অনুবাদ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মাজ্লিসুল-উলামা।
- ৩। আশিক্ব ইলা'হী মিরাতী, তাজকিরাত্ আর-রাশীদ (রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীর জীবন চরিত) (উর্দু), ১৯৮৬ সন সংস্করণ (ইদা'রা ইসলামিয়া'হু লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত)।
- ৪। আবু বকর কালাবাদী, The Doctrine of the Sufis (ইংরেজী অনুবাদ), ১৯৯৪ সন সংস্করণ (প্রকাশ করেছেন কিতাব ভবন-ভারত এর পক্ষে নুসরাত আলী নাসরী)।
- ৫। আবু বিলাল মুস্তাফা আল-কানাদী, Mysteries of the Soul Expounded, ১৯৯৪ সন সংস্করণ, (আবুল-ক্বাসিম পাবলিশিং হাউজ, সাউদি আরব কর্তৃক প্রকাশিত)।
- ৬। আবু ইব্রাহীম ইবন সুলতান আল-আদনানিম, তাবলীগী জামা'আত আউর ইখ্বওয়ানুল-মুসলিমুন, (উর্দু, অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মাদ আল-আ'যামী), ২০০০ সন সংস্করণ (প্রকাশক-আহলে হাদীস একাডেমি, ইউপি-ভারত)।
- ৭। আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস আউর উন্বিকি ধ্বনি দাওয়াহু (উর্দু), (প্রকাশক, ইদারা ইশা'আত-ই-দ্বীনিয়াত - বোম্বে)।
- ৮। আবুল হাসান আলী নদভী, মাকা'তিব হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ ইলিয়াস (উর্দু), ১৯৯১ সন সংস্করণ, (প্রকাশক-ইদারা ইশা'আত-ই-দ্বীনিয়াত-দিল্লী)।
- ৯। আবুল হাসান আলী নদভী, "সালা'সিল আরবা'আ-ক্বাদরিয়াহু, নাক্ষবান্দিয়াহু, চিশতিয়াহু, সোহরাওয়ার্দীয়াহু (উর্দু), প্রকাশক-আহমাদ শাহীদ একাডেমি-রায় বেরিলী, ভারত)।
- ১০। আহমাদ সাঈদ দেহলভী, 'What Happens After Death' মৃত্যুর পর কি হয়? (প্রকাশক-সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল-দিল্লী)।

- ১১। আহক্বার আজিজ আল-হাসান এবং আফক্বার আব্দুল হাক্ক, 'আশরাফ আস-সাওয়ানেহ' (আশরাফ আলী খানভীর জীবন চরিত), ১৩০৪ হিঃ সংস্করণ, প্রকাশক- মাক্তাবা' তা'আলিফাত আশরাফিয়াহ-দিল্লী)।
- ১২। আকবার শাহ নাজিবাবাদী, 'The History of Islam' ইসলামের ইতিহাস, ২০০০ সন সংস্করণ, (প্রকাশক-দার-উস-সালাম, সাউদি আরব)।
- ১৩। আল্লামা আব্বাসদুল ক্বাদরী, **Tablighi Jamaat in the Light of Facts and Truth**, ১৯৯৬ সন সংস্করণ (প্রকাশক-সুন্নি যুব ফেডারেশন, বোম্বে)।
- ১৪। আল্লামা ইহুসান ইলাহী জহীর, **বেয়েল্‌তীগণ**, ১৯৮৫ খ্রীঃ সংস্করণ, প্রকাশক- ইদারা তারজুমান আল-সুন্নাহ- লাহোর।
- ১৫। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির উদ্-দীন আলবানী, 'যয়ীফ আল-জামী আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতীহি,' ওয় সংস্করণ, ১৯৯০ সন, (প্রকাশক- মাক্তাবা ইসলাম, বৈরুত, লেবানন)।
- ১৬। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির-উদ্-দীন আলবানী, 'সিল্‌সিলাতিল-আহাদীস আয-যায়ীফাহ ওয়া ল মউযুয়াহ'।
- ১৭। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির-উদ্-দীন আলবানী, **Tawassul-Its Types and Its Rulings** (Eng. Trans by Aboo Talhah Daawood Ibn Ronald Bukbank)। ১৯৯৬ সন সংস্করণ (প্রকাশক : আল-হিদায়াহ, যুক্তরাজ্য)।
- ১৮। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির-উদ্-দীন আলবানী, **The Hadith is Proof Itself in Belief and Laws** (Eng. Trans.), Edn. 1995 (Published by The Daar of Islamic Heritage-U.S.A)।
- ১৯। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির-উদ্-দীন আলবানী, **The Prophet's Prayer**, ইংরেজী অনুবাদ-উসামা ইব্ন সুহাইব হাসান, (প্রকাশক : জামিয়াহ-ইহুইয়া মিনহাজ আস-সুন্নাহ- যুক্তরাজ্য)।
- ২০। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির-উদ্-দীন আলবানী, 'আহকাম আল-জানায়িজ ওয়া বিদ'আতুহ' (ইংরেজী অনুবাদ- প্রকাশক : মাক্তাবা আল-মারিফ-রিয়াদ)।
- ২১। Dr. Ismail Mangera, **For Friends** (Selected Discourses of Moulana Maseehullah Khan)- Booklet Series (Published by Dr. Ismail Mangera).
- ২২। Dr. Ismail Mangera, **Good Character** (Compilation of the Teachings of Maseehullah Khan) Edn. 1992 (Published by Young Men's Muslim Association- South Africa)।
- ২৩। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, 'কুন্সিয়াতে ইমদাদিয়াহ (উর্দু)', প্রকাশক : দার আল-ইশাত, করাচী।

- ২৪। ইমাম ইবনুল-ক্বাইয়িম আল-যাওযীয়াহ্, ‘ফাসুল ফি যুম-আল-হাও’য়া – **The Dispraise of al-Hwwa**, ইংরেজী অনুবাদ-সালেহ্ আস্-সালেহ্, ১ম সংস্করণ, দ্বার আল-খাইর, জিদ্দা, সৌদি আরব কর্তৃক প্রকাশিত।
- ২৫। ইমাম ইবন কাসীর, তাফসীর ইবন কাসীর (উর্দু এবং ইংরেজী অনুবাদ)।
- ২৬। ইমাম তাক্বী-উদ্-দীন আহমাদ ইবন তাই’মিয়াহ্, ‘আল-উবুদিয়া’হ্- দাসত্বের উপর ইবন তাইমিয়াহ্‌র প্রবন্ধ, (ইংরেজী অনুবাদ-আবু সাফওয়ান ফারিদ ইবন আবুল-ওয়াহিদ ইবন হাইবাতান), সংস্করণ ১৯৯৯ সন, (প্রকাশক : আল-হিদায়াহ্ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন)।
- ২৭। ইমাম তাক্বী-উদ্-দীন আহমাদ ইবন তাই’মিয়াহ্, “**Ibn Taymeeyah’s Essay on Jinns**” জীনের উপর ইবন তাইমিয়াহ্‌র প্রবন্ধ, (ইংরেজী অনুবাদ- ডঃ আবু আমিনাহ্ বিলাল ফিলিপ্স), সংস্করণ ১৯৯৫ সন, (প্রকাশক : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ)।
- ২৮। ইমাম তাক্বী-উদ্-দীন আহমাদ ইবন তাই’মিয়াহ্, ‘কিতাব আল -ওয়াসীলাহ্’ (ইংরেজী অনুবাদ), প্রকাশক : ইদারা তারজুমান আস্-সুন্নাহ্, লাহোর।
- ২৯। ইমাম তাক্বী-উদ্-দীন আহমাদ ইবন তাই’মিয়াহ্, **The Criterion between the Allies of the Merciful and the Allies of the Devil**, (ইংরেজী অনুবাদ) সংস্করণ ১৯৯৩ সন, প্রকাশক : ইদারা ইহুইয়া-উস্-সুন্নাহ্-বার্মিংহাম)।
- ৩০। ইমাম তাক্বী-উদ্-দীন আহমাদ ইবন তাই’মিয়াহ্, **The Right Way** (ইংরেজী অনুবাদ), প্রকাশক : দার-উস্-সালাম, সাউদি আরব।
- ৩১। ইমাম আল-বারবাহা’রী, শারহ্ উস্-সুন্নাহ্ (ইংরেজী অনুবাদ : আবু তালহাহ্ দাউদ ইবন রোনাল্ড বুকবাক্ক), সংস্করণ ১৯৯৫ সন, (প্রকাশক : আল-হানীফ পাবলিকেশনস্ - যুক্তরাজ্য)।
- ৩২। ইমাম ইবন কাসীর ‘**Stories of the Prophets**’ “নাবী কাহিনী” (ইংরেজী অনুবাদ-মুহাম্মাদ জেমেইয়াহ্) (প্রকাশক : আল্-নূর, মিশর)।
- ৩৩। ইসমা’ঈল হাক্কী আল-বারসী, ‘তাফসীর রুহ্ আল-বাইয়ান, সংস্করণ ১৯৮৫ সন, (প্রকাশক : : দা’র ইহুইয়া আত্-তাউরাত আল্-আরাবিয়াহ্ - বৈরুত)।
- ৩৪। কেনেথ মরগান, ‘**The Religion of the Hindus**’, সংস্করণ ১৯৯৬ সন, (প্রকাশক : মোতিলাল বানারসী, দাস পাবলিশার্স-দিল্লী)।
- ৩৫। Majlisul Ulema of South Africa, **Awake** (Magazine – Various Issues, Published by Young Men’s Muslim Association, South Africa).
- ৩৬। Majlisul Ulema of South Africa, ‘**Kitaab al-Janaiz**’- Death and Burial (Hanafi, Eng. Trans.), Edn. 1994, (Published by Young Men’s Muslim Association-South Africa).

- ৩৭। Majlisul Ulema of South Africa, 'Malfoozat- Statements and Anecdotes, (Eng. Trans.), Edn. 1995, (Published by Young Men's Muslim Association-South Africa).
- ৩৮। Majlisul Ulema of South Africa, 'The Question of Raf-al-Yadain'- (The Hanafi View, Published by Young Men's Muslim Association-South Africa).
- ৩৯। Majlisul Ulema of South Africa, (Port Elizabeth), 'Kitaabul Imaan, (Eng. Trans.), Published by Young Men's Muslim Association-South Africa.
- ৪০। মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুথিয়ানভী, Show us the Right Path- 'ইখতিলা'ফ-ই-উম্মাহ্ আউর সিরাত-ই-মুসতাক্বিম'-এর ইংরেজী অনুবাদ (প্রকাশক : মাদ্রাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া)।
- ৪১। মাওলানা ইহুতেশামুল হাসান এবং মাওলানা আশিক ইলাহী, The Teachings of Tabligh (ইংরেজী), সংস্করণ ১৯৮৯ সন, (প্রকাশক : ইদারা ইশা-ই-দ্বীনিয়াত-নয়া দিল্লী)।
- ৪২। মাওলানা মুহাম্মাদ মাসিহ-উল্লাহ্ খান, শরীয়াহ্ এবং তাসাউফ, ১ম খন্ড, মাসিহ-উল-উম্মাহ্, মাওলানা মুহাম্মাদ মাসিহ-উল্লাহ্ খানের মুরীদগণ কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৪৩। মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভী, 'আপ বেতি'-মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভীর স্বরচিত জীবনীগ্রন্থ, (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, ইংরেজী অনুবাদ) সংস্করণ ১৯৯৩ সন, (প্রকাশক : ইদারা ইশা-ই-দ্বীনিয়াত-নয়া দিল্লী)।
- ৪৪। মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভী, 'আপ বেতি'-মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভীর স্বরচিত জীবনীগ্রন্থ, (৪র্থ ও ৫ম খন্ড, ইংরেজী অনুবাদ) সংস্করণ ১৯৯৫ সন, (প্রকাশক : দারুন্-নাশর-রাহমানীয়াহ্)।
- ৪৫। মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভী, ফাজায়েল-ই-আ'মাল {ইংরেজী অনুবাদ, 'ফাজায়েল-ই-সাদাকাহ্' (১ম ও ২য় খন্ড), দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় সংস্করণ- ১৪১৪ হিঃ-১৯৯৩ খ্রীঃ। প্রকাশক : ওয়াটারডাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট}।
- ৪৬। মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভী, ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইংরেজী অনুবাদ, 'ফাজায়েল-ই-সাদাকাহ্ ও হাজ্জ, নুতন সংস্করণ-১৯৮২, প্রকাশক : দ্বীনি বুক ডিপো)।
- ৪৭। মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভী, ফাজায়েল-ই-আ'মাল (হিন্দী অনুবাদ), 'ফাজায়েল-ই-সাদাকাহ্' (প্রথম সংস্করণ-১৯৮৪ সন, ইদারা ইশাত দ্বীনিয়াত)।
- ৪৮। মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভী, ফাজায়েল-ই-আ'মাল (ইং অনুঃ), ইসলামের শিক্ষা, (সংস্করণ-১৯৮৫ সন, দ্বীনি বুক ডিপো)।
- ৪৯। মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়াহ্ কান্ধাহলভী, 'মাসাইখ-ই-চিশ্ত (ইং অনুঃ), সংস্করণ-১৯৯৮ সন, (প্রকাশক : আস্-সাদিক্ পাবলিকেশনস্-দক্ষিণ আফ্রিকা)।

- ৫০। মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়াহ্ কাকাহলভী, 'ফাজ্জয়েল-ই-সালাত আলান-নাবী, সংস্করণঃ ১৯৮৫ সন, (প্রকাশক : ওয়াটারডাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট-দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- ৫১। মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়েব সাহেব, 'আ'লাম-ই-বারুযাখ্' (ক্ববর জীবন সম্পর্কে বুঝ, ইংরেজী অনুবাদ, তাইয়েব পাবলিকেশন্স কর্তৃক)।
- ৫২। মাওলানা ওয়াহিদ-উদ্-দীন খান, 'Tablighi Movement, (ইংরেজী অনুঃ) সংস্করণ ১৯৯৪ সন, (প্রকাশক : দি ইসলামিক সেন্টার-নয়া দিল্লী)।
- ৫৩। মাওলানা আব্দুল গাফুর উসরা, 'আসলি আহল-ই-সুন্নাহ্' (উর্দু) সংস্করণ ১৯৮৯ সন, (প্রকাশক : আহল-ই-হাদীস যুব শক্তি, পাকিস্তান)।
- ৫৪। মাওলানা আব্দুল হামিদ ইসহাক্ 'The Reality of Tasawwuf and Ihsan', (প্রকাশক : মাদ্রাসাহ্ আরাবী ইসলামিয়া আ'যাদভিল-দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- ৫৫। মাওলানা আব্দুর-রাহমান কাইলানী, 'আ'ইনা-ই-পারভেজিয়াত' (উর্দু) সংস্করণ ১৯৯৪ সন, (প্রকাশক : মাক্তাবা সালাফিয়াহ্, লাহোর)।
- ৫৬। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, 'আ'দা'বুল মুম্মা'শারাত', The Etiquette of Social Life (Eng. Trans.), Edn 1990, (Published by Young Men's Muslim Association -South Africa)।
- ৫৭। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, 'আর'ওয়াহে ছালাহা (উর্দু)', সংস্করণ ১৯৭৬ সন, (প্রকাশক : ইসলামিক একাডেমী, লাহোর)।
- ৫৮। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, 'বেহেশতী জেওয়ার', সংস্করণ ১৯৯৩ সন, (প্রকাশক : সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল)।
- ৫৯। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, 'ইমদাদ আল-মাশাহি' (উর্দু), (প্রকাশক : মাক্তাবা ইসলামিয়াহ্ একাডেমি-লাহোর)।
- ৬০। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, 'ইমদাদ আল-মুস্তাক্ব ইলা আশরাফ উল-আব্বালক্ব', (উর্দু), (প্রকাশক : মাক্তাবা ইসলামিয়াহ্, লাহোর)।
- ৬১। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, 'শরীয়াত ওয়া তরিক্বাত' (উর্দু), সংস্করণ ১৯৮১ সন, (প্রকাশক : ইদারা ইসলামিয়াত্ - লাহোর)।
- ৬২। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, 'তাফসীর বাইয়ান আল-কুর'আন', (কুর'আনের তাফসীর, (উর্দু), প্রকাশক : তাজ কোম্পানী লিঃ- করাচী)।
- ৬৩। মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব, 'মা'আরিফ-ই-মাসুনাবী', (প্রকাশক : মাজলিসে ইশা'আতুল হাক্ক-দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- ৬৪। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ গাসোহী, 'ইখ্বামালুশ্-শিইয়া'ম', প্রকাশক : মাজলিসুল উলেমা-দক্ষিণ আফ্রিকা)।

- ৬৫। মাওলানা মুহাম্মাদ রাসিদ নদভী, **তাসহিহ আল-আক্বাদিদ বিল বাতিল শাওয়াহিদ আশ-শাহিদ**, (উর্দু), সংস্করণ ১৯৯৮ সন, (প্রকাশক : মাক্তাবা সালাফিয়া-বানারাস)।
- ৬৬। মাওলানা মুহাম্মাদ শারীফ, **‘মাক্বুত্বাত ওয়া মালফুজাত আশরাফিয়াহ’**, (উর্দু), মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর লিখন এবং কথন, থানভীর এক খলিফা লিখিত (থানভীর) জীবনী, সংস্করণ ১৯৮৫ সন, (প্রকাশক : ইদারা তালীফাত আশরাফিয়াহ-মুলতান)।
- ৬৭। মাওলানা রাসীদ আহমাদ গালোহী, **‘আল-বারাহিনুল-ক্বাটিয়া’**, (উর্দু) সংস্করণ ১৯৮৭ সন, (প্রকাশক : দার আল-ইশাত-করাচী)।
- ৬৮। মাওলানা রাসীদ আহমাদ গালোহী, **‘ইমদাদ আস-সুলুক’** (উর্দু), সংস্করণ ১৯৮৪ সন, (প্রকাশক : ইদারা আল-ইসলামিয়াহ - লাহোর)।
- ৬৯। মাওলানা সাঈদ আব্দ আস-শাকুর, **The Creed of the Ulema Ahlus-Sunnah Deoband** (উর্দু), সংস্করণ ১৯৮৪ সন, (প্রকাশক : ইদারা ইসলামিয়াহ- লাহোর)।
- ৭০। Moulvi Muhammad Alea Ibn Alea Al-Thanwi, **A Dictionary of the Technical Terms used in the Science of the Musalmans**, Edn. 1862 (Published by W. N. Lees Press, Istanbul).
- ৭১। মুফতী সাঈদ আবদুর রাহীম লাজপুরী, **‘ফাতোয়াহ রাহিমীয়াহ’** (ইং অনুঃ) ১ম খন্ড, (প্রকাশক : মাক্তাবা রাহিমীয়াহ - ভারত)।
- ৭২। মুফতী সাঈদ আবদুর রাহীম লাজপুরী, **‘ফাতোয়াহ রাহিমীয়াহ’** (ইং অনুঃ) ২য় খন্ড, সংস্করণ ১৯৭৮ সন, (প্রকাশক : মাক্তাবা রাহিমীয়াহ - ভারত)।
- ৭৩। মুফতী সাঈদ আবদুর রাহীম লাজপুরী, **‘ফাতোয়াহ রাহিমীয়াহ’** (ইং অনুঃ) ৩য় খন্ড, সংস্করণ ১৯৮২ সন, (প্রকাশক : মাক্তাবা রাহিমীয়াহ - ভারত)।
- ৭৪। Muhammad al-Jibaly, **‘Celebrations in Islam’** Edn. 1996, (Published by Al-Qur’an was-Sunnah Society of North America).
- ৭৫। মুহাম্মাদ আনিস-উল-হাক্ক, **‘আদাবুল গাশত- The Etiquettes of Ghust,’** (ইংরেজী অনুবাদ), সংস্করণ ১৯৯৫ সন, (প্রকাশক : মাদ্রাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া)।
- ৭৬। Muhammad Ibn Rabee Al-Madkhalee, **‘The Reality of Sufism’** (Eng. Trans. by Daawood Ibn Ronald Bukbank), Edn. 1995, (Published by Al-Hidaayah- U.K.).
- ৭৭। Muhammad Ibn Sireen, **‘Dreams and Interpretations** (Eng. Trans.), Edn. 1993, (Published by Islamic Publications- South Africa).

- ৭৮। Muhammad Iqbal Kailani, 'The Book of the Oneness of Allah', Edn. 1993, (Published by Hadith Publications- India).
- ৭৯। মুহাম্মাদ ইক্বাল কুরাইশী, 'মালফুযাত হাকিম আল-উম্মাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ আশরাফ আলী থানভী' (উর্দু), সংস্করণ ১৯৮৪ সন, (প্রকাশক : ইদারা তা'য়ালিফাত আশরাফিয়াহ-মুলতান)।
- ৮০। মুহাম্মাদ মানজুর নুমানী, 'মালফুযাত মাওলানা ইলিয়াস' (উর্দু), সংস্করণ ১৩৯৯ হিঃ, (প্রকাশক : দা'র উল-ইশা'ত, করাচী)।
- ৮১। মুহাম্মাদ মানজুর নুমানী ও আতিক্ আর-রাহমান সাম্ভালী, 'হযরতজি মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ', সংস্করণ : ১৯৯৪ সন, (প্রকাশক : আল-ফুরক্বান বুক ডিপো-বোম্বে)।
- ৮২। মুহাম্মাদ ক্বাসিম নানোতভী, 'তাহজীর আন্-নাস্' (উর্দু), (প্রকাশক : দা'র আল-ইশা'ত, করাচী)।
- ৮৩। মোল্লাহ্ আলী ক্বারী, 'নাসিম আব্ব-রিয়াজ ফি শারাহ্ শিফা' কাদ'ই ই'য়াজ', প্রথম সংস্করণ-১৩২৭ হিঃ (প্রকাশক : দার আল-কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত)।
- ৮৪। নাওয়াব সাইয়িদ মেহেদী আলী খান বাহাদুর, 'Taqlid and Acting upon Hadeeth' (উর্দু), সংস্করণ ১৯৮৩, (প্রকাশক : জামিয়া সালাফিয়া-বানারস)।
- ৮৫। R. A. Nicholson, 'Studies in Islamic Mysticism', Edn. 1998, (Published by Adam Publishers and Distributors-Delhi).
- ৮৬। S. Ikbal Ale Shah, 'Islamic Sufism', Edn. 1998 (Published by Adam Publishers and Distributors- Delhi).
- ৮৭। শাব্বির আহমাদ উসমানী, 'তাকসীর-ই-উসমানী', সংস্করণ ১৯৯৪ সন, (ইংরেজী অনুবাদ, প্রকাশক : আল-আমিন পাবলিকেশন্স- লাহোর)।
- ৮৮। Shaikh Abdullah as-Sabt, 'The Ever-Merciful Istawa Upon the Throne', Edn. 1994, (Published by Daar of Islamic Heritage).
- ৮৯। শাইখ্ হামুদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হামুদ আত্-তুয়াইজিরি, "আল-ক্বাওল আল-বালিগ্ ফি আত-তায়িরুহ্ন জামা'য়াত আত্-তাবলীগ্," (উর্দু), অনুবাদ করেছেন - মাওলানা আতা আল্লাহ্ দারভী, (প্রকাশক : মুহাম্মাদ ইয়াসিন রাজপুত-সারজাহ, সংযুক্ত আরব আমীরাত)।
- ৯০। Shaikh Muhammad Sadiq, 'The Way of Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa-sallam)', (Edn. 1996, Published by Darussalam – Saudi Arabia).
- ৯১। Shaikh Muhammad Sultan al-Masoom al-Khajnadee, "Blind Followings of the Madhhab", (Eng. Trnns. by Aboo Talhah Dawood Ibn Ronald Bukbank.), Edn. 1993, (Published by al-Hidaayah Publishing and Distribution).

- ৯২। Shaikh Rabee Ibn Hadee al-Madhkhalee, “**The Methodology of the Prophet in Calling to Allah, that is the Way of Wisdom and Intelligence**,” (Eng. Trans/ by AbooTalhah Dawood Ibn Ronald Bukbank), Edn. 1997, Published by al-Hidaayh Publishing and Distribution).
- ৯৩। শাইখ সাফি-উর-রাহমান মুবারাকপুরী, “আবু-রাহি’ক আল-মাখতু’ম” (ইং অনুঃ সংস্করণ ১৯৯৬ সন, (প্রকাশক : দার আস-সালাম, সাউদি আরব)।
- ৯৪। Shaikh Saleh al-Fawzaan, “**The Book of Tawheed**”, Edn. 1997, (Published by Darussalam, Saudi Arabia).
- ৯৫। শাইখ-উল-ইসলাম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহ্‌যাব, “কিতাব আত-তাওহীদ”, প্রথম সংস্করণ, (প্রকাশক : দার আস-সালাম, সাউদি আরব)।
- ৯৬। Students of Jameatul Imaam Muhammad Zakariyah, “**Death and Beyond**”, Edn. 1996, (Published by Jamea Publicaitons- U. K.).
- ৯৭। Shaikh Suhaib Hasan, “**Criticism of Hadeeth among Muslims with reference to Sunan Ibn Majah**”, Edn 1986, (Published by Al-Qur’aan Society- U. K.).
- ৯৮। Shaikh Suhaib Hasan, ‘**The Journey of the Soul**’, Edn. 1995, (Published By Al-Qur’aan Society- U. K.).
- ৯৯। W. Stoddrt and R. A. Nicholson, “**Sufism – The Mystical Doctrines and the Idea of Personality**”, Edn. 1998, (Published by Adam Publishers and Distributors-Delhi).
- ১০০। Young Men’s Muslim Assocation South Africa, “**Tableegh Jamaat and What is Meelad**”? (Published by Young Men’s Muslim Assocation – South Africa).
- ১০১। সহীহুল বুখারী (হাদীস গ্রন্থ)।
- ১০২। সহীহ মুসলিম (" ")।
- ১০৩। মুয়াত্তা মালিক (" ")।
- ১০৪। মুসুনাদে আহমাদ (" ")।
- ১০৫। সুন্নে নাসাঈ (" ")।
- ১০৬। আবু দাউদ (" ")।
- ১০৭। জামে আত্ তিরমিযী (" ")।
- ১০৮। সুন্নে ইব্নে মাজাহ (" ")।
- ১০৯। তাহক্বীক মিশ্কাভুল মাসাবীহ (" ")।
- ১১০। আরো অন্যান্য বহু হাদীস গ্রন্থ, যেমন – সহীহ ইব্নু খুযাইমাহ, ইব্নু হিব্বান, বাইহাকী, সমুতী, শাওকানী, ইত্যাদি।